প্রকাশক
শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র সোম
২০৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আড়াই টাকা

মার্চ্চ—১৯৪১

প্রিণ্টার—শ্রীপরমানন্দ সিংহ রায়
শ্রীকালী প্রেস
৬৭, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সর্ব্বকালের

তরুণ-তরুণীদের

করকমলে—

তপনের বিবাহে সমারোহের আর অন্ত রহিল না।

সারা বাদুড় বাগানের মধ্যে প্রাসাদোপম অট্টালিকা ঘিরিয়া সুন্দর ফুলের বাগান; বাগানে প্রাচ্য দেশীয় অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য শিল্প, কৃত্রিম উৎস, লতাবিতান, রমণীয় কুঞ্জ। বিবাহের উৎসবে চারুসজ্জা ও বিজলী আলোক পথচারী পথিককে ক্ষণেকের তরে—আকর্ষণ করে, ক্ষণেকের তরে অন্তরে তার মায়াজাল সম্প্রসারিত হয়। দীনের কুটীর অঙ্গনে আভরণহীন যে উৎসব কল্যাণ-স্নিগ্ধ দীপের মত অনুজ্জ্বল, ধনীর প্রাসাদে তারই দীপ্তি শত সূর্য্যের প্রভায় দীপ্তিমান্। নিস্তরঙ্গ নদীর ধারে বসিলে বৈচিত্র্য-প্রয়াসী মন অল্পক্ষণেই পীড়িত হইয়া উঠে, কুটীর অঙ্গনের অতি সরল অনাড়ম্বর জীবন যাত্রার মধ্যেও তাই বিলাসবৈভবের মৃগতৃষ্ণিকা। তাই বাহ্যিক আয়োজনের বাহুল্য ও আড়ম্বর পথচারী মনকে টানিয়া আনিয়া এই উৎসব কোলাহলময় অট্টালিকার মুখোমুখী দাঁড় করাইয়া দুটি চক্ষুতে বিভ্রমের বহু লেখাই লিখিয়া দেয়।

সৌধের অন্তরালে—উদ্যান সীমানার পারে দক্ষিণ খোলা সুবৃহৎ কক্ষ। জানালা দিয়া রঙীন আলোক আসিয়া কৃত্রিম উৎসকে আভরণ পরাইয়াছে। জানালার ধারে লতা পাতা কাটা দামী মেহগনি কাঠের পালঙ্ক। শয্যার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকিয়া ফুলের শোভা; সমস্ত ঘরে ফুলেরই গন্ধ এবং ফুলের মত কোমল তনু লইয়া যাহারা সে ঘরে হাসি উল্লাসের

তরঙ্গ তুলিয়াছে—তাহারা নদী, ফুল ও চাঁদ প্রভৃতি যে কোন শ্রেষ্ঠতম সৌন্দর্য্যের লীলা অংশ।

তপনের নূতন জীবনের সূচনায় এই সমস্ত অনুষ্ঠান।

এক জীবন হইতে আর এক জীবনের প্রকাশ। অর্থ আছে বলিয়াই লোকের কানে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে,—গৌরব সমারোহ আমি তোমাদের মত চুপি চুপি উপভোগ করতে চাহি না। সে উৎসবের আলো যদি তোমাদের চক্ষুকে ধাঁধিঁয়া না দিল ত বৃথাই তার দীপ্তি! গন্ধ যদি মনকে উদ্‌ভ্রান্ত না করিল ত কি প্রয়োজন ফুলের! এবং উৎসবে যদি উল্লাসের উৎস সহস্র মুখে উৎসারিত না হইল ত বিবাহ অনুষ্ঠান কেন?

মুহুর্মুহু হুলু ধ্বনিতে প্রাসাদ কাঁপিয়া উঠিতেছে। অলঙ্কার শিঞ্জিনীতে রাত্রির মধ্যযাম পর্য্যন্ত উল্লাস-শরে বিদ্ধ; মাঙ্গলিক আচার অনুষ্ঠানের ঘোর রব সমস্ত পাড়ার মধ্যে নিদ্রাদেবীকে ছুটাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। আনন্দের প্রমত্ত ঝড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ বিষাদের তরুলতাগুলি পর্য্যন্ত যেন উপড়াইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় ছবি, আয়না, আলো ও ফুলের মধ্যে বসিয়া তপনের সহচরেরা। কেহ হারমোনিয়মে সুর দিতেছে, কেহ তবলায় চাঁটি মারিতেছে, কেহ তর্ক তুলিয়াছে কলেজের প্রফেসারদের শিক্ষাপদ্ধতি লইয়া, কেহ বা অকারণে চেঁচাইতেছে। উহাদের হাসির গমকে অত্যুগ্র উল্লাস-কলরবে—বৈশাখীর ঝড় নামিয়াছে—সেই কক্ষে।

উল্লাসের মাত্রা—কি পৌরজনের, কি বাহিরের বন্ধুবান্ধবদের,—কি আত্মীয় স্বজনের সীমা ছাড়াইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। মনে হয়, অলীক কল্পনার বিভীষিকা বহুদিন পরে খসিয়া পড়াতে—যেমন আসল সত্য প্রকাশের প্রচণ্ড কলরব উঠে—তেমনি। দীন দরিদ্র অকস্মাৎ লক্ষ টাকা পাইলেও বুঝি এমন উল্লাস দেখাইতে পারে না।

দামী গরদের শাড়ি পরিয়া গৃহিণী মেদ মাংসের বোঝা লইয়া অসংখ্যবার সিঁড়ি দিয়া উঠা-নামা করিতেছেন, এতটুকু ক্লান্তি নাই।

কর্ত্তা অদূরে নিভৃত বৈঠকখানায় ইজি চেয়ারে বসিয়া সকাল হইতে কতবার যে কলিকা পালটাইয়াছেন—তাহার হিসাব ভৃত্য গোবর্দ্ধনও জানে না! খেঁদি, টেবি, পটলা. কেলো, বুঁচো, মণ্টু, লিলি প্রভৃতি পাঁচ মিনিট অন্তর পোষাক বদল করিতেছে; পুষ্পসার গন্ধে তাহাদের পায়ের ডগা হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত ভুরভুর করিতেছে। লাফালাফিতে কাঠের সিঁড়িতে এমন কর্ণ বিদারী আওয়াজ উঠিতেছে যে, অন্য সময় হইলে তাড়নায় ও প্রহারে চাপা কান্নার একটা মিশ্র ধ্বনি উঠিত। দাস দাসীরা পর্য্যন্ত কোটা মাছের টুকরা, সন্দেশের ডেলা, ঘি, তেল, মশলা অক্লেশে হাসিমুখে পাচার করিতেছে। খরদৃষ্টির অধিকারিণী গৃহিণী সে-সব দেখিয়াও দেখিতেছেন না। অথচ একপলা তেলের কমতিতে কতবার যে এ বাড়িতে ঝি-চাকর বদল হইয়াছে—তাহার হিসাব খাতায় লিখিয়াও কর্ত্তা শেষ করিতে পারেন নাই।

পুত্রের বিবাহ ত অনেক সংসারেই হয়, এ সংসারেও পূর্ব্বে হইয়াছে। তপনের দুই দাদার বিবাহে আয়োজন-সমারোহ কিছু কম হয় নাই। তবু মনে হয়, সে অপরিমেয় আনন্দের একটা হিসাব কর্ত্তা গৃহিণী রাখিয়াছিলেন; এমন বাধাবন্ধহীন উৎসব এ বাড়িতে এই বোধ হয় সর্ব্ব প্রথম। তপন তৃতীয় পুত্র, তার পরেও দুইজন আছে। সুতরাং, উৎসব আবার আসিবে, হিসাবের খাতায় আবার খরচ লেখা চলিবে। কিন্তু বে-হিসাবী খরচ এমন বোধ হয় আর হইবে না!

কারণ, তপনের বয়স ত্রিশ ছাড়াইয়াছে। সে বয়সে এ বাড়িতে ষষ্ঠীর কৃপায় প্রৌঢ়ত্বের প্রসাদে উগ্র যৌবন শান্ত হইয়া আসে। এ বাড়ির অনেকগুলি বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে বাল্য বিবাহ অন্যতম। নীতির দিক

দিয়া এই ধনী পরিবার অত্যন্ত সতর্ক। পাঠ্য জীবনের সঙ্গে যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতার একটা যে প্রবাদ আছে—এ বাড়ির বিধানে তা ধ্রুব সত্য। সুতরাং সুশীল সুবোধ পুত্রেরা এতকাল ধরিয়া গুরুজনের মনে শান্তি আনিতে—সংসারের শৃঙ্খলার জন্য হাসিমুখে তরুণ যৌবনকে নিয়মের নিগড়ে বাঁধিয়া রাখিতে দ্বিধা বোধ করিত না। ব্যতিক্রম তপন। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্ত আসিবার পরক্ষণ হইতেই গুরুজনেরা—তার পদস্খলনের আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড উল্টাইলেও তাঁরা এমন বিস্মিত বা বিচলিত হইতেন না,—যেমন তপনের বিবাহ-অনিচ্ছায় সেদিন মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন।

তপনের দুই দাদার গাম্ভীর্য্য ছিল অসাধারণ। তাঁহারা প্রভুত্বে ও আড়ম্বরময় বেশভূষার ত্রুটি বিচ্যুতিতে ভৃত্য ও পরিজনদের সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেন। কিন্তু তাঁহাদের পিতৃমাতৃ ভক্তি ছিল অসাধারণ।

অষ্টাদশের প্রারম্ভে চেলি টোপর পরিতে তাঁহারা দ্বিধা বোধ করেন নাই এবং বউ লইয়া মনের অমিলও কাহার হয় নাই।

অথচ তপন! কিন্তু সে-সব দু-এক কথায় বলা যায় না। এই যে উৎসব—এতো তার জীবনের সর্ব্বশেষ পরিচ্ছেদ, সমাপ্তির ছেদটা বুঝি পর লাইনেই আসিয়া পড়িবে।

তপনের ত্রিশ বৎসরের নিঃসঙ্গ জীবনে—এই সুবৃহৎ অট্টালিকায় সেই অত্যন্ত সহজ মঙ্গলের শুভ আবির্ভাব কেনই বা অতি বিলম্বে অকস্মাৎ ঘটিল, তার পূর্ব্বে ইতিহাসের অনেকগুলি অধ্যায়। অতঃপর আমরা সেই অধ্যায়গুলির অনুসরণ করিব।

* * *

কুড়ি বৎসর বয়সে তপন আই, এ পাস করিল। শুধু পাস করিল না—স্কলারশিপ পাইল। অতঃপর থার্ড ইয়ার সুরু হইল।

গৃহিণী উজ্জ্বল চোখে উপর পানে চাহিয়া ঠাকুর দেবতাকে মানত করিলেন। কর্ত্তা ছিলিম কতক তামাক উড়াইয়া ফট্ ফট্ চটি জুতার শব্দ করিয়া এ-ঘর ও-ঘর করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন! বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের তর্জ্জনী দিয়া কখনও কি রেখাপাত করিতে লাগিলেন, কখনও বা তাল দিতে লাগিলেন। রাত্রিতে বাজার হইতে ভাল মাছ আসিল, অসময়ের বেগুন আসিল এবং দোকান হইতে দধি রাবড়ীও আমদানী হইল। বন্ধু বান্ধব হিতৈষী স্বজন পরিতৃপ্তির সঙ্গেই ভোজন করিয়া কলরব করিতে করিতে চলিয়া গেল।

একটু নিরিবিলি পাইয়া গৃহিণী কর্ত্তাকে বলিলেন, "যাক্—বাঁচা গেল।" কর্ত্তা মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন।

তাঁহার হাসি দেখিয়া গৃহিণী স্থূলবপু লইয়া সন্নিকটবর্ত্তী চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ক্যাঁচ করিয়া একটা শব্দ হইল। মুখ বিকৃত করিয়া গৃহিণী মন্তব্য করিলেন, "মরণ! এমন পলকা চেয়ারও হরি ছুতোর তৈরি করে দিয়ে গেছে। ক'টাকা মজুরি দিয়েচ গা?"

কর্ত্তা এবারও কথা না কহিয়া হাসিলেন।

গৃহিণী একবার সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন, "কিছু বলবে? না বাপু, বসতে পারি না। চারদিকে কাজ ছড়ানো—গায়ে আমার ছাঁট লাগচে।"

কর্ত্তা বলিলেন, "ভূতোর বিয়েতে ওরা কত দিয়েছিল মনে আছে?"

গৃহিণী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "কে জানে, হাজার ছয়েক হবে বোধ হয়। সে কি আর দেওয়া!"

কর্ত্তা সে কথার উত্তর না দিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "হরির বিয়েয়?"

গৃহিণী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া জবাব দিলেন, "সেও বুঝি আট হাজার। পোড়া কপাল, বাজনদার বিদেয়!"

কর্ত্তা বলিলেন, "ভূতোর বিদ্যে ফোর্থ ক্লাস পর্য্যন্ত, হরির সেকেণ্ড।"

গৃহিণী একটু ঝাঁঝালো স্বরে কহিলেন, "বিদ্যে-বিদ্যে করচো কেন! ঘরটা দেখলে না? এতো আর খেতাবে রাজা নয়!"

কর্ত্তা কহিলেন, "তা বটে। কিন্তু বিদ্যেটাও আজকালকার দিনে ফেলনা নয়।"

গৃহিণী বলিলেন, "যার পয়সা নেই—তার মিথ্যে ও-সব। তোমার ভবানীপুরের বাড়ির সুকুমার বাবু? অতবড় ব্যারিস্টার, শহর জোড়া নাম, কিন্তু ব্যাঙ্কের খাতা যে একেবারে খালি। সেবার চাইতে এলো হাজার টাকা—বিশ্বাস করে দিলে কি এক পয়সা?"

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, "ও-সব কারবারের গুহ্য কথা। কিন্তু বিদ্যেটাও চাই,—বুঝলে? না হলে বড় বৌমা ও মেজ বৌমার বাপেরা কি আমাদের ঠকাতে পারতো?"

গৃহিণী সক্ষোভে বলিলেন, "তার মূলেও তুমি। ছেলের বিয়ে বিয়ে করে এমন ক্ষেপলে যে, তারা মনে করলে দায় আমাদেরই। জো পেয়ে বসলো।"

কর্ত্তা বলিলেন, "যাক, ও-সব গতস্য শোচনা নাস্তি। খোকার বিয়ের ইচ্ছে আছে তার শোধ তুলবো।"

এক গাল হাসিয়া গৃহিণী বলিলেন, "পারবে?—হাঁ, যে মিউ মিউয়ে তুমি—তোমার আর পারতে হয় না! এবার ফর্দ্দ করবো আমি। আমার পাশওলা ছেলে। তা হ্যাঁগা, বিয়ে কি এই আষাঢ়েই দিচ্ছ?"

কর্ত্তা ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "না।"

"তবে?"

কর্ত্তা বলিলেন, "হিসাবটা করে রাখলুম। দেখলুম, তোমার মনে আছে কিনা!"

গৃহিণী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ভোলবার মেয়েই আমি বটে।"

পরে কর্ত্তার দিকে চেয়ার টানিয়া সরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তা এখন দেবে না কেন? আমার ভূতো, হরির বিয়ে ঘেটের এর ঢের আগে হয়েছিল।"

কর্ত্তা বলিলেন, "এবার নিয়ম পালটাবো—ভাবচি। অন্তত আরও বছর তিনেক বাদে। আর দুটো পাস দেওয়াতে পারিত—।" ভবিষ্যতের অতি আনন্দ তাঁহার বার্দ্ধক্য-ম্লান চক্ষু দুটিতে চক চক করিয়া উঠিল।

ইঙ্গিতটুকু গৃহিণীও বুঝিলেন। বুঝিয়া দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করিয়া কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

* * *

সুখবর চাপা রহিল না। বড় বৌ শুনিল, মেজ বৌও শুনিল। অপ্রিয় মন্তব্য সহ গৃহিণী এই আসন্ন শুভ সংবাদটুকু প্রচার করিতে লাগিলেন। যদিও দুচার বৎসর বিলম্বে এ কাজ হইবে, তথাপি পাস-ওয়ালা ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কীর্ত্তন না করিয়া কোন্ মাতাই বা স্থির থাকিতে পারেন?

বড় বৌ চারু—আপন কক্ষের মেঝেয় বসিয়া ছোট খোকাকে দুধ খাওয়াইতেছিল; দামাল ছেলে হাত পা ছুড়িয়া চারুকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু মুখের অনুচ্চ শাসন বাক্য ছাড়া ছেলের গায়ে হাত দিবার অধিকার তাহার ছিল না। যদি ছেলে ককাইয়া উঠে, গৃহিণী আসিয়া অনর্থ বাধাইবেন। যতক্ষণ না বৌয়ের চোখে জলের ধারা বহিয়া যায়—ততক্ষণই অবিশ্রান্ত ভাবে চলিতে থাকে তাঁর রূঢ় বাক্য বর্ষণ। বিলীন অতীতকে টানিয়া আনিতে ও মর্ম্মস্থলে আঘাত দিতে গৃহিণী সবিশেষ পটু। এমন অনেক বার হইয়াছে। নাকের জলে

চোখের জলে ভাসিয়া বৌয়েরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, ছেলের গায়ে ইহজন্মে আর হাত তুলিবে না।

তাহারা জানে, ধাত্রীগিরি করিবার জন্য এ বাড়িতে তাহাদের পদার্পণ, জননী সাজিবার আশা আকাশকুসুম।

লালন কারিণীর দুর্ব্বলতা ছোট ছেলেরাও কেমন যেন বুঝিতে পারে! ঠাকুরমার পদশব্দে তারা আঁতকাইয়া উঠে, চোখের চাহনিকে এমন ডরায় যে মায়ের আঁচল তলে মুখ লুকাইয়া কয়েক মিনিট চুপচাপ পড়িয়া থাকে; কিন্তু তিনি চলিয়া গেলেই উপায়হীনা জননীর উপর আরম্ভ হয় আবদার উৎপীড়ন। মুখের তর্জ্জনকে তারা গ্রাহ্যের মধ্যেও আনে না।

চারুর ছোট মেয়েটা মেঝেয় গড়াইয়া গড়াইয়া খেলা করিতেছিল। তারপরের দুটি ছেলে খাটের পায়ায় সুতা বাঁধিয়া অন্য প্রান্তে কলিকা সংযোগে টেলিফোন তৈয়ারী করিয়া অনবরত 'হ্যাল্লো'—'হ্যাল্লো'—করিতেছে। সকলের বড়টি কাঁচের আলমারির গায়ে পেন্সিল দিয়া ঠুক্‌ঠাক্ শব্দ করিয়া কাঁচের আঘাত-সহিষ্ণুতার পরীক্ষা করিতেছে। ইতিমধ্যে বার তিনেক আলমারির কাঁচ বদলানো হইয়াছে; তথাপি উৎসাহী ছেলের কৌতূহল মিটে নাই। নিষেধ করিলে উৎসাহ বাড়িয়া যায় বলিয়া চারু ওদিকে কান পাতে নাই।

চারুর বয়স পঁচিশ। কিন্তু পঁচিশের স্বাস্থ্য-সুষমা বহুদিন হইল সে মুখ হইতে বিদায় লইয়াছে। 'কুড়িতে বুড়ি' এ প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা চারুতে পরিস্ফুট। সে জন্য চারুর দুঃখ নাই। সংসারে আসিয়া অনতিবিলম্বে যদি দেহে মনে সে সংসারের ছাপ না লাগিল ত সংসারী সাজাই মিথ্যা! দেহের আঁট সাঁট বাঁধুনি কোনকালে ছিল বলিয়া মনে হয় না। মাংস শিথিল হইয়া মেদের সঞ্চার করিয়াছে। মুখখানা হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিলে যেমন ফুলিয়া উঠে,—তেমনি। গালে মাস লাগায় চোখের সৌন্দর্য্য

ডুবিয়া গিয়াছে, কিন্তু রংটা নাকি উজ্জ্বল হইয়াছে। নাক চিরদিনই একটু চাপা বলিয়া এখন তত ঠাহর হয় না। বৌ মানুষ—মোটা না হইলে সংসারের বদনাম। খাইবার পরিবার অভাব যেখানে নাই—লক্ষ্মীর আসনখানি যে অঙ্গনে প্রতিনিয়তই পাতা—সে বাড়ির হাড় ওঠা রোগা বৌ হইলে লোকেই বা বলে কি, নিজেদেরই বা মুখ থাকে কোথায়? মেজ বৌ যখন তখন রহস্য করিয়া বলে, "কিগো বুড়ো দাই, একটিনি ফুরুলো?'

চারু মুখ ফিরাইয়া উত্তর দেয়, "এ যে পারমানেন্টো।"

ইংরেজী না জানিলেও মেজ বৌয়ের মুখে এই শব্দটি শুনিয়া শিখিয়াছে। মেজ বৌ এক সময়ে বেথুনে পড়িত। সেলাই, গান বাজনা ও লেখাপড়া জানা মেয়ে বলিয়া তার একটা স্বতন্ত্র মূল্য এ বাড়িতে আছে। অতিথি অভ্যাগতের আগমনে সেই মর্য্যাদার মূল্য বিশেষ ভাবেই যাচাই করা হয়, কিন্তু বাহিরের লোক চলিয়া গেলে হারমোনিয়মের ঢাকনায় এক ইঞ্চি ধূলা জমিলেও কেহ সেদিকে ফিরিয়া চাহে না। কলম হাতে দেখিলেই গৃহিণী গুমরাইতে থাকেন এবং সেলাই ফোঁড়াই যাহা চলে—অতি সঙ্গোপনে। বেথুনের ফিরিঙ্গীয়ানার দোষটাও যখন তখন ধিক্কারে ও উচ্চ কণ্ঠে প্রচারিত হয়। এক ছেলে; বয়সও কুড়ি একুশ, তথাপি মেজ বৌয়ের গায়ে চর্ব্বি জমে নাই। মুখে যৌবনলাবণ্যের অনেকখানিই আছে এবং চলিলে সুর না হউক, ছন্দ একটি তৈয়ারী হইয়া যায়। বিরাট কলেবর মাসিকে ক্ষুদে টাইপে অনাদৃত অবস্থায় যেমন কখনও কখনও—সুকবিতা দুই একটি আত্মগোপন করিয়া থাকে, তেমনই এই সুবৃহৎ সংসারের এক কোণেই সে পড়িয়াছিল। কবিতায় হরির কোন দিনই আসক্তি ছিলনা; তাই গান বাজনা সেলাই ছন্দ লইয়া মেজ বৌ অনাবিষ্কৃত কবিতা মাধুর্য্যের মতই ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া আসিতেছিল।

চারু ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছিল ও আপন মনে বকিতেছিল। বেলা দুপুর বাজে, এখনই কারবার হইতে স্বামী আসিয়া পড়িবেন। তাঁর পা ধুইবার জল, গামছা, সাবান, গন্ধ তৈল প্রভৃতি কল ঘরে রাখিয়া খাবার সাজাইয়া বসিতে হইবে মেঝেয়। বড় ঘর হইলেও এ সময়ে ইলেকট্রিক পাখা খুলিবার নিয়ম নাই,—যা করেন তাল-বৃন্ত। তারপর পান সাজিয়া জরদা ভরা কৌটাটি শিয়রে রাখিয়া শ্রান্ত স্বামীর পদ সেবা বা মাথায় অঙ্গুলি চালনা। তাঁর নিদ্রাকর্ষণ হইলে বড় বৌ পাতের প্রসাদ পাইয়া থাকে।

ছেলে যতই হাত পা ছুড়িতে থাকে—চারুর ততই রাগ বাড়িয়া যায়। অবশেষে জোর করিয়া ঝিনুক দিয়া মুখখানা ফাঁক করিয়া চারু অবশিষ্ট দুধটুকু হড় হড় করিয়া খোকার মুখের ভিতর ঢালিয়া দিল। গলায় দুধ আটকাইয়া খোকা বার কয়েক কাশিল, হাত পা ছুঁড়িয়া কাঁদিল, কিন্তু চীৎকারটা সেরূপ ফুটিল না। মেজ-বৌ সুলতা কক্ষে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "এমনি করে বুঝি duty করচ, বড়দি! মা একবার টের পেলে হয়।"

বড় বৌ কোলের ছেলেকে মেঝেয় নামাইয়া মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, "আপদ! যত জ্বালানি পোড়ানি আমার। এখনও যে কত কাজ বাকি।"

সুলতা খোকাকে কোলে লইয়া ভুলাইতে ভুলাইতে কহিল, "কাজ কি এ বাড়ির শেষ হবার? জনমভোর খাটলেও তা ফুরুবে না। নাও—ওঠ।"

চারু কহিল, "তোর ছেলেটা সুবোধ, তাই—"

সুলতা কহিল, "বোধ ওদের কারো নেই ভাই, না ছেলের, না বুড়োর। হাঁ, শুনেছ বড়দি? সেজ ঠাকুরপোর যে বে।"

চারু কহিল, "সত্যি? কবে লো?"

তপন কৌতুক করিয়া কহিল, "হাঁ গো—তুমি। আমি এমন ভাল রেজাল্ট করলুম—আর তোমাদের কাছে কোন Compliment কি পেতে পারি না?"

সুলতা বলিল, "Complimentএর যে অনেক Complain ভাই।"

তপন কৃত্রিম ক্রোধে মুখ ফুলাইয়া কহিল, "কিন্তু আমার Complainটাই হচ্ছে serious. যদি জানতে—"

সুলতা অসহায়ের মত দুটি চক্ষে মিনতি ঢালিয়া কহিল, "মাপ কর ঠাকুরপো।"

তপনের কৃত্রিম কোপ চলিয়া গেল। অভিমানে কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল, কহিল, "যত মাপ আমার বেলায়? বাইরের যাঁরা বেড়াতে আসেন—সকাল, দুপুর, সন্ধ্যেয়, রাত্রিতে—তাঁদের সামনে দিব্যি গলা ছেড়ে গাইতে তোমার একটুও বাধে না মেজ বৌদি!"

এই অনুরোধ রাখিতে না পারিয়া সুলতার সারা অন্তর এমনই উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল। তপনের কথায় অতি কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সে পিছন ফিরিল। আঁচলটা একবার চোখে তুলিয়াও দিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না,—তোমার সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে চাপার মত এই অসময়ে গান গাওয়ার অপরাধ এ বাড়ির পিনাল কোডের ধারায় গুরু শাস্তিই বহন করে। বাহিরে ওই ফার্ষ্ট ক্লাসে চাপিয়া সম্মান যেমন অব্যাহত ভাবে বাঁচিয়া যায়, তেমনই সময়ে অসময়ে পাঁচজন অভ্যাগতের সামনে গান গাওয়াটাও সম্মান বৃদ্ধিকর। তাই বলিয়া প্রকৃতি ত আদবকায়দার উপর স্থান সংগ্রহ করিতে পারে না। রীতি বাঁচাইয়া প্রকৃতিকে পালন করিতে হয়—এ তথ্য সুলতা বুঝিলেও তপনকে বুঝাইতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা আর কি আছে!

তবু সুলতা ফিরিল। আঁচলের উত্তাপে অশ্রুকে শুষ্ক করিয়া হাসি

মুখেই ফিরিল এবং এই আদবকায়দা-অনভ্যস্ত সরল বালককে ব্যথা দেওয়ার অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া নিজের লাঞ্ছনা গঞ্জনাকে তুচ্ছ করিয়া টেবিল হারমোনিয়মের সম্মুখে গিয়া বসিল।

তপন মনে মনে হাসিয়া কহিল, "এত সাধ্য সাধনাও তোমাদের করতে হয়।"

সুলতা রীডে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে কহিল, "সুর যে সাধনারই বস্তু, ঠাকুরপো।"

তারপর গাহিল।

গান শেষ হইলে তপন আনন্দে বিছানায় চাপড় মারিয়া কহিল, "চমৎকার!"

সুলতা বার বার শঙ্কিত দৃষ্টিতে দ্বারপথে চাহিয়া ঘামিয়া উঠিতেছিল। শেষ পর্য্যন্ত গান সব দিক দিয়াই চমৎকার হইল। গৃহিণী হয়ত তখন এ সীমানায় ছিলেন না।

সুলতা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া হাসিমুখে কহিল, "এর চেয়ে বড় **compliment** তোমায় যদি কেউ দেয়, ঠাকুরপো?"

তপন চক্ষুতে কৌতুক মাখাইয়া কহিল, "বল কি! কই, কোথায়? নিয়ে এস।"

সুলতা কহিল, "সে কি এক দণ্ডের গান গাওয়া! এত বড় বাড়িটায় নহবৎ বসবে, আলো জ্বলবে—"

তপন সলজ্জিত মুখ ফিরাইয়া কহিল, "আবার দুষ্টুমি আরম্ভ করলে?"

সুলতার হাসির মাত্রা বাড়িয়া উঠিল। কহিল, "এখন যে ভারি লজ্জা?"

তপন কহিল, "লজ্জা ত বটেই। মা হয়ত জানেন না সারদা-জী যে আইন করেচেন—তাতে এ-রকম অনাচার আর চলবে না।"

সুলতা কহিল, "সেত **dead law** হয়ে রইলো। কত খোকাখুকীর বিয়ে হচ্ছে সে হিসেব রাখ কি ?"

তপন কহিল, "রাখতেও চাই না। কি ধারণা তোমাদের মেজ বৌদি, ছেলে যাই পাস করলো—অমনি তার গলায় বোঝা বেঁধে না দিলে যেন পৃথিবীটাই উল্টে যায় !"

সুলতা কহিল, "তবে পাস করে ছেলে করবে কি ? পাস করার পরই ত লেজুড় জোড়বার পালা।"

তপন কহিল, "তোমায় কথায় পারবে কে, হার মানচি।" বলিয়া উঠিল।

সুলতা কহিল, "আহা! উঠলে যে, ঠাকুরপো ? তা ভয় নেই, লেজুড় এখনই জুটছে না, তার অনেক দেরি।"

তপন বিছানায় বসিয়া আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যাক, বাঁচা গেল। তাহলে অর্গ্যানটার ডালা খুলে আর একখানা—"

সুলতা ত্রস্তে দ্বার পথে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল এবং আর কোন কথা না বলিয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিল।

* * *

অনাগত শুভদিনের আয়োজন মানুষ বহু পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ করে। কয়েকদিন পরে এ বাড়িতে সুলতার ছোট বোন ছায়ার নিমন্ত্রণ হইল। বাহিরের দু-চার জন সম্ভ্রান্ত অতিথিও নিমন্ত্রিত হইলেন। মাসখানেক পূর্ব্বে ছায়া এ বাড়িতে আসিয়াছিল, কিন্তু তখনও সম্বন্ধ-বন্ধনের সাধ গৃহিণীর মনে জাগে নাই। মেয়েটিকে তিনি পূর্ব্বে বহুবার দেখিলেও—এ বাড়ির বধূরূপে কল্পনা করিয়া কোনদিন দেখেন নাই। কাজেই গৌরবর্ণের

মধ্যে কোথায় খুঁত, চালচলনে বা হাসিতে কোথায় মাধুর্য্য—এ সব খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিবার জন্য এই নিমন্ত্রণ।

অতিথিরা বৈঠক বসাইয়াছেন—গৃহিণীর শয়ন কক্ষে। ঘরে আলো জ্বলিয়াছে, ছায়া আসিয়াছে। তাহাকে পালঙ্কে বসাইয়া গৃহিণী সমাগত মহিলাবৃন্দের পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। ভাবটা, তোমরাই বল এই মেয়েকে বউ করিয়া এ বাড়িতে আনা যায় কি না?

উজ্জ্বল বিজলী বাতির আলোয় ছায়ার গৌরবর্ণ দেহ হইতে একটা জ্যোতি বাহির হইতেছিল। মুখের প্রসাধনটা কিছু কৃত্রিম ঠেকিলেও, বেমানান হয় নাই। কেন না, মেঝের দামী গালিচার উপর বসিয়া যে সব প্রৌঢ়া ও যুবতী জজ ব্যারিস্টার গৃহিণী পান গালে দিয়া পরস্পরের অলঙ্কার-সৌষ্ঠব ও রুচির প্রশংসায় আসর জমাইয়া তুলিয়াছিলেন,—তাঁহাদের সকলেরই মুখে রুজ, পাউডার, লিপষ্টিক্ প্রভৃতি আধুনিক প্রসাধনের চিহ্ন বর্ত্তমান। ছায়ার খোঁপা এলো; দুই চারিটা পাথর দেওয়া ক্লিপ কালো চুলের উপর বেশ মানাইয়াছে। শাড়িখানি মাদ্রাজী মেয়েদের মত পরা। গায়ে অলঙ্কারের পারিপাট্য না থাকিলেও যা দুই একখানি আছে দামী এবং প্যাটার্ণ হিসাবে কিছুক্ষণ চাহিয়া দেখিবার মত।

একটা বড় গোছের পান গালে পুরিয়া ছোট রূপার কৌটা হইতে খানিকটা সুবাসিত জরদা বাহির করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "এটুকু গালে না দিলে বাঁচি না। এখানকার ছাই ভস্ম মুখে তুলতে পারি না দিদি, তাই কাশী থেকে ফি হপ্তায় আনাতে হয়। দিব্যি ভুরভুরে গন্ধ—অথচ—" বলিয়া গালে ফেলিয়া দিলেন।

জজ গৃহিণী বলিলেন, "আমারও ওই দশা, লক্ষ্ণৌ থেকে আসে। ওঁর এক বন্ধু সেখান থেকে পাঠান। তা হ্যাঁগা নিস্তার, মেয়েটিত দিব্যি—বউ করবার মত। গায়ের রং বল, আর গড়ন পেটন বল,

কোথাও খুঁত নেই। লেখাপড়াও জানে বোধ হয়।" পরে ছায়ার পানে ফিরিয়া বলিলেন, "কতদূর পড়েছ মা ?"

ছায়া মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "এইবার ম্যাট্রিক দিয়েচি।"

জজ গৃহিণী মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "বেশ, বেশ। আমাদের সুমতি আসছেবার দেবে কি না—বেথুন থেকে। তা গান বাজনা সেলাই ফোঁড়াইও বেশ শিখেচ, না মা ?"

ছায়া মুখে উত্তর না দিয়া সম্মতি-সূচক লজ্জায় মাথা নামাইল।

জজ গৃহিণী খুশী হইয়া কহিলেন, "এ বউ তোমার ভালই হবে, ভাই। বিদ্যে শিখেচে—অথচ অহংকার নেই। বেশ নরম সরম।"

গৃহিণী কহিলেন, "আমাদের কপাল। আজই ত বিয়ে হচ্চে না; কর্ত্তার আবার ধনুক ভাঙ্গা পণ ছেলেকে আর দুটো পাস না দিইয়ে বিয়ে দেবেন না।"

সমাগতদের মধ্যে ইঙ্গিতপূর্ণ অপাঙ্গ বিনিময় হইয়া গেল।

ব্যারিস্টার গৃহিণী কহিলেন,—"শুধু এখানকার পাসে কি হয়, বিলেত না ঘুরিয়ে আনলে সভ্য বলে পরিচয় দেওয়া মিছে।"

এ কথায় জজ গৃহিণী ঈষৎ ঝাঁজালো সুরে কহিলেন, "পরিচয়ের কথা যদি বললে ত বিলেতই বল—আর জার্ম্মানিই বল, খাস ভারতবর্ষের মত কোন দেশেরই নয়। ওরা নাকি আমাদের শাস্তর ঘেঁটে কত কি তৈরী করেচে।

ব্যারিস্টার গৃহিণা কহিলেন, "তবু দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কি কম! উনি দুবছর বিলেতে ছিলেন, যখন ফিরে এলেন—যেন সে মানুষই নন। শুধু কি ধরণ ধারণ, কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত ভুলে বসে আছেন!"

জজ গৃহিণী বলিলেন, "ভাগ্যিস রক্ষে যে তোমায় চিন্তে পেরেছিলেন!"

ঘরে একটা হাসির রোল উঠিল।

ব্যারিস্টার গৃহিণী একটুও লজ্জিত না হইয়া সে হাসিতে যোগ দিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, "কর্ত্তার সেকেলে মত। বলেন, বৌ ঝি গান গাইবে, নাচবে এ সব কি বাপু? আর বই বগলে ইস্কুলে যাওয়ারই বা কি দরকার ওদের? রামায়ণ মহাভারত পড়তে পারে, চিঠিটা আসটা লিখতে পারে—এমন বিদ্যে থাকলেই যথেষ্ট। আমার সঙ্গে এই নিয়ে তিন বেলা কথা কাটাকাটি। আমি বলি, এ কি আমাদের গেরস্থ ঘর যে, পাট ঝাঁট বাসন মাজা রান্না নিয়ে বউ মেতে থাকবে! ওরা নবেল পড়বে, সেলাই করবে, গাইবে, নাচবে যখন যা খুশী করবে। যেমন কালের হাওয়া—কি বল গো দিদি?"

জজ গৃহিণী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "তোমার মত শাশুড়ী পাওয়া ত শত জন্মের তপস্যার ফল। শাশুড়ী ত নও,—মা।"

গৃহিণী পুলকিত হইয়া কহিলেন, "এই দেখনা ভাই, জেদ করে কর্ত্তা বড় ছেলের বিয়ে দিলেন এক মুখ্যুর ঘরে। কোন চর্চ্চাই কি তাদের নেই! খালি পারে ঘর ঝাঁট দিতে, বিছানা পাট করতে, আর ছেলেদের পহরে পহরে গেলাতে! পাঁচজন ভদ্দর মেয়ের সঙ্গে এক আসনে সে বসতেও পারে না। আর এই আমার মেজ বৌ। নিজে দেখে শুনে তবে মা লক্ষ্মীকে ঘরে এনেছি। গাইতে, বাজাতে, সেলাই ফোঁড়াইয়ে একেবারে চৌকস। বুদ্ধিই কি কম? মা আমার সবদিক দিয়েই লক্ষ্মী।" বলিয়া সুলতার চিবুক স্পর্শ করিয়া একটি চুমা খাইলেন।

জজ গৃহিণী বলিলেন, "ছায়া বুঝি মেজ বৌমার বোন?"

"হাঁ, খাসা মেয়ে। যেমন ভদ্দর বংশ, তেমনি শিক্ষিত। ওই ত সম্বন্ধ করলে। বললে, মা, আমাকে যেমন তোমার মেয়ে করে নিয়েছ, তেমনি ছায়াটাকেও নাও। ছেলে বেলা থেকে মা-হারা আমরা—নতুন

করে তোমায় পেয়ে বর্তে গেছি। আহা!" বলিয়া অবনতমুখী সুলতার চিবুক স্পর্শ করিয়া আর একবার চুমা খাইলেন।

সমাগত মহিলারা কলরব করিয়া উঠিলেন, "আহা—তা আর নয়। মা আর শাশুড়ী কি ভিন্ন!"

জজ গৃহিণী বলিলেন, "তা পাওনা থোওনা বিয়ের একটা আছে—"

গৃহিণী হাস্যমুখে কহিলেন, "কিসের অভাব আমাদের—যে ওদিক দিয়ে গোল বাধবে? আসল কথা পছন্দ। তোমরা পাঁচ জনে—আশীর্ব্বাদ কর—মত দাও--তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ওই বড় বৌমার বাবা যে এক পয়সাও দেন নি, মেজ বৌমারও তাই! তা বলে আমরা কি গরীব হয়ে গেছি। ও-সব কিছু না, মা, কিছু না। কুটুমের টাকা নিয়ে কেউ কখনও বড়লোক হয় নি।"

আর একবার কলরবে প্রশংসার গুঞ্জনধ্বনি উঠিল।

অবনতমুখী সুলতা একবার মুখ তুলিয়া ছায়ার পানে চাহিল। লজ্জায় সে কাঠ হইয়া বসিয়া আছে। জীবনে অনেক বারই পরীক্ষার ক্ষেত্র সুবিস্তৃত হয়, কিন্তু এমন কঠিন পরীক্ষা নারীজীবনের আর কি-ই বা আছে? জানিয়া শুনিয়া কেন সুলতা ছোট বোনটিকে এই মায়াজালে জড়াইতে ব্যগ্র হইয়াছে। সে-ও চারুর মত ভবিষ্যতের আশা রাখে বৈ কি। তপন ছেলে ভাল। বিদ্যায়, চেহারায়, ব্যবহারে এমনটি সুলতার চোখে পড়ে নাই। সংসারে উত্তাপ আছে স্বীকার করিলেও, সেত চিরস্থায়ী নহে। প্রখর গ্রীষ্মে বিদগ্ধ প্রান্তরে জরাজীর্ণ শুষ্ক তরুলতা বাঁচিয়া থাকে—শুধু কোমল বর্ষার বারি-বিন্দু প্রতীক্ষায়। বাহির হইতে ত এ বিশ্ব বড়ই সুন্দর। প্রতি সংসারকে মনে হয় শান্তি নিকেতন। কিন্তু মালিন্য আবর্জ্জনার রাশি, কলুষ বাষ্পের বিন্দু আলোর নীচের অন্ধকারের মত কোথায়ই বা না সুপ্রকট!

সুলতা এ সংসারকে জানে। বাক্যে, ব্যবহারে কোথায় যে এর পার্থক্য বা বিরোধ দিবালোকের মত তাহার চোখে সুস্পষ্ট। বাহিরে রুচি, সভ্যতা, বদান্যতার জয়ধ্বনি গীত হইলেও—সৌধান্তরালে পুঞ্জীভূত অন্ধকার। তবু বোনটি আসিলে নিজের স্নেহ-পক্ষপুট বিস্তার করিয়া এতটুকু ছায়ায় তাকে রাখিতে পারিবে; উত্তাপ-বিন্দুও গায়ে লাগিতে দিবে না। এই আশায় সুলতার এ বিষয়ে আগ্রহ সমধিক।

গানের পরীক্ষায় পাস করিয়া ছায়া সুলতার সঙ্গে নীচে নামিয়া গেল। যে ঘরে তপন বসিয়া নূতন পাঠ্য পুস্তকে মনঃসংযোগ করিয়াছিল সুলতা ছায়াকে লইয়া একেবারে সেই ঘরে উপস্থিত।

জুতার শব্দে তপনের মনোযোগ ভাঙ্গিল।

সুলতার পশ্চাদ্বর্ত্তিনীকে দেখিয়া সে একটু বিস্মিত হইল।

সুলতা হাসিতে হাসিতে কহিল, "চিনতে পারচো না, ও যে ছায়া।"

পরিচয়ের অন্তরালে ছোট ইঙ্গিতটুকু সুস্পষ্ট হইয়া উঠাতে তপন পুনরায় পুস্তকে মনোনিবেশ করিল। সুলতা আর একটু অগ্রসর হইয়া দু'খানা চেয়ার টানিয়া ছায়াকে লইয়া জাঁকিয়া বসিল। মুখে মৃদু হাসি ফুটাইয়া কহিল, "তোমার যে পড়াশুনোয় ভারি মনোযোগ—একথা চাক্ষুষ না দেখলেও—"

তপন মুখ না তুলিয়া উত্তর দিল, "কিন্তু রাত আটটায় হঠাৎ এ ঘরে হানা দেওয়ার অর্থ কি তাতো আমি বুঝতে পারচি না।"

সুলতা কহিল, "চুরির আশঙ্কা মিছে, ঠাকুরপো। গৃহস্থ যখন সজাগ।"

তপন কহিল, "সজাগ গৃহস্থেরই চুরি হয় বেশি। তা যাক, যখন অযাচিত ভাবে এসেচ—তখন সুধাকণ্ঠের—"

সুলতা কহিল, "একখানা কেন—যত ইচ্ছে।"

তপন খুশী হইয়া কহিল,"হঠাৎ এত বদান্যতা কেন জানতে পারি কি ?"

স্নলতা বলিল, "মহামান্য অতিথির আগমন যেহেতু। আজ কিন্তু পচা পুরোনো গান নয় ঠাকুরপো,—ওই যা ভুলে গেছি—। আমিই মরচি বকে তুমি দিব্যি নেপথ্যেই রয়েচ !"

তপন কহিল, "আমাদের পরিচয় এত আকস্মিক নয় যে, আদবকায়দা নিয়ে রঙ্গমঞ্চে নামতে হবে !"

ছায়া মৃদু হাসিয়া মুখ নামাইল।

তপন কহিল, "অথচ একমাস আগের ছায়ার সঙ্গে আজকের ছায়ার সাদৃশ্য খুব কম। বিশেষ রকম আয়োজন করে ওকে যেন এ বাড়িতে আসতে হয়েচে।"

লজ্জায় ছায়া ত মুখ তুলিলই না, স্নলতাও বোধ করি লজ্জায় অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। তপন রহস্যচ্ছলে কথাটা বলিলেও তিন বৎসর পরের এক ভাবী শুভলগ্নের অসঙ্গত ইঙ্গিত সে কৌতুক কণায় ফুটিয়া উঠিল। পণ্য যাচাইয়ের মত সেটা অশোভন ও সম্মান হানিকর। উভয়ের লজ্জানত মুখ দেখিয়া অনুমানে তপনও সে কথাটা বুঝিল। বুঝিয়া অনুতপ্ত স্বরে কহিল, "দোহাই মেজ বৌদি, আমি অন্য কিছু ভেবে বলিনি। শুধু বিলিতী সাজ সজ্জা করে —"

স্নলতা মুখ ফিরাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "জানি—ঠাকুরপো। তবু অবস্থার গতিকে আমরা বাধ্য হয়েই মেনে চলি। আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির ওপর চশমা আঁটা। তার ভেতর দিয়েই সংসারের সঙ্গে আমাদের পরিচয়।"

কি কথা প্রসঙ্গে কি কথা আসিয়া পড়িল ! জীবনের আনন্দময় ক্ষণটির উপর সহসা কে যেন গুরু বোঝা চাপাইয়া দিল ! তপন অপ্রতিভ ও ব্যাকুল হইয়া অর্গ্যানের কাছে উঠিয়া আসিল ও রীডের উপর অঙ্গুলি

চালনা করিতে করিতে কহিল, "তোমাদের স্বাগত জানানো আমার কর্ত্তব্য।" তারপর কি গাহিবে ঠিক করিতে না পারিয়া পুরা একখানা গৎই বাজাইয়া গেল।

সুলতা হাসিয়া বলিল, "এটা কি পটোত্তোলনের পূর্ব্বে ঐকতান ?"

তপন মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, মাঙ্গলিক।"

সুলতা হাসিয়া বলিল, "বটে, বটে! ঠাকুরপো ত খুব চালাক! কিন্তু ও সব আচার অনুষ্ঠান আমাদের, সুতরাং ওঠ।"

দারুণ লজ্জায় তপন উঠিয়া পড়িল। আজ তাহার হইল কি? কথায় কথায় এমন অপ্রস্তুত সেত কখনও হয় নাই। কলেজে সে তর্কবীর, অথচ আগন্তুক এক তরুণীর সামনে সামান্য কথায় এমন অপদস্থ হওয়া···

সুলতা বলিল, "ভয় নেই, লজ্জাও করো না। পরের কর্ম্ম পরের উপরই বরাত রইল। এখন —আয় না ছায়া। বোস।"

কিন্তু ছায়াকে বসিতে হইল না। চারু আসিয়া দ্বারপথে উঁকি মারিয়া কহিল, "তোরা বুঝি এ ঘরে? মা যে ছায়াকে খুঁজচেন। ওঁরা এক সঙ্গেই খেতে বসবেন কিনা।"

সুলতা তপনের পানে চাহিয়া বলিল, "সবটাই মুলতবী রইল, ঠাকুরপো। তা তুমি অমন হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বস। মনোযোগ ভঙ্গকারীরা চললো, দেখ যদি পড়ায় মন বসে।"

ছায়া হাত দুখানি তুলিয়া সুন্দর একটি নমস্কার জানাইয়া সুলতার সঙ্গে কক্ষত্যাগ করিল।

পড়ায় মনোযোগ বসিল না। সে-মনে তখন অনেক কিছু বিশ্লেষণ আরম্ভ হইয়াছে। আজিকার ব্যবহার কি খুব অসঙ্গত হইয়া গেল? ছায়া ভাবিবে কি? লোকটা ভাল রকম কথা কহিতেও জানে না, খালি পাস করিয়া বোঝা বাড়াইতেছে! কিন্তু সে যাহা হউক, তপনের

বিক্ষিপ্ত আচরণের বহু নিম্নে ছায়ার সজ্জা-পারিপাট্যের বাহুল্য প্রথম দেখার মুহূর্ত্তটি হইতে তট ভঙ্গকারী তরঙ্গ তুলে নাই কি? একমাস পূর্ব্বের সেই স্যাম্পেন রঙের শাড়ি পরা তেমনই সাদাসিধা ব্লাউজ গায়ে ছায়া—আজ বিলাতী ক্রীম-পাউডার-এসেন্স-মণ্ডিত ছায়ার পাশে দাঁড়াইতেও পারে না। এত প্রভেদ! সেইদিনের বালিকা ছায়া আসিয়াছিল—অনাহত সুরের মত, নিয়ম-না-মানা ছন্দের মত, স্বতঃ-বিকশিত পুষ্প মঞ্জরীর মত। আজ তার স্ফুরিত রক্তাধরে, সলজ্জ হাসিতে, চটুল দৃষ্টিভঙ্গিতে ও মৃদু মন্থর গতিতে সেই বাল্যকালকে লাঞ্ছিত করিতে ফুটিয়াছে অনাগতের গৌরব-গর্ব্ব। তাইত মুখ হইতে সত্য কথাটাই অমন অতর্কিতে বাহির হইয়া গেল।

তপন হাসিল। সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে উঠার কথা তার মনে পড়িয়া গেল। দূর ছাই! এই সেদিনের পরিচিতা বালিকার সঙ্গে আবার কথা কহিবার আদবকায়দা? বয়স বাড়িতেছে—বিজ্ঞতা বাড়িতেছে বলিয়া পুরাতনকে নূতন পরিচয়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ করিয়া নূতন কৃত্রিমতার সৃষ্টি করা কেন? না; মনের একটা বড় দোষ ভাবিতে আরম্ভ করিলে —থামিতে সে চায় না।

চটি পায়ে দিয়া সে সুবোধের সঙ্গে দেখা করিতে বাহির হইয়া গেল।

* * *

সুবোধ তপনের চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়। বি, এ, পাস করিয়া বৎসর খানেক নানা স্থানে হাঁটাহাঁটি করিয়াও কোন আপিসের দরজায় মাথা গলাইতে না পারিয়া তপনদের কলেজে ফিজিক্যাল ডিরেক্টার হইয়াছে! শরীরচর্চ্চার শিক্ষা দিয়া সকাল বিকাল সে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিত। কলিকাতার খরচ চালাইয়া বাড়িতে বেশ দু-পয়সা পাঠাইতে

পারে বলিয়া দুশ্চিন্তার কালোছায়া মুখের পেশীকে সঙ্কুচিত করিতে পারে নাই। তাহার বিস্তৃত বুকের মধ্যে আশা ও সাহস দুই-ই ছিল প্রচুর।

বছর দুয়েক পূর্ব্বে—কি একটা উৎসব উপলক্ষ্যে তপনদের কলেজে সে স্বাস্থ্য-চর্চ্চা দেখাইবার নিমন্ত্রণ পায়। তাহার সুগঠিত দেহ ও ব্যায়াম কৌশল দেখিয়া সকলেই ধন্য ধন্য করেন। সেই ধন্যবাদের পালা শেষ হইলে—তপন চুপি চুপি তাহার হাত ধরিয়া বলিয়াছিল, "আমায় একটু শিখিয়ে দেবেন, স্যর?"

সুন্দর ছেলেটির আগ্রহ দেখিয়া সুবোধ সানন্দে সম্মত হয়। সেই হইতে শিষ্যত্ব ও বন্ধুত্ব।

এই অসাধারণ শক্তিশালী যুবকের বাহ্যিক শক্তির মূলে যে অনন্ত সঞ্চয় তার সন্ধানও তপন কিছু কিছু জানিত। সুবোধ অন্তরে বাহিরে—মেঘলেশহীন আকাশের মধ্যাহ্ন সূর্য্য। তার ব্যবহার ও চরিত্রে কোথাও ছায়ার কণা মাত্র ছিল না। সে যাহা বলিত, যাহা করিত—সরল, সুন্দর অথচ তেজপূর্ণ। আপিসের দুয়ারে আসিয়া উদার বিস্তৃত হৃদয় তাহার তাই চাটুবাদের সঙ্কীর্ণতার—লজ্জায় বার বার ম্রিয়মান হইয়া পড়িত। এত আবর্জ্জনা ও জঞ্জাল সঞ্চিত আছে ওই বিদ্যুতালোকোদ্ভাসিত সুদৃশ্য সৌধাভ্যন্তরালে! শতবর্ষাধিক মনোবৃত্তির অটুট আধিপত্য ওই চেয়ার গুলিতে যেন মাখানো। আলোর দীপ্তিতে, পাখার হাওয়ায়, টেবিলের খাতা কলমে নিত্যই কি আত্মাবমাননার কৃষ্ণজ্যোতি নিঃসারিত হইতেছে না? ওই ধূম-মলিন কক্ষে বসিয়া যান্ত্রিক জীবনের কর্ত্তব্য সাধন এই জীবনে তাই তাহার ঘটিয়া উঠিল না। সে মেসে থাকিয়া ওই সব অট্টালিকার কাহিনী বহুদিন শুনিয়াছে। শুনিয়াছে, অন্যায়, পাপ, অবিচার, দয়া-দাক্ষিণ্য-হীনতার চক্রতলে দীন

হীন জীবনের মর্ম্মন্তুদ নিষ্পেষণ ইতিহাস। শুনিয়াছে, প্রতিকারহীন আলস্যের ভীরু অভিশাপ, ভয় ব্যাকুল অন্তরের অজস্র ইতর গালি গালাজ। প্রসাদ কণার লোভে কেমন করিয়া মানুষ অধোগামী হয়—সে সব তথ্যও সুবোধের অবিদিত্ত নহে। তথাপি সে তাহাদের মধ্যেই বাস করে। শ্রী-ভ্রষ্ট ভগ্ন বাড়ি, ধূলিপূর্ণ কক্ষ এবং চারি পার্শ্বে এই সব স্বার্থ-সঙ্কীর্ণ দাসমনের প্রাচীর। কুৎসার কলরোল উঠিলে সুবোধ পেশী সঞ্চালনে মনোনিবেশ করে; কলহ উত্তাল হইলে চটি পায়ে দিয়া পার্কের হাওয়া খাইতে বাহির হয়। কানে অভাব অভিযোগ ত নিত্যই শোনে, মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কোন পক্ষের উৎসাহ সে বর্দ্ধন করে না। এই আবেষ্টনীর চেয়ে ভয় করে সে নিজের মনকে বেশি। ছোট একটি বীজ উত্তপ্ত পাষাণ শিলায় পড়িয়াও যেমন ক্ষুদ্র এক কণা মাটির আশ্রয়ে কখনও কখনও অঙ্কুরিত হয়, নির্লিপ্ত মনের তলায় অমনই এক কণা মাটি আছে। কৌতূহলের বীজ যদি তাহাতে পড়িল ত রক্ষা নাই। লোককে খাটো করিয়া নিজের বড় হইবার প্রয়াস—প্রতি নিয়তই যে চোখের সম্মুখে দৃষ্টান্ত রচনা করিতেছে। কম বেশি এই দুর্ব্বল বৃত্তিকে লালন করিবার লোভ কোন মানুষেরই বা নাই?

সন্ধ্যার ব্যায়াম বহুক্ষণ শেষ হইয়াছে। পার্কে পায়চারি সারিয়া সুবোধ আপন কক্ষে আসিয়া বসিয়াছে। ক্ষুদ্র কক্ষ। সব ঘরগুলির শেষে, একটু নির্জ্জনও বটে। সীট্‌রেণ্ট বেশী হইলেও এই নির্জ্জনতা-টুকুর লোভে সে এই ঘরখানিই বাছিয়া লইয়াছে। ঘরের আসবাব খুব কম। একখানা জারুল কাঠের তক্তাপোষ, তাহাতে সতরঞ্চি ও বালিশ গোটা দুই। শীত কালের ব্যবহারোপযোগী র‍্যাগটা এক পাশে গুটানো আছে। ঘরের এককোণে বেতের একটা র‍্যাক। র‍্যাক ভর্ত্তি ব্যায়াম সম্বন্ধীয় অনেকগুলি বই; রামকৃষ্ণ কথামৃত ও বহু মনীষীর জীবন-

বৃত্তান্ত। র‍্যাকের পাশে যে ছোট জানালাটি আছে তাহার মাথায় রামকৃষ্ণ ও কালীমাতার ছবি টাঙানো। এ দিকের দেওয়ালে কাপড় জামা রাখিবার ছোট একটা দেওয়াল আলনা ও তার উপরে দেশ বিদেশের ব্যায়াম বীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি। কোণে বড় একটা ট্রাঙ্কের মাথায় ছোট একটি স্যুটকেশ, অন্য কোণে জলের কুঁজা।

গ্রিপ ডাম্বেল, চেষ্ট একস্প্যানডার প্রভৃতি জিনিষগুলি ছোট একখানা তক্তার উপর সাজানো আছে। ঘরখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সুবোধ প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় নিজের হাতে ধুনা জ্বালিয়া দেয়; কখনও কখনও রামকৃষ্ণ ও কালীমাতার গলদেশে পুষ্পমাল্যও বিলম্বিত হয়।

সুবোধ তক্তাপোষের উপর বসিয়া Mullarএর বই পড়িতেছিল। তপন আসিয়া তার পাশে বসিল।

সুবোধ মুখ তুলিয়া হাসিয়া কহিল, "কিরে, এমন অসময়ে?"

তপন বলিল, "একটা কথা আছে। কিন্তু সুবোধদা, আমার ভারি আশ্চর্য্য বোধ হয়, এত হট্টগোলের মধ্যে পড়ায় মনোযোগ দাও কি করে? ওইত পাশের ঘরেই পাশার হট্টগোল, তার পাশে বেসুরো হারমোনিয়মের উপদ্রব—সব ওপরে ম্যানেজারের গলাবাজী।"

সুবোধ বই মুড়িয়া রাখিয়া কহিল, "প্রথম যখন ক'লকাতায় আসি—তিন রাত্রি ঘুমোতে পারিনি। ঘর্ঘর ট্রামের আওয়াজ, লরির ঘর কাঁপিয়ে চলা, ট্যাক্সির ভোঁ—ঘোড়ার গাড়ির কলরব, তার ওপর নতুন জায়গায় নতুন লোকের মধ্যে বাস। ক্রমে সব সয়ে গেল। এখন সবেতেই মনোযোগ দিতে পারি। শব্দগুলো ওঠে, কিন্তু কানের বেশি দূর পর্য্যন্ত পৌছয় না কিনা।"

তপন হাসিয়া কহিল, "রক্ষে কর তোমার অভ্যাস। আলাদা ঘর

নিয়েছ বটে, অসুবিধা একটুও দূর হয় নি! অন্য মেস দেখ না কেন সুবোধ দা?"

সুবোধ বলিল, "এক মূক বধিরের আশ্রয় হলে মন্দ হয় না, অন্য সব জায়গাই ত এমনি।"

তপন বলিল, "তবু ধর তেতলায় নিরিবিলি ঘর একখানা। তা হলে এঁদের হৈ-হৈ হট্টগোলের হাত থেকে অন্তত বাঁচতে পার।"

সুবোধ বলিল, "এই সদুপদেশ দেবার জন্যই কি রাত্রিতে এতদূরে ছুটে এসেছ?"

তপন ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "না। তুমি আবার ও-সব চর্চ্চা সইতে পার না—"

সুবোধ বলিল, "চর্চ্চা মাত্রই খারাপ যদি তা উঁচুদরের না হয়। যে অবস্থা তোমার অসুবিধা ঘটাচ্ছে না—তা নিয়ে অনর্থক যুক্তি উৎসাহ খরচ করা—আমার মতে ঘোরতর অপব্যয়। শরীর সম্বন্ধে দু'একটা উপদেশ নেবে বোধ হয়।"

তপন বলিল, "না, সে কথা বলতেও আমার লজ্জা বোধ হচ্ছে।"

সুবোধ বিস্মিত হইয়া কহিল, "লজ্জা!"

তপন মাথা নীচু করিয়া কহিল, "হাঁ। আমার বিবাহের সম্বন্ধে—"

সুবোধ কহিল, "তোমার বিবাহ! নিশ্চয়ই তুমি রহস্য করচো না, তপন?"

তপন চিন্তাকুল মুখখানি তুলিয়া কহিল, "রহস্য ত নয়ই—এ এক ঘোর সমস্যা। আমাদের পারিবারিক প্রথা—"

সুবোধ বলিল, "কিছু কিছু জানি। বাল্য বিবাহ তার মধ্যে একটি।"

তপন বলিল, "আমার সৌভাগ্য ও-জিনিষটি এত শীঘ্র আমার কাঁধে চাপছে না। অন্তত বছর তিনেক দেরি।"

সুবোধ বলিল, "তবে চিন্তার কারণ ?"

তপন বলিল, "বিবাহটা এখন না চাপলেও বন্ধনটা যেন চেপেছে বলে বোধ হচ্ছে। আজই এক কুমারী কন্যা এসে হাজির।"

সুবোধ বলিল, "বাক্যদানের পালা বুঝি ?"

তপন বলিল, "হাঁ—তাই। বাড়ির সকলের আগ্রহ অত্যধিক ; তিন বছর বাদে ওরই সঙ্গে তাঁরা আমায় বাঁধবেন। কিন্তু—"

—"কিন্তু কি ?"

—"কিন্তু আমার পক্ষে—শুধু আমারই বা বলি কেন, তোমার যদি ওই রকম অবস্থা হত ত তুমিই কি ভাবতে না ? তার রূপ—তার গুণ জানলুম, কিন্তু আচরণের অসামঞ্জস্য আমায় পীড়া দিচ্ছে। তিন বছর বাদে আচরণ যদি উগ্র হয়ে ওঠে—তবেই ত মুস্কিল।"

সুবোধ বলিল, "হয়ত উগ্র না-ও হতে পারে। দু'জনকেই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়—তবে আসে মিলনের আনন্দ। আমার বিশ্বাস, দু'জনের মনের আদান প্রদানের ফলে সে ত্যাগ আপনিই আসবে।"

তপন কোন কথা কহিল না।

সুবোধ বলিতে লাগিল, "ও সব ভবিষ্যতের কথা এখন থাকুক। তিন বছরের রঙীন স্বপ্নটা বয়ে বেড়ানোই কি তোমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে তপন ?"

তপন মুখ নামাইয়া কহিল, "স্বপ্ন ও চিন্তা দুই-ই। এ ভাবে কথা দেওয়ার মানে আমায় নষ্ট করা।"

সুবোধ হাসিল, "যে নষ্ট হবার জন্য বসে আছে—তার কথা আলাদা। কিন্তু এই একটু আগের কথাই ধর, ও ঘরের হৈ চৈ হট্টগোলে আমার পড়ার ব্যাঘাত হয়নি বলে তুমি আশ্চর্য্য বোধ করছিলে, অথচ বেশ জান, শব্দ কানে নেওয়া ও মনে আশ্রয় দেওয়ার কত তফাৎ।"

তপন বলিল, "তোমার সঙ্গে আমার তুলনা ?"

সুবোধ বলিল, "আমরাও একদিন কুড়িতে ছিলাম, তারপর অনেকগুলি ধাক্কা সামলে পঁচিশে এসেছি।"

তপন বলিল, "তবু—স্বপ্ন দেখাব কালে তোমার আত্মীয়-স্বজন বোধহয় ইন্ধন যোগান নি, যেমন আমার বেলায় হচ্ছে ! তুমি আছ নিরিবিলিতে। তোমার বই, ডাম্বেল—"

সুবোধ বলিল, "ও-গুলো যে পন্থা। তোমারও কলেজ তেমনি। বাপ মার কথা বাদ দাও, ওঁরা ছেলের জন্ম থেকেই—ওই বাসনার ইন্ধন যোগান। একটা গল্প শুনবে ? আমাদেরই দেশে এক ঘর গরীব তাঁতী থাকতো। বড্ড গরীব তারা, কায় ক্লেশে সংসার চলে। চারদিকে দেনাও কিছু আছে। তাঁতীর একমাত্র ছেলের বয়স যখন ষোল, তখন বাপ মা দু'জনেই হঠাৎ মারা গেল। একদিন আমাদের বাড়িতে পাড়ার মেয়েরা বসে সেই তাঁতীর মরার খবর নিয়ে দুঃখ করছিলেন। হঠাৎ বাড়ির প্রবীণা গোছের এক ঠান-দি বললেন, "তা বোন, দুঃখু মিছে। যা হোক বেচারীরা একটা ভাল কাজ করে গেছে, ছেলেটাকে মানুষ করে গেছে !"

কে একজন বললেন, "সেকি ঠান-দি, ছেলেটা শুনেচি—কোন কাজ করে না, টো টো করে ঘুরে বেড়ায় !"

ঠান-দি হেসে বললেন, "শুনিস্‌নি, ছেলের যে গেল ফাল্গুনে বিয়ে দিয়েচে !" এই কথায় আর কেউ কথা কইলেন না। বেশ বুঝলাম, তারা আশ্বস্ত—হয়েছিলেন।"

তপন হাসিয়া বলিল, "মস্ত বড় নির্ভাবনার কথাই বটে !"

সুবোধ বলিল, "দেনাপত্র যাই থাক, সংসার করার ইচ্ছেটা সকলের রয়েচে কিনা—তাই তাঁরা খুশী হয়েছিলেন। আমাদের দেশে এত অভাব

হাহাকারের মূলেও এই মনোভাব। জীবনে যদি বিদ্যা না আসে, অর্থ না আসে ত ক্ষতি নেই, একটি বধূ এলেই নিশ্চিন্ত!''

তপন বলিল, "এ বোধ হয় slave mentality?"

সুবোধ বলিল, "ও বিষয় নিয়ে তর্ক এখন থাক। ইতিহাসের অন্ধকার যুগে অর্থাৎ আমাদের স্বাধীন পূর্ব্বপুরুষগণ কি আচার নিয়ম মেনে চলতেন—তা বলা এখন বড় শক্ত! ভেবোনা, তিন বছরে অনেক-গুলি দিন, সে সব দিনের চিন্তা এখন না-ই বা রইলো?"

তপন বলিল, "তোমায় যে ঠিক বোঝাতে পারচিনা, সুবোধ দা! কন্যাটি বেথুনে পড়ে—আমার মেজ বৌদির বোন। তার যাওয়া আসা বন্ধ করবার হাত আমার নেই যে।"

সুবোধ সহসা কোন উত্তর না দিয়া কি যেন চিন্তা করিল। প্রশস্ত ললাটে কুঞ্চন রেখা ফুটিয়া উঠিল। ভ্রূনিম্নে অর্দ্ধ মুদ্রিত চক্ষু; ওষ্ঠের উপর ওষ্ঠ চাপিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত সে ধ্যানমগ্নের মত বসিয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে বলিল, "তোমার বিবাহ করাই উচিত, তপন।"

তপন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তুমিও এই কথা বললে সুবোধ দা?"

সুবোধ বলিল, "উচিত। কেন না, প্রবল একটা কিছুকে দমন করতে হলে প্রবলতর একটা কিছু চাই। তোমার কলেজের চেয়ে বাড়ি হয়ে উঠেছে—রমণীয়।"

তপন শুষ্ক মুখে কহিল, "না, না—"

সুবোধ কহিল, "না যদি ত ভাবীর চিন্তায় এত উদ্বিগ্ন হয়েছ কেন? মনে করতে পার না কেন—ও সব এখন তোমার পক্ষে জঞ্জাল। তোমার পড়ার সঙ্গে স্বপ্নকে মিশিয়ে হাঁপিয়ে উঠচো কেন?"

তপন ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, "হয়ত আমি দুর্ব্বল, তাই। সুবোধদা,

সত্যি বলতে কি এ বিষয়ে আমার বাড়িই হয়েচে আমার কাল। সেখানে কেবল ওই সব আলোচনা—ওই সব কথা।"

সুবোধ তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া সস্নেহে কহিল, "কিছু না। তুমি মনের মধ্যে এক দুর্গম দুর্গ তৈরী কর—যেখানে ও সব গোলাগুলির কোন কিছুই পৌছবে না। মনে কর, এ তোমার তপস্যা! সংসার পাতাটাই জীবনের সবচেয়ে উচ্চ লক্ষ্য নয়, জীবনতীর্থের সুগম পথও নয়। জেনো তপন, সংসারের প্রাচীরে একবার যদি বাধা পাও, কিছুতেই জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে—তোমার প্রবেশলাভ ঘটবে না। কিন্তু জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে সংসার পাতার অবসর প্রচুর। সুতরাং, আগে কর অর্জ্জন—তারপর প্রতিষ্ঠা।"

তপন উজ্জ্বল মুখে বলিল, "চেষ্টা করবো। তুমি দিনকতকের জন্য তোমাদের দেশে আমায় নিয়ে চল না। এখানে মন যেন হাঁপিয়ে উঠচে।"

সুবোধ বলিল, "আসচে পূজোয়, কি বল?"

তপন উৎসাহিত হইয়া বলিল, "সেই ভাল। বাড়ির পূজো ত ফি বারেই দেখি। এবার পাড়াগাঁয়ে ঘুরে আসা যাবে।"

* * *

পরের সপ্তাহে।

তপন আপন নির্জ্জন কক্ষের দুয়ার বন্ধ করিয়া পাঠ্য বিষয়ে মনঃ-সংযোগ করিয়াছে এমন সময় বাহিরে করাঘাত হইল।

প্রথমটা তপন মনোযোগ দিল না। কিন্তু কক্ষ বাহিরে কাঠের কপাটে আঘাতটা ক্রমাগত বাজিতে থাকায় সে বিরক্ত হইয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

মেজ বৌদি সুলতা হাসিতে হাসিতে কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ঠাকুরপো কি স্মৃতি-ধ্যানে মগ্ন ছিলে?"

তপন জানিত ইহার কাছে বিরক্তি প্রকাশ করার অর্থ রহস্যের

উৎস উৎসারিত করিয়া দেওয়া। তাই সে কথায় কান না দিয়া গম্ভীর ভাবে কহিল, "কাল ক্লাসে সায়ান্সের একটা লেকচার আছে।"

সুলতা বলিল, "এদিকেও একটা সুখবর। সুনীল ওবেলা এসেছিল, কাল রাত্রিতে আমাদের বাগবাজার যেতে বল গেচে।"

তপন কহিল, "কিন্তু আমার ত সময় হবে না, মেজ বৌদি। কাল সন্ধ্যের পর এক জায়গায় ফিজিক্যাল ফীট্‌স্‌ দেখবার নিমন্ত্রণ।"

সুলতা বলিল, "তা কি হয়? ওদের এই বলার অর্থ তোমাকে বাদ দিয়ে নয়। যাওয়া চাই।"

তপন বিপন্নের মত কহিল, "খুব হয়, তুমি একটু বুঝিয়ে বলো।"

সুলতা বলিল, "নিমন্ত্রণ নিয়ে না গেলে ভদ্রলোককে সম্মান দেখানো হয় না—এ বোধ হয় জান?"

তপন বলিল, "বিশেষত তাঁরা একেবারে অনাত্মীয় নন। এ ক্ষেত্রে তোমাকেও খাটো হতে হবে। তবু মেজ বৌদি, আমায় মাপ করো।"

সুলতা সাশ্চর্য্যে কহিল, "তার মানে? ভদ্রলোকের বাড়ি নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যাওয়া তোমার পক্ষে খুবই শক্ত বুঝি? এতটা আদবকায়দা কবে থেকে শিখলে, ঠাকুরপো?"

তপন এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া কহিল, "তবে শোন। আদবকায়দার আবরণ আমার সহ্য হয় না। তোমরা মনে মনে যে আকাশকুসুম ফুটিয়ে তুলচো, আমার সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই। ওতে আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই বলেই ও-সব avoid করতে চাই।"

সুলতা অল্প একটু আহত হইয়া কহিল, "তুমি মস্ত বড় বীর-পুরুষ সন্দেহ নেই, ঠাকুরপো! সহজ ভদ্রতাকেও আমলে আনতে চাও না।"

তপন সুলতার অভিমান গদগদ স্বরে অপ্রতিভ হইয়া কহিল,

"ঠিক তা নয়। আমার মনের কথা তোমায় ঠিক বোঝাতে পারচি না বলে, তুমি দুঃখ করচো। দেখ মেজ বৌদি, এখন পড়াশোনার সময় ও সব চর্চ্চা করায় কি ক্ষতি হয় না ?"

সুলতা মুখ না ফিরাইয়া কহিল, "বেশ ত, আমি ফোনে বারণ করে দিচ্চি তাদের।"

তপন ব্যস্ত হইয়া কহিল, "সে বড় বিশ্রী দেখাবে! তার চেয়ে—থাক, আমি না হয় যাব। কিন্তু এই শেষ। ভবিষ্যতে এ বিষয়ের প্রসঙ্গ মাত্রও তোমরা আমার কাছে তুলো না।"

সুলতা বলিল, "কাজ কি ঠাকুরপো বাধা জন্মিয়ে। একটা অসুখের অছিলে করে ফোনে বারণ করলেই—"

তপন কহিল, "সামান্যের জন্যে মিথ্যে বলবে!"

সুলতা ম্লান হাসিয়া কহিল, "মিথ্যে! ঠাকুরপো, তোমরা যে-জগতে আছ—ওখানে সত্যের আদর খুব বেশি। অনেক সাধু ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বইয়ের পাতায় পাতায়। কিন্তু আমরা যেখানে পা দিয়ে চলতে সুরু করেছি—সেখানে ওর আলো নেই বল্লেই চলে। এই ঘরে ইলেক্‌ট্রিক আলোর মধ্যে ওই কোণে যদি মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখি—কেই বা তা চেয়ে দেখবে বল ?"

তপন ব্যথিত স্বরে বলিল, "মেজ বৌদি, তোমার আজ হলো কি ? সব কথাই উল্টো করে ধরচো কেন ?"

সুলতা তপনের পানে না চাহিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "আমিই ভুল আশা পুষে এতদিন মিছে ঘুরেচি! তোমরা জান না ঠাকুরপো, এই ছোট বাড়ির গণ্ডির মধ্যে যে কটা আশা আমরা বুকে পুষে রাখি তা এত অল্প যে আঙুলে গুণতে হয় না। অথচ সেই অল্পের মধ্যেই আমাদের জীবনের সুখ তৃপ্তি যা কিছু। তোমরা বাইরের বিস্তীর্ণ জগৎ পেয়েচ

কাজেই এ সব আশাকে তুচ্ছ বা আকাশকুসুম মনে হয়। একে ভাঙতে কখনও দ্বিধা বা মায়া বোধ কর না। অথচ যদি জানতে—," রুদ্ধকণ্ঠ সুলতা কক্ষ ত্যাগের উপক্রম করিল।

তপনের আর ধৈর্য্য রহিল না। সুবোধ যে দুর্গের কথা বলিয়াছিল সে দুর্গ এই করুণ বেদনার গোলায় এক নিমেষে ভূমিসাৎ হইয়া গেল। সুলতার সামান্য আশাকে ভাঙ্গিয়া দেওয়ার মত নিষ্ঠুর কাজ এ জগতে আর কি-ই বা আছে? হয়ত মেসের আত্মীয়শূন্য কক্ষে বাহিরের প্রচণ্ড কোলাহল বারুদ-হীন বিস্ফোরণের মতই ব্যর্থ হইয়া যায়; অন্তর রাজ্যে দুর্গম দুর্গের পাদদেশ সে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু সংসারের মধ্যে বাস করিয়া স্নেহ মমতাকে নির্ম্মমের মত পদদলিত করিয়া অটল অবিচলিত চিত্তে কোন্ নির্ব্বিকার মানুষ তপস্যামগ্ন থাকিতে পারে? যে পারে—তার চিত্ত যে-ধাতুতে তৈয়ারী সে কঠিন ধাতু—তপন কোন কালে প্রার্থনা করিবে না! ইহাতে যদি তার জীবনের প্রতিষ্ঠা না-ই ঘটিয়া উঠে, সে নিরুপায়।

খাট হইতে ত্বরিতে নামিয়া সুলতার নিকটে আসিয়া সে ডাকিল, "মেজ বৌদি।"

সুলতা উদ্গত অশ্রু গোপন করিতে—অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল, "কি?"

তপন কহিল, "আমায় মাপ কর। তোমায় এতটা বাজবে জানলে—"

সুলতা অশ্রু মুছিয়া তপনের পানে চাহিয়া কহিল, "ও কথা বলতে না? না ভাই, নিজের প্রতিষ্ঠা যদি ইচ্ছা কর ত পরের পানে চেয়ো না। যদিও কথাটা স্বার্থপরের মত, তবু সংসারীর পক্ষে অমূল্য। হয়ত আমরাই ভুল বুঝেছি। তোমার মনের খবর না জেনে নিজের মনেই ভাঙ্গচি; গড়চি। এ-ও ত ভাল নয়, ভাই।"

তপন ঈষৎ উচ্চ কণ্ঠে কহিল, "মনের খবর জানতে চাইলেই জানা যায় না—এ কথা খুব সত্যি। তবু আজকের রূঢ় ব্যবহারের জন্য—"

সুলতা হাসিয়া কহিল, "বার বার মাপ চেয়ে খাটো হয়ো না, ঠাকুরপো।" পরে গম্ভীর হইয়া কহিল, "না ঠাকুরপো—সত্যিই এ অন্যায়। তোমার পড়াশোনা—ও যে আলাদা জগতের তপস্যা। দৃঢ়নিষ্ঠ না হলে অনেক বাধাই জন্মায়।"

তপন গভীর বিস্ময়ে সুলতার পানে চাহিয়া শ্রদ্ধাপুলকিত স্বরে বলিল, "এ বাড়ির মধ্যে তোমায় বেশি শ্রদ্ধা করি এই জন্য যে, তুমিই জান—এই অমূল্য মণির মর্য্যাদা।"

সুলতা লজ্জার হাসি হাসিয়া বলিল, "অথচ জেনে শুনেও তোমায় বিরক্ত করি। এমনই অসার মন বটে স্ত্রীলোকের! একটা আশার সুতো যদি পেলে ত জাল বুনতে থাকে মনের মধ্যে। যতক্ষণ না জাল বোনা শেষ হয়—ততক্ষণ তার নিস্তার নেই। এত কৌতূহলী করে কেন যে ভগবান আমাদের গড়েচেন, কে জানে?"

তপন বলিল, "আমি জানি—মেজ বৌদি।"

সুলতা বলিল. "তুমি বুঝি ভগবানের ওপর?"

তপন বলিল. "না, সেই হৃদয়হীনের অনেক নীচে। তিনি ত ওই আকাশের মধ্যে ধোঁয়ার মত—আকার, রূপ, কথা, ব্যবহার সবেতেই অস্পষ্ট। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি—অতি কৌতূহলী হয়েই তোমরা তাঁর জগৎকে সুশৃঙ্খলে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ।"

সুলতা কৌতুকের হাসি হাসিয়া বলিল, "যথা?"

তপন বলিল, "যথা স্নেহ, মমতা, আনন্দ, উৎসাহ সবগুলিকে সুতোয় গেঁথে মালা তৈরী করেচ বলেই জীবনসংগ্রাম আমাদের পক্ষে কখনও তিক্ত, নীরস বা বিস্বাদ হয় না। এই যে এত ব্যস্ততা, ছোটা

ছুটি, কলহ কোলাহল, ঝগড়া মারামারি—এ-সবের মূলে অমৃতধারা ঢালচ তোমরাই।"

সুলতা হাসিয়া বলিল, "অর্থাৎ আমরাই অশান্তি কোলাহল বাঁচিয়ে রেখেচি!"

তপন বলিল, "তাইত আমাদের জীবনটাও বেঁচে গেল মেজ বৌদি।"

সুলতা বলিল, "আপাতত বিদায়। বইয়ের পাতায় মনোনিবেশ কর, দেখ যদি নতুন গবেষণায় কোন কিছু তথ্য লাভ করতে পার।"

সুলতা কক্ষ ত্যাগ করিলে তপন আপন মনে বলিতে লাগিল, "সুবোধদা আশ্চর্য্য লোক বটে! সংসার তারও আছে অথচ আমল দেয় না। দূর থেকেই সে কি কঠিন হতে পেরেচে? না, দূরে থাকলেও এঁদের ঠেলে ফেলা যায় না। আশ্চর্য্য! সকলের মন সমান নয় বলেই জগতে এত বৈষম্য!"

* *

নিমন্ত্রণ-বাড়িতে তপনের একটুও ভাল লাগিল না। প্রকাণ্ড প্রাসাদ দীপমালায় সজ্জিত হইয়াছে; তোরণে পত্রপুষ্পের সমাবেশ নাই, শুধু আলোর প্রাচুর্য্য! কক্ষে কক্ষে অতিরিক্ত সজ্জাবাহুল্য এবং যে সকল অতিথি এ বাড়িতে পদার্পণ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রসাধন-পারিপাট্যে শ্রীর পরিবর্ত্তে আড়ম্বরপ্রিয়তাই ফুটিয়া উঠিতেছে। বাড়ির সামনে ছোট একটি বাগান। বেলা, গোলাপ, গন্ধরাজ, হেনা, চম্পক, যূঁই প্রভৃতি গাছের এমন ঘন-সন্নিবেশ যে, দেখিলেই ক্লান্ত নয়ন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিয়া ঊর্দ্ধ গগনের নীল নীড়ে আশ্রয় খুঁজিতে থাকে। একটা কৃত্রিম উৎস হইতে জলধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। কৃত্রিম উৎসের মতই সুসজ্জিত নর নারী পরিমিত হাসি, কথা ও শিষ্টাচার দ্বারা

পরস্পরকে অভ্যর্থনা করিতেছে। সর্ব্বত্রই কেমন একটা সন্তর্পিত ভাব; এতটুকু ত্রুটি বিচ্যুতিতে যেন এমন অঘটন ঘটিবে যাহার মার্জ্জনা সভ্যতার ধারায় লেখা নাই! প্রতিটি পদক্ষেপ মাপিয়া মাপিয়া করিতে হইতেছে। পকেট হইতে সুগন্ধি রুমাল বাহির করিয়া কপালের ঘাম মুছিবার সতর্ক ভঙ্গিটিও উল্লেখযোগ্য!

তপন এই সমস্ত কৃত্রিমতা পরিহার করিতে অদূরে ছায়াচ্ছন্ন আমগাছের তলায় গিয়া বসিল। মনে মনে ভাবিল, এই সব অপরিচিতের সম্মুখে কুণ্ঠিত হইয়া বেড়ানোর চেয়ে—নির্জ্জনতা ভাল। কি কথা বলিয়াই বা আলাপ জমাইবে? শরতের নির্ম্মল নির্ম্মেঘ আকাশ। গ্রীষ্ম নাই যে, সে প্রসঙ্গ তুলিয়া খানিক কাটাইবে! আসন্ন-শীতের আলোচনাও এখন অসম্ভব, বর্ষা যে বহুকাল গত হইয়াছে!

কিন্তু তার এই একাকীত্ব বেশিক্ষণ স্থায়ী হইল না। খুঁজিতে খুঁজিতে ছায়াই প্রথম আমগাছ তলায় তপনকে আবিষ্কার করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

কহিল, "আপনি এখানে?"

তপন ক্লান্তিভরা চক্ষে ছায়ার পানে চাহিয়া বলিল, "বেশ আছি। তুমি বরং অন্য অতিথির দিকে মনোযোগ দিতে পার।"

ছায়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "তা পারলেও আপনাকে অবহেলা করা উচিত নয়। এক কাপ চা খাবেন?"

তপন ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল।

ছায়া পুনরায় প্রশ্ন করিল, "সরবৎ, কেক্?"

তপন পুনরায় ঘাড় নাড়িতেই ছায়া ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে কহিল, "বেশ, না খান নাই খাবেন; ড্রয়িং রুমে চলুন। ওঁরা সবাই আপনার গান শোনবার জন্য ব্যস্ত হয়েচেন।"

তপন হাসিয়া বলিল, "আমার গানও শোনবার মত হলো? না,

ছায়া—এত বড় compliment পাবার যোগ্যতা আমার নেই। তুমি একটু বসবে ?”

ছায়া না বসিয়াই বলিল, “কিছু বলবেন ?”

তপন ছায়ার পানে ভাল করিয়া চাহিল। উপরের আকাশে অষ্টমীর আধখানা চাঁদ; জ্যোৎস্নার আলো অস্পষ্টভাবে পৃথিবীতে মায়াজাল বুনিয়াছে। এই ক্ষীণ আলোয় তীব্রদৃষ্টিকে আয়ত্ত করিলেও অনেক কিছুই রহস্য-মণ্ডিত হইয়া থাকে। ধূপছায়া রঙের শাড়ি, ব্লাউজ হয়ত শাড়ির সঙ্গেই মিল করা। মুখে ক্রীম, পাউডার ও ঠোঁটে লিপষ্টিক আছে কিনা বোঝা যায় না; মুখখানা উজ্জ্বল বলিয়াই বোধ হয়। এসেন্সের গন্ধে সারা বাগান ভুর ভুর করিতেছে। কোমল ঘাসের উপর হালকা স্যাণ্ডেলের আওয়াজটুকু বাহির না হইলেও অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় জুতার জরি চক্ চক্ করিতেছে। মাথায় একটা এলো খোঁপা। সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ ধাপে পৌঁছাইলে হয়ত বব্ করা চুলই চলন হইত।

তপনের ইচ্ছা হইল, আজই এ বিষয়ের একটা মীমাংসা করিয়া লয়। স্বলতার সেদিনের দীর্ঘনিশ্বাস-ফেলা কথার মধ্যে যে বেদনার সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল—তপনের কানে সে ধ্বনি এখনও বাজিতেছে। স্বলতার ক্ষুদ্র আশায়—বৃহৎ আনন্দময় জীবন ও অতুল তৃপ্তি লুকানো আছে। তাইত সেই ক্ষণেই তপনের দৃঢ় সঙ্কল্প গলিতে আরম্ভ হইয়াছে। সেই মুহূর্ত্তেই সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, আজিকার শুভক্ষণে—যাহা হউক একটা কিছু স্থির মীমাংসা তাহাকে করিতেই হইবে। তিন বৎসর পরের অনাগতকে এই মুহূর্ত্তেই সুস্বাগত করা তার উচিত।

তপনকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া ছায়া বলিল, “কৈ, কিছু বললেন না ত ?”

তপন বলিল, “বসবে ? হাঁ, ওই ঘাসের ওপর। হয়ত তোমার শাড়ির ওপর ভাঁজ পড়বে !”

ছায়া লজ্জিত হইয়া তপনের অদূরে বসিয়া পড়িয়া কহিল, "পড়ুক।"

তপন হাসিয়া বলিল, "তাহলে ও ঘরে যাঁরা আছেন, তাঁরা হয়ত ভ্রূকুঞ্চিত করবেন!"

ছায়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "এই কথাই বলতে চাইছিলেন?"

তপন অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "না,—না, সভ্যতার আদবকায়দা······ হাঁ, শোন। সেদিন আমাদের বাড়িতে আমার ঘরে বসে তুমি গান গাইতে পার নি—হঠাৎ বড় বৌদি ডাকলেন বলে।"

ছায়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "তা সেই অভাবটা এই বাগানে বসে পূরণ করতে বলেন? কিন্তু ভারি অসুবিধে এখানে! অর্গ্যান নেই, আলো নেই—"

তপন আরও অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "না, গান আমি শুনতে চাইছি না। আমি—," বলিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সহসা সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিয়া ফেলিল, "সেদিন যা বৌদি বলছিলেন অর্থাৎ আমাদের সম্বন্ধে, তা বোধ হয়—"

হাজার শিক্ষা ও বাক্‌পটুতা লাভ করিলেও এ কথায় লজ্জিত না হয় এমন মেয়ে খুব কমই আছে। ছায়া মুখ নীচু করিয়া নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

তপনের সঙ্কোচ অনেকখানি কাটিয়া গিয়াছিল। সে বলিতে লাগিল, "সেই ইঙ্গিতকে স্পষ্ট করে যদি একটু আলোচনা করি ত আশা করি আমার দোষ ধরবে না। বড় নিরুপায় হয়েই এ আলোচনা আমায় করতে হচ্ছে।"

ছায়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। মুখও তুলিল না, কথাও বলিল না। শুধু ঘাড় নাড়িয়া তপনের কথার সমর্থন করিল।

তপন গলাটাকে পরিষ্কার করিয়া বলিতে লাগিল, "অথচ তুমি জান

তিন বৎসর একটা উদ্বেগ বুকে পুষে রেখে ভবিষ্যৎ জীবনকে সমৃদ্ধ করা কি দুরূহ ! কলেজের ক্ষতি তাতে অনেকখানিই হবে।”

ছায়া মুখ তুলিয়া তপনের পানে চাহিল।

তপন বলিতে লাগিল, “সে কথা তোমায় বুঝিয়ে বলাই বাহুল্য। কিন্তু বাড়ির লোকেদের ত জান ? তাঁরা ভবিষ্যতের আশা নিয়েই বর্তমানকে চালাতে ভালবাসেন। তাঁরা ছেলে মেয়ের জন্মক্ষণ হতেই সংসার পাতার কল্পনা করে থাকেন।”

ছায়া মৃদু স্বরে বলিল, “আপনি কি করতে বলেন ?”

তপন বিস্মিত হইয়া বলিল, “করতে ! না, না, এ বিষয়ে তোমার একটা মত—”

ছায়া বলিল, “আমাদের মতে যখন এ কাজ হচ্চে না—তখন আমাদের ভাবনা মিছে।”

তপন ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিল, “তা বললেই কি ভাবনা আসে না ? নদীর ওপর দিয়ে স্টীমার চলে গেলেই সে জলে ঢেউ ওঠে।”

ছায়া মুখ নামাইয়া বলিল, “কিছুক্ষণের জন্য। তারপর জল আবার স্থির হয়ে আসে।”

তপন উত্তরোত্তর উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। গলার স্বর আরও একটু উঁচু করিয়া কহিল, “বেশত, স্টীমার চলে যাক ক্ষতি নেই, কিন্তু বারবার যদি সে যাওয়া আসা করে জলের আলোড়ন কি থামে তাতে ? এই তোমাদের বাড়ির এই যে উৎসব—”

ছায়া বলিল, “জানি। এ সম্বন্ধটাকে যদি মেনেই নেন ত আপনার চিন্তার কারণ কি থাকতে পারে !”

তপন একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, “এ কি রকম জান ? জীবনের

এত বড় একটা কাজ, না জেনে শুনে চোক বুজে ওষুধ গেলার মতই অপ্রীতিকর।”

ছায়া বলিল, “আপনি কি বলতে চান স্পষ্ট করেই বলুন, আমিও হয়ত স্পষ্ট উত্তর দিতে পারবো।”

তপন আর ইতস্ততঃ না করিয়াই কহিল, “তিন বছর বড় কম সময় নয়। এই তিন বছরে তুমিও অগ্রসর হবে, আমিও। আমাদের ব্যবহারে রুচিতে অনেকখানি পার্থক্যই হয়ত ফুটে উঠবে। আজ যা সহজ—সেদিন তাই হয়ে উঠবে রহস্যময়—দুর্ব্বোধ্য। সে দিনের সেই ক্ষণগুলিকে আজকের বাক্‌দানের মধ্যে যদি আমারা না-ই সার্থক করে তুলতে পারি?”

ছায়া বলিল, “সার্থক করে তুলতেও পারি। অবশ্য আপনার সন্দেহ মিছে নয়। কিন্তু সেই অনাগত আশঙ্কাকে জাগিয়ে রেখে আজ আমাদের কি লাভ বলুন ত? আজ ত আর তিন বছর পরের সেই আশঙ্কা-ব্যাকুল দিন নয়!”

তপন বলিল, “তুমি বল কি! আজ থেকে বাক্যদান করে সেদিন যদি সে প্রতিজ্ঞার বন্ধন শিথিল হয়—”

ছায়া নির্লিপ্ত স্বরে উত্তর দিল, “তাতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হবেন না, আমিও হব না। কারণ, আজকের কথা দেওয়ার জন্য আমরা ত দায়ী নই।”

ছায়ার এই স্পষ্ট উত্তরে তপনের বুকে খচ্ করিয়া কোথায় একটা কাঁটা ফুটিল। ছায়া দিব্য নিশ্চিন্তেই ত উত্তর দিয়া গেল। এই মিলন-প্রসঙ্গে এতটুকু আন্তরিকতা তার স্বরের উপর মৃদু কম্পনরেখা জাগাইয়া তুলিল না! অথচ, তপনের তরুণ মনে সৌন্দর্য্যের জন্য একটা ধূমাচ্ছন্ন প্রত্যাশা সর্ব্বক্ষণ সচকিত হইয়া উঠিতেছে। এক একবার এই বন্ধনের

বেদনায় মন মূহ্যমান হইয়া পড়িতেছে, পরক্ষণেই স্বপ্ন বাস্তবে মিলিয়া অপূর্ব্ব শিহরণ তুলিতেছে!

চঞ্চল মনের চপল বৃত্তিকে রোধ করিবার জন্য মীমাংসা তার চাই। তাই নিরালায় বসিয়া ছায়াকে সে স্পষ্ট ভাষায় ভাবী জীবন সম্বন্ধে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারিয়াছে। কিন্তু এখন মনে হইতেছে —জিজ্ঞাসা বুঝি অস্পষ্টই রহিয়া গেল। ঠিকমত করিয়া বোঝাইবার ভাষা তার নাই। বাহিরের তুচ্ছ বাধা—একটা নির্লিপ্ত উত্তরে ছায়া ত অনায়াসে উড়াইয়া দিল। ইচ্ছা হয়, ও অন্তরে কোথায় কি আছে—একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লয়। যে কথা বলা যায় না, যে বাসনা অন্ধকারের আশ্রয়ে প্রবল হইয়া উঠে—কেন মানুষকে বোঝাইবার জন্য তার সহজ ভাষা তৈয়ারী হয় নাই?

তপন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ছায়া তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "আপনি যে উত্তর দিচ্ছেন না? সত্যিই ভেবে দেখুন দেখি—যা আমাদের আয়ত্বাতীত তাকে নিয়ে নাড়া-চাড়া করায় কি লাভ? বরঞ্চ আজ যদি আমরা সত্যিকারের বাঁধনে বাঁধা পরতুম ত সেই হতো ভাবনার কথা!"

তপন ম্লান মুখে বলিল, "হয় ত আমি ঠিক বোঝাতে পারলুম না।"

ছায়া হাসিয়া বলিল, "আজ এর চেয়ে বেশি বোঝবারই বা দরকার কি? স্কুল কলেজের গণ্ডি ছাড়িয়ে এরপর—এ সব বিষয়ে ভাববার যথেষ্ট অবসর পাব। কি বলেন?"

ছায়া কি রহস্য করিতেছে? অন্ধকারে যে মুখ দেখা যায় না! অন্ধকার না থাকিলেও তপন কি ছায়ার পানে চাহিতে পারিত? এমন অকুণ্ঠ লজ্জালেশহীন সুস্পষ্ট উত্তর! তপন ভাবিয়াছিল, তার প্রস্তাবে সরম-সঙ্কুচিতা কিশোরীর বহুক্ষণ ধরিয়া হয়ত কথাই ফুটিবে না! বহু

আরাধনায় যদি বা ফোটে, লজ্জাবিজড়িত অর্দ্ধস্ফুট ধ্বনি—মাধুর্য্য মণ্ডিত। ইঙ্গিতে মনোভাব ব্যক্ত করিতে হয়ত বা অতি লজ্জায় সন্নিকটবর্ত্তী তপনের বুকে মুখখানি গুঁজিয়া পরম বার্ত্তাটি নিঃশেষেই নিবেদন করিয়া দিবে। তারপর, নিঃশব্দ নক্ষত্র-খচিত আকাশের পানে চাহিয়া অনাদি অনন্ত কালের পুরাতন লেখাটিকে নূতন করিয়া পাঠ করিবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে। মাঝের তিনটি বৎসর তারপর আর দুঃসহ বোধ হইবে না। কিন্তু একি? কিশোরী যে সঙ্কোচশূন্য হইয়া উত্তর দিল। উত্তরে যেন একটা তেজ আছে; সে প্রখর তেজ অন্তর ও বাহির একসঙ্গে মুহ্যমান করিয়া দেয়। চোখ তুলিয়া মুখের পানে চাহিতে গেলে যে নিদারুণ লজ্জা—তা যেন একমাত্র তপনেরই।

ছায়াই কথা কহিল, "এখন উঠুন, ওদিকে ওঁরা হয়ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।"

যন্ত্র চালিতের মত তপন উঠিল।

দুর্গম দুর্গে শত্রুপক্ষের জ্বলন্ত গোলা আসিয়া পড়িল না, বোমাও সশব্দে ফাটিল না। অ-বিদারিত—অটুটই রহিয়া গেল। তবু নরচক্ষুর অন্তরালে সমস্ত ভিত্তি যেন প্রবল কম্পনে বারংবার নড়িয়া উঠিতে লাগিল।

*   *   *

মোটরে ফিরিবার সময় সুলতা নূতনতর সম্পর্ক লইয়া অনেক পরিহাসই করিল, কিন্তু নিরুত্তর তপনের মর্ম্মভেদ করিতে পারিল না। মোটরের ম্লান আলোকে তপনের মুখ ভাল দেখা যাইতেছিল না। সুলতা তাহার অবনত মুখ দেখিয়া মনে করিল, লজ্জা। একে ত তরুণ বয়স—তার উপর এই সব আয়োজন। বাকপটুতা থাকিলেও লজ্জা আসে বৈকি! সমস্ত পথ সে আপন আনন্দে কৌতুক করিতে করিতে চলিল। তপনের মুখ

হইতে একটি অনুকূল উত্তর না পাইয়াও উৎসাহ তার স্তিমিত হইল না। লাখ টাকার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে ভিখারীর সহসা অর্থ-প্রাপ্তির মত অত্যুল্লাসে সে মগ্ন হইয়াছিল। মন উজ্জ্বল থাকিলে মেঘময় আকাশের পানে চাহিয়াও নাচিয়া উঠে।

বাড়িতে আসিয়াই সুলতা চারুর সঙ্গে দেখা করিল। চারুর তখন পরিপাটী বিছানা তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। খুব খানিকটা জোরে জোরে পাখার বাতাস করিয়া নেটের মশারির ধারগুলি সে সন্তর্পণে গুঁজিতে ছিল।

সুলতা আসিয়া কহিল, "দিদি, নিজের ঘরখানি নিয়েই হাঁপিয়ে উঠেচ যে?"

চারু ঘাড় ফিরাইয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "মিথ্যে নয়। মেজ ঠাকুর-পো আর ওঁর মেজাজ এমনি কড়া যে, তিলকে তাল করে তোলেন এক দণ্ডে। জানিস ত ভাই—একটি মশা যদি পোঁ পোঁ করে ত সারা রাত ঘুমুতে পারবে না।"

সুলতা কহিল, "কেবল সেজ ঠাকুরপো যা দলছাড়া—গোত্র-ছাড়া, নয়?"

চারু বলিল, "হুঁ, তা ওখানে কেমন হলো?"

সুলতা বলিল, "তুমি দিদি বড় কুণো হয়ে যাচ্ছ দিন দিন। এত সাধলুম, কিছুতেই গেলে না!"

চারু মুখ ম্লান করিয়া কহিল, "আমরা ভাই সেকেলে মানুষ, অসভ্য। কি বলতে কি বলবো। ও সব জায়গায় যাওয়া কি সাজে আমাদের?"

সুলতা চারুর অন্তরের বেদনা বুঝিয়া প্রসঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করিল।

"—জান দিদি, ওদের ভুটিকে ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

শেষে আমার মামাত ছোট বোন লিলি পা টিপে টিপে বাগানে গিয়ে দেখে এলো দু'টিতে মুখোমুখী বসে গল্প করছে।"

চারু বিস্মিত স্বরে কহিল, "বলিস কিলো! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি?"

সুলতা হাসিতে হাসিতে বলিল, "ঠাকুরপো ভারি চাপা, মুখে এদিকে দেখায় যেন ভাজা মাছখানি উল্টে খেতে জানে না অথচ…তা বিয়েটা শীগগির হলেই ভাল হতো, নয়?"

চারু বলিল, "তা আবার নয়। ও মা গো! ঠাকুরপোর কথা শুনে আমি ত অবাক্ হয়ে গেচি!"

সুলতা রহস্য করিয়া কহিল, "তা তো হয়েচ—কিন্তু তুমি যখন এ বাড়িতে এসেছিলে তখন বটুঠাকুরের বয়স কত শুনি?"

চারুর সুগোল মুখে লজ্জার লাল রঙ ফুটিয়া উঠিল। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "মরণ! আমি না তোর দিদি হই?"

সুলতা হাসিয়া কহিল, "তা হও, কিন্তু ব্যথার ব্যথী ত!"

চারু কলিল, "আজে বাজে বকিসনি, এখন আসল কথা বল!"

সুলতা বলিল, "আসল ত সেই তিন বছর বাদে।"

চারু একটু আগাইয়া আসিয়া কহিল, "ওদিকে কিন্তু খবর আছে। তোরা যাবার পর ওঁরা পরামর্শ করছিলেন।"

সুলতা বলিল, "কি পরামর্শ?"

চারু তাহার উদ্বিগ্ন মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "ভয় নেই—খবর ভাল। তবে—," বলিয়া চারিদিকে সশঙ্ক দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "ছাদে চ!"

ছাদে আসিয়াও চারু ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, "জানিস ত ওঁদের টাকার খাঁই। সেই কথাই হচ্ছিল।"

সুলতার উদ্বেগ কমিল না, শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, "কি ঠিক হলো?"

চারু বলিল, "পনেরো হাজারের এক পয়সা কমে নয়। ছেলে ভাল, ভবিষ্যতে আরও দুটো পাস দেবে। আর আমাদের বেলায় যে লোকসানটা হয়েচে—তা-ও পুষিয়ে নেওয়া চাই ত!"

সুলতা কোন উত্তর দিল না।

চারু কহিল, "তা তোর এত ভাবনা কিসের? কর্ত্তায় কর্ত্তায় বোঝাপড়া করুন গে। হাঁ, বিয়ে তিন বছর বাদে হলেও অর্দ্ধেক টাকা এঁরা আগাম চান।"

সুলতার চিন্তাকুটিল মুখে গাঢ় কালো ছায়া পড়িল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সে কহিল, "একি দাদন?"

চারু বলিল, "তা কথা পাকা হওয়া ভাল। গণ, পণ ও টাকায় মিল হলে বাঁধন একটা থাকা ভাল নয় কি?"

ঘৃণায় সুলতার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। অতি কষ্টে সে কহিল, "ভাল আবার নয়? ভগবান না করুন, কোন পক্ষে ভালমন্দ একটা কিছু হলে টাকাটার দায়িত্ব আর রইল না। খুব ভাল!"

চারু বলিল, "ষাট্, ষাট্, ও কি কথা! কিন্তু এমন একটা ভাল সম্বন্ধ, জানা ঘর—খুঁজে বার করাও কঠিন।"

সুলতা দৃঢ়স্বরে কহিল, "মোটেই কঠিন নয়। গঙ্গার জল এর চেয়ে স্পষ্টতর। সেখানে ভাসিয়ে দিলে তবু বুঝতে পারা যায় মেয়ের পরিণাম।" একটু ম্লান হাসিয়া কহিল, "অথচ দেখ দিদি, আশ্চর্য্য মানুষের মন, সব জেনে শুনেও এইটাকেই ভেবেছিলুম পরম কাম্য! ওঁদের তুমিও জান, আমিও জানি, তবু পোড়া আশা এমনি যে, দু'চোখে ঠুলি পরিয়ে অন্ধ করে রাখে। এমন যে হতে পারে তা একবারও ভাবিনি? আশ্চর্য্য!"

চারু কহিল, "ভেবে আর কি হবে—"

সুলতা অদ্ভুত হাসি হাসিয়া কহিল, "ভাবনা করি না। এ কাজ যাতে না হয় তারই জন্য চেষ্টা করবো।"

চারু কহিল, "সে কি, ওঁরা যদি জানতে পারেন ?"

সুলতা বলিল, "তোমার মত আমারও পিঠ না হয় ক্ষতবিক্ষত হবে। তা হোক, তবু জেনে শুনে তার সর্ব্বনাশ আমি করতে পারবো না, দিদি।"

চারু কহিল, "তার চেয়ে এক কথা শোন, চুপ করে থাক। ওঁরা ত চিরদিনই থাকবেন না।"

সুলতা কহিল, "চিরদিন না থাকুন, যে কদিন থাকবেন—তাতেই চিরদিনের লেখা লিখে দিয়ে যাবেন। সে লেখা মোছবার ক্ষমতা আমাদের কারো নেই, দিদি।"

চারু নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তবু থাক, বোন। উৎসাহ তুই দিসনি, মিথ্যে লাঞ্ছনা কেন ডেকে আনবি ? তোর বাপ যে রকম তেজী, তাতে তিনিই হয়ত শেষ পর্য্যন্ত রাজি হবেন না।"

কথাটা সুলতার মনে ধরিল। এমন আত্মাবমাননার কাজে কিছুতেই তাহার পিতা সম্মত হইবেন না। জীবন থাকিতে নহে।

বুকের প্রকাণ্ড বোঝা নামিয়া গেল। সুলতা চারুর হাত ধরিয়া কহিল, "ঠিক বলেচ, দিদি। চল, নীচেয় যাই।"

উপরের নক্ষত্র-খচিত আকাশ-আবরণে অলক্ষিত নিয়ন্তার মুখ হয়ত ক্ষণেকের তরে ছায়াচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। মাথার উপর দিয়া কর্কশ স্বরে একটা পাখী ডাকিয়া গেল।

সে ডাকে চারু ও সুলতা দুইজনেই চমকিত হইল।

* * *

মাস খানেক পরে।

বোটানিকাল গার্ডেনে বেড়াইতে বেড়াইতে বটগাছের ও-দিকে হঠাৎ তপনের দৃষ্টি পড়িল। কয়েকটি তরুণ-তরুণী মিলিয়া হাস্য কলরবে সে-স্থান মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। শ্যামল তৃণের উপর সাদা কাপড় বিছাইয়া চক্রাকারে বসিয়া—তারা পরমানন্দে পিক্‌নিক করিতেছিল। উর্দ্দিপরা এক চাপরাসী গরম চায়ের কেটলিটা লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে, অদূরে জ্বলন্ত স্টোভের উপর জল গরম হইতেছে। অপরাহ্নের বর্ণময় আকাশ—সমস্ত বাগানখানির উপর স্নিগ্ধ প্রশান্তি বিছাইয়া দিয়াছে। তাহারই কোলে তরুণ জীবনের এই আনন্দ-কোলাহল —ভারি চমৎকার মানাইয়াছে! তপন দূরে দাঁড়াইয়া সে আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

উহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত তপনকে দেখিয়া থাকিবে। তপনের পানে চাহিয়া একটি মেয়ে আর একটি মেয়ের কানে কানে—মৃদুস্বরে কি বলিল। কথা শুনিয়া মেয়েটি মুখ ফিরাইয়াই লাফাইয়া উঠিল এবং তপনের দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে হইতে কহিল, "হ্যাল্লো, আপনি যে!"

সে ছায়া।

তপনের বিস্ময় কাটিল, কিন্তু মুখে আকস্মিক সাক্ষাতের উল্লাস-জ্যোতি ফুটিল না। সমাগত তরুণ-তরুণীর উপর দৃষ্টি বুলাইয়া আগ্রহহীন স্বরে বলিল, "হঠাৎ ভাল লাগলো না, তাই বেড়াতে এলুম। ওঁরা কারা? তোমার কলেজের সহপাঠী নিশ্চয়ই।"

ছায়া বলিল, "মিঃ অটল রায়কে জানেন না? রায় বাহাদুর। মীর্জ্জাপুরে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সাম্নে প্রকাণ্ড বাড়ি। তাঁর দুই ছেলে—তরুণ আর অরুণ। মেয়ে—রেবা, লিলি। ওখানে যাঁরা বসে—তাঁরা হচ্ছেন—আসুন পরিচয় করিয়ে দিই।"

তপন কহিল, "না, থাক। এমন আনন্দটা পরিচয়ের বিড়ম্বনা দিয়ে মাটি করি কেন?"

ছায়া আব্দারের স্বরে বলিল, "বাঃ, বেশ ত! আপনি না গেলে ওঁরা মনে করবেন কি অভদ্র ওরা! চলুন না। পিয়ানো আছে, তরুণবাবুর গান শুনবেন—চমৎকার!"

তপন বলিল, "আমায় অভদ্র বলুন—সইতে পারবো, কিন্তু তুমি হয়ত—"

ছায়া বলিল, "আঃ, কি যে বলেন! আসুন।" বলিয়া তপনের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

নমস্কার শিষ্টাচারের মধ্যে দু'পক্ষের পরিচয় হইল। তাঁহারা তপনকে বসিবার জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিলেন।

ছায়া তাহার পার্শ্বোপবিষ্ট বাইশ বছরের যুবকটির পানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "তপনবাবুকে আপনার গান শোনাব বলে ডেকে আনলুম, নৈলে কিছুতেই উনি আসছিলেন না।"

তরুণ মৃদু হাসিয়া তপনের পানে চাহিয়া বলিল, "ছায়া দেবীর কথায় ভুলে গেছেন। তা দেখবেন—শেষ পর্য্যন্ত লোকসান আপনার হবেই।"

তপনও হাসিয়া বলিল, "লাভ-লোকসান পরের কথা। আপাতত—"

তরুণ বলিল, "আমার আপত্তি নেই।" সঙ্গে সঙ্গে সে হারমোনিয়মটা টানিয়া লইয়া গান ধরিল।

গলা মিষ্ট, গাহিবার একটা সহজ সরল ভঙ্গিও আছে; তথাপি তপনের মনে হইল,—এত মিষ্ট গলা পুরুষের না হইলেই যেন ভাল হয়। ছায়া ত একদৃষ্টে হাঁ করিয়া গান গিলিতেছে। অন্য মেয়েগুলিও—মুগ্ধ চোখে প্রশংসা ভরিয়া চুপ করিয়া রহিয়াছে। তরুণ টানা টানা চোখ দু'টি অর্দ্ধনিমীলিত করিয়া—অধরে সযত্ন-সঞ্চিত হাসিটুকু মাখাইয়া

(ঠিক যেমন মেয়েরা ঠোঁটের রঙ বাড়াইতে লিপষ্টিক ব্যবহার করে) কোঁকড়াচুল ভরা মাথাটি মাঝে মাঝে মনোজ্ঞভঙ্গিতে হেলাইয়া সুরের ইন্দ্রজাল বুনিয়া চলিয়াছে। কানের ভিতর দিয়া সে সুর একবার পশিয়া অন্তরে গিয়াই আশ্রয় লয়, অন্য কান দিয়া বাহির হইয়া যায় না। গানের মোহ আছে। অল্প সিদ্ধি খাইলে সারা শরীরে অবসাদ, স্ফূর্ত্তি অথচ রক্ত কণিকায় স্নিগ্ধ ঘুমের আমেজ যেমন ঘনাইয়া আসে, তেমনি!

এক, দুই, তিন। না পড়ে মেয়েদের চোখের পলক, না উঠে প্রশংসার গুঞ্জন ধ্বনি। এত সুন্দর গান—যে প্রশংসার কলগুঞ্জন তুলিয়া মনের মধ্যে স্থায়ী সুরকে নষ্ট করিতে কেহ রাজি নহে।

অবশেষে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেই তরুণ গান থামাইল।

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতার মধ্যেই কাটিয়া গেল।

ছায়া অতি সন্তর্পণে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিল, "সুন্দর।"

লিলি বলিল, "শুধু সুন্দর বললে কিছুই বলা হয় না—ও-কথা কে বলেন, ছোড়দা?"

তরুণ মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল, "যেই বলুক—তোরা ত নয়।"

লিলি গ্রীবা হেলাইয়া ভ্রূ নাচাইয়া কহিল, "ইস্! আমরা না থাকলে তোমার অতবড় সমজদার জুটতো কিনা!"

তরুণের পাতলা ঠোঁটের হাসিটি ভারি মিষ্ট। দাঁতগুলি যেন সাজানো সাদা মুক্তা। চোখের দু'ধার কুঁচকাইয়া এমন একটি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে যে, সমগ্র মুখখানিই হাসিবার কালে পুনঃ পুনঃ দেখিতে ইচ্ছা করে। তরুণ হয়ত দর্পণে নিজের মনসিজ-মোহন সুন্দর মুখের এই অপরূপতা বিশেষ করিয়াই লক্ষ্য করিয়াছে, নতুবা হাসি ছাড়া তার মুখ কল্পনা করা যায় না কেন? অন্তত চম্পা তাই বলে।

তরুণের গানকে সুন্দর বলিলে সে চটিয়া যায়। বলে, "তুলনা দিয়ে এত বড় অনুভূতিকে নষ্ট করা চরম অসভ্যতা। ফুল সুন্দর, আকাশ সুন্দর—এক জিনিষ, ভাষা সুন্দর—অন্য জিনিষ, আর সুর সুন্দর সে-ওত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সুতরাং বাঁধাধরা ফরমুলা কষে সুন্দরকে অমন কুৎসিত করতে লোকে কেন যে ভালবাসে!"

লিলি হয়ত পরিহাস করিয়া বলে, "চম্পা, আমার ছোড়দার গলা না হয় ছেড়ে দিলুম, কিন্তু ওর চেহারা কোন সুন্দরের পর্য্যায়ে পড়ে।"

চম্পা উত্তর দেয়, "চেহারা শুধু বাইরে মিলিয়ে যদি হতো ত এর উত্তর সোজা করেই দেওয়া চলতো। কথা, ব্যবহার, শিষ্টতা এ-সব চেহারার এক একটা অঙ্গ। শুধু পলাশ বলতে যে ফুলটি আমরা পাই তা রূপ থাকতেও কুরূপ আর গোলাপের মধ্যে সৌন্দর্য্য অফুরন্ত। কেন জানিস? ওর গন্ধটাই রূপকে চিরস্থায়িত্ব দিয়েচে বলে।"

লিলি হাসে, "কবিত্বের কিছু বাড়াবাড়ি হলো, চম্পা!"

চম্পাও হাসিয়া বলে, "তোমার কানের দোষও ত হতে পারে। ঠাট্টাই কর আর যাই কর, তোমার ছোড়দার গানকে তুলনা করতে আমার ভারি কষ্ট হয়।"

লিলিও বলে, "ছোড়দা বলেন, কাউকে কষ্ট দেওয়া মহাপাপ। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করলে নাকি—"

চম্পা তাহার গালে ঠোনা মারিয়া বলে, "তোমার নরক বাস।" তারপর দুইজনেই হাসিতে থাকে।

আজ চম্পা এখানে ছিল না, তাই লিলি কথাটাকে বন্ধু মহলে প্রচার করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইল না।

তরুণ মৃদু হাসিয়া ছায়ার পানে চাহিয়া কহিল, "অনেকে বলেন—গানে নাকি আমি **effeminate**!"

ছায়া উত্তর দিল, "তাঁরা হয়ত ও-কথার মানেই বোঝেন না—কিংবা স্থর সম্বন্ধে তাঁদের idea নেই।"

লিলি আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল, "মস্ত বড় compliment, ছোড়দা। চম্পার ওপরেও এক ডিগ্রি।"

ছায়া বলিল, "না লিলি, চম্পা superlativeই থাকবেন।"

তরুণ বলিল, "কি জানেন, 'তর' 'তম' দিয়ে প্রকাশ করলেই—স্থন্দরের মর্য্যাদা বা মূল্য বাড়ে না। ওটা ভাষায় চলে—ভাষ্যে নয়।"

সূর্য্য বহুক্ষণ অস্ত গিয়াছিল, তথাপি তপন স্পষ্ট দেখিতে পাইল, এই তরল অন্ধকারের মধ্যে ছায়ার মুখে সেই অন্তর্হিত শেষ রক্ত-রশ্মি।

তরুণ কৌশলী বটে! কণ্ঠস্বরে, গানে, ভঙ্গিতে, কথায় বা পরিহাসে flirt করিবার সাধনায় যেন সে সিদ্ধ। হাঁ, effeminate ত বটেই। ওই হাসিটুকু—পাতলা ঠোঁটের মিষ্ট হাসি, গ্রীবাভঙ্গি, কোঁকড়া চুল, মাঝে মাঝে আঙুল দিয়া সে-চুল পিছনদিকে ঠেলিয়া দেওয়া—কোনটা নয়? অঙ্গ সঞ্চালনে বা বাক্যপ্রয়োগে এমন সহজ সরল মধুর গতিটুকু—বিশেষ দৃষ্টিতে কৃত্রিমতা ছাড়া আর কি বলা যায়? এক নিমেষে অপরিচিতকে হাসি আনন্দ দিয়া যাহারা আপন করিয়া লইতে পারে—মুগ্ধ লোকে—তাহাদের সরলতা বা সৌজন্যতাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে একবারও দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু তারা হয়ত জানে না, ওই দুর্ব্বলতার ফাঁকে অনেক কিছুই অকর্ত্তব্য আসিয়া জড়ো হইতে পারে! ঐ সারল্যের যবনিকা তলে যে বৃত্তিগুলি অন্ধকারে মিটিমিটি চায়,—তাদের ক্ষুদ্র চোখে দিব্যজ্যোতি খেলা করে না! তারা ভণ্ড।

তপন ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তরুণের পানে চাহিয়া—উঠিল।

ছায়ার মুগ্ধভাব তখনও হয়ত কাটে নাই, সে এ দিকে লক্ষ্যই করিল না।

রেবা বলিল, "তপনবাবু, উঠলেন যে? বসুন আর একটু, চাঁদ উঠলে জ্যোৎস্নাটা উপভোগ করে যাওয়া যাবে।"

তপন সেজন্য বিশেষ উৎসুক ছিল না। ছায়ার পানে চাহিয়া কহিল, "জ্যোৎস্না না উঠলেও এই পাতলা অন্ধকারকে বেশ উপভোগ করা যায়।"

রেবা তপনের দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া কহিল, "কি জানেন তপনবাবু, আত্মপ্রশংসা শুনতে সবাই ভালবাসে। বিশেষত—"

লিলি টপ করিয়া বলিল, "বিশেষত আমি। চম্পা বলে, পরের মুখে, বিশেষ করে পুরুষদের মুখে, যদি সে প্রশংসার ধ্বনি উচ্চারিত হয় ত কোথায় লাগে স্বর্গসুখ!" কথা শেষে সে সশব্দে হাসিয়া উঠিতেই ছায়ার আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া গেল। সে-ও টপ করিয়া উঠিয়া কহিল, "চল, যাওয়া যাক।"

লিলি কহিল, "বাঃ, বেশ ত! নিজেই কি বলে এখানে আসা হয়েছিল মনে নেই বুঝি? চাঁদ না দেখে আমরা উঠবো না। এরই মধ্যে ভুলে গেলে সে-কথা?"

তপন ছায়ার পানে অপাঙ্গে চাহিয়া কহিল, "ভোলাবার কারণ যখন বর্ত্তমান, তখন ভুলে যাওয়াটা বিশেষ অপরাধের কি?"

ছায়া তপনের শান্ত স্বরের অন্তরালে উত্তাপটুকু অনুভব করিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "মানে?"

তপন মুখে হাসি টানিয়া কহিল, "মানে, এই মাত্র যে সুর বর্ষণ হয়ে গেল, তার ওপরে চাঁদ বেচারা বেশি জ্যোৎস্না কি আর ঢালবেন, তা ত ভাবতেই পারি না! সুতরাং, জ্যোৎস্নাকে ভুলে সুরের ঘোরে ঘোরে যদি বাগান ছাড়া যায়—"

ছায়া বলিল, "বেশ একটা কিছু নিয়ে গেলুম বলে মনে হবে। একটা মহার্ঘ্য রত্ন—অমূল্য কিছু, নয়?"

ছায়াও কি পরিহাসে পটুতা লাভ করিয়াছে? অথচ, উষ্ণতাহীন মৃদু কোমল কণ্ঠের মধ্য দিয়াই ঐ ক'টি কথা বাহির হইয়া আসিল!

পাশে কেহ ছিল না। তরুণ, লিলি প্রভৃতি পায়ে পায়ে গঙ্গার ওধারে চলিয়াছে; অস্পষ্ট অন্ধকারে তাদের উচ্চ আলাপধ্বনি শোনা যাইতেছে।

তপন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছায়ার পানে চাহিল।

বহুক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না। হয়ত কথা কহিবার কিছুই ছিল না। সময়ে সময়ে এমন কতকগুলি মুহূর্ত্ত আসে, ধ্বনি না দিয়াও সে-গুলির অর্থ বোধে একটুও বিলম্ব হয় না। এই ক্ষণটি সেই মুহূর্ত্তের অন্যতম।

মনে মনে দুইজনেই অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিল। দোষ না করিয়াও কোথায় যেন তার তীব্রতা পীড়া দিতেছে, কোথায় যেন কৈফিয়ৎ না দেওয়ার অসৌজন্যতা মনের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করিতেছে। ছায়া হাঁপাইয়া উঠিল। মনের দুর্ব্বলতা দমন করিতে স্বর একটু চড়াইয়া বলিল, "আর কিছু বলবার আছে আপনার?"

তপন সে কথায় আহত হইয়া উত্তর দিল, "ছিল, কিন্তু এখন নেই।"

ছায়া বলিল, "না থাকাই সম্ভব।"

তপন উত্তর না দিয়া ক্রোটনের কয়েকটি পাতাই চঞ্চল হস্তে ছিঁড়িয়া ফেলিল।

ছায়া পুনরায় কহিল, "অথচ কি বিশ্রী ব্যাপার! এমন সুন্দর সন্ধ্যাটা চাঁদ উঠলে কোথায় উপভোগ করা যাবে—"

তপন বলিল, "সন্ধ্যাকে মাটি করতে প্রথমেই ভুল করেচ তুমি। তোমাদের আনন্দের মধ্যে অনাহূতকে ডেকে এনে—"

ছায়া বলিল, "অন্যায় করেচি! কিন্তু তপনবাবু, মনের মস্ত বড়

একটা দোষ এই, ন্যায় অন্যায়ের অনেক ওপর দিয়েই সে হাঁটতে ভালবাসে ; চুলচেরা বিচার করে সুখ দুঃখকে কাছে টানে না।"

তপন বলিল, "হয়ত তোমার পক্ষে ভদ্রতার লেশমাত্র ত্রুটি হয় নি এবং আমার দিক থেকে সৌজন্যতার। তবু একথা স্বীকার না করে পারি না, ছায়া, দৈবক্রমে আহ্বানটা না করলেই করতে ভাল।"

ছায়া কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া তপন বলিল, "সময় সংক্ষেপ, —ওই ওঁরা ফিরে আসচেন, কথাটা বলে নিই। আমরা পরস্পরকে জানি। দুদিন বাদে দু'জনের যে কোথায় আশ্রয় মিলবে—তাও বুঝি! নিমন্ত্রণ করে অনায়াসে তুমি আমাকে এ-আনন্দের ভাগ দিতে পারতে। অথচ—"

ছায়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "অথচ নিমন্ত্রণ করিনি। হাঁ—করিনি! তার কৈফিয়ৎ আজ আপনাকে দেব না। কি আশ্চর্য্য দেখুন, ভবিষ্যতে কোথায় কি হবে তার চিন্তায় এখন থেকে মন যদি হাঁপিয়ে ওঠে ত মানুষের বেঁচে থাকা যে মস্ত বড় বালাই!"

তপন পরিহাস-তরল কণ্ঠে বলিল, "ভবিষ্যৎই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে না?"

ছায়া বলিল, "কেন রাখবে? ভবিষ্যৎ ভাবতে গেলেই যে-সময়টুকু আমার হাতে—তা নষ্ট হয়ে যায়। আমি এ-টুকুও নষ্ট হতে দেব কেন?"

তপন সহসা গম্ভীর হইয়া কহিল, "বেশ, ভাল কথা। তবে আমি বলছিলুম কি, মানুষ ত প্রজাপতি নয় যে, দু'দণ্ডের জন্যই তার খেলা, সৌন্দর্য্য, আনন্দ যা-কিছু!"

ছায়া বলিল, "খাঁচার পাখীও নয় যে—বেঁধে রেখে কাকলি শুনবেন।"

সহসা একটা তীক্ষ্ণ তীর বুকে আসিয়া লাগিলে—যেমন অতি বেদনায় মুখ হইতে শব্দমাত্র বাহির হয় না—তেমনই তপন কোন উত্তর দিতে

পারিল না। ক্রোটনের বড় ডালটাই ভাঙ্গিয়া বার দুই এ-ধার ও-ধার ঘুরাইয়া পায়ের তলায় ফেলিয়া দিল ও ছায়ার পানে না চাহিয়াই চলিতে আরম্ভ করিল।

ছায়া বলিল, "রাগ করলেন?"

তপন চলিতে চলিতে মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, "রাগ, দুঃখ কিছু নয়। বরং আনন্দ।" পরে মুখ ফিরাইয়া হাসি টানিয়া কহিল, "মুক্তির আনন্দ—; সত্যকার আনন্দ। তুমি ভবিষ্যতের চিন্তা থেকে আমায় মুক্তি দিলে—এ জন্য তোমায় সহস্র ধন্যবাদ।"

তপন চলিয়া গেল।

ছায়া ঈষৎ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া ভাবিতে লাগিল, তপন বাবুর কথায় যদি আনন্দই থাকবে ত উনি অমন শুকনো হাসি হাসলেন কেন? না,—এত অল্প বয়সে—এমন serious!

ভূপতিত ক্রোটনের ডালে পা রাখিতেই ছায়ার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বেচারা নহে ত কি! মনের ক্ষোভ গাছটির উপর দিয়াই মিটাইয়া লইল! ভাগ্যে বিবাহ হয় নাই। হইলে নিষেধ অনুশাসনের কড়া আইনকানুনে আমি ত একতিলও নিশ্বাস ফেলিতে পারিতাম না।

* * *

বাগান হইতে বাহির হইয়াই তপনের মনটা হালকা হইয়া গেল। সে ঠিক করিল, এখন বাড়ি যাওয়া হইবে না। বাগানের ধারে ছোট ঘরখানিতে দিয়া বসিলে—এ মুক্তির উল্লাস মরিতে দণ্ড দুইও বিলম্ব হইবে না। বইয়ের রাশি সম্মুখে রাখিয়া অর্গ্যানটার দিকে পিছন ফিরিলেও মন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাগানের মধ্যেই ছুটিয়া যাইবে। ভবিষ্যৎ না আসুক, অতীত আসিতে পারে। এবং যে-কয়টি মুহূর্ত্ত ভাবীর কল্পনায়

কাটিয়া গিয়াছে—সেই মুহূর্ত্ত ক'টি দণ্ডে ভর দিয়া মনকে কোথায় উধাও করিয়া দিবে, কে জানে? তখন এ অবারিত উল্লাস কোথায় থাকিবে?

সুবোধের মেসে যাওয়া যাক। হাঁ, সেখানে যাওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। আজ সুবোধকে জানাইবার ভাষা তার কণ্ঠে আসিয়াছে। দুর্ব্বলতা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, মনের মধ্যে দুর্গম দুর্গই গড়িয়া উঠিয়াছে। বাঃ, চমৎকার উত্তর সে ছায়ার মুখের উপর দিয়াছে! মুক্তি! মুক্তি!

চলিতে চলিতে সে সশব্দে হাসিয়া উঠিল। পথের দুইধারের লোক-গুলা একবার চাহিয়া দেখিল; তপন সে-দৃষ্টিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না —ট্রামে গিয়া উঠিল।

মেজ বৌদির আগ্রহেই অমন একটা আশা সে জ্বালিয়া ছিল বটে! যাক, ভালই হইল। সে-আলো ছায়াই ফুৎকারে নিবাইয়া দিয়াছে, তপনের দায়িত্ব ইহাতে কিছু নাই। হয়ত মেজ বৌদির মন এই আশাভঙ্গে মুহ্যমান হইয়া পড়িবে; কার মনই বা না পড়ে? এত অল্প বয়সে ঐ ছায়া-আলো ভরা আশাকে স্থান দিয়া তপনের মনই কি ক্ষণে ক্ষণে দুলিয়া উঠিত না! কিন্তু আশ্চর্য্য! যেমন অপ্রত্যাশিত আঘাতের সঙ্গে মুক্তি আসিল, প্রথমটা বেদনা—পরে উল্লাস। সে বেদনার তীক্ষ্ণতা বড় কম নহে; উত্তেজনা দমন করিতে অত বড় ডালটাই ভাঙ্গিয়া ছিল। আঃ—! এখন কোথায় সে বেদনা! তার পরিবর্ত্তে তেমনই অত্যুগ্র উল্লাস। এ উল্লাস একা সহ্য করা কষ্টকর। সুতরাং, সুবোধকে তার চাই।

গ্যাসের আলোর নীচে জ্যোৎস্নার নামগন্ধও ছিল না। তপন গুণ গুণ করিয়া গান ধরিল।

গান উচ্চ গ্রামে উঠিবার আগেই ট্রাম থামিয়া গেল। যাত্রী-অবতরণের শব্দে তপনকেও গান থামাইয়া নামিতে হইল। ট্রানস্‌ফার

টিকেট লওয়া সত্ত্বেও পোল পার হইয়া হাঁটিতে তার ইচ্ছা হইল না। একটু শীঘ্র যাওয়া চাই, বাসে উঠাই ভাল।

সুবোধের মেসের প্রবেশ-পথটি সঙ্কীর্ণ। সরু গলি, ইঁট দিয়া বাঁধানো—গাড়ি চলে না। উপরে চাহিলে নীল আকাশের ফালি অতি অস্পষ্টই চোখে পড়ে। সে টুকু কখনও অন্ধকারে নক্ষত্র-খচিত, কখনও বা জ্যোৎস্নায় ফিকে। সারারাত গলির উপর দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টিকে সজাগ রাখিলে তবে যদি চাঁদকে দেখা যায়। কিন্তু যাহারা সে-গলিতে বাস করে, তাহারা চন্দ্র-সূর্য্যের ধার বড় একটা ধারে না। উপরের ঘরে খোলা জানালা-পথে যদি বা চাঁদ—জ্যোৎস্না-হাসি বিতরণ করেন, চক্ষু মুদিয়া মানুষ পরম অবহেলাতেই তাহা উড়াইয়া দেয়। কর্ম্ম-ক্লান্ত নীরস জীবনের মধ্যে এমন একটা আর্দ্র পরিবেশন সর্ব্বসময়েই যেন অসহ্য বা অদ্ভুত। শহরের ধূমমলিন আকাশের সঙ্গে মানুষ যে অতি মাত্রায় বাস্তববাদী হইয়া উঠিতেছে—এই গলির মধ্যে নির্ব্বাসিতা প্রকৃতিকে দেখিয়া এ জ্ঞান অনায়াসে জন্মে।

সুবোধের মেসের দোর গোড়ায় গ্যাসের আলো পড়ে নাই, এই ফালি আকাশের ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্নাই আসিয়া পড়িয়াছে। এতক্ষণে তবে চাঁদ উঠিয়াছে। ময়লা আলো—অন্ধকার গলিটার স্থানে স্থানে বিগত ক্ষতচিহ্নের মত। ক্ষত অল্প দিনের, তাই সাদা দাগ কালো হইয়া উঠে নাই। যাই হোক, গঙ্গার ধারে—গ্যাস বিদ্যুতের আওতা ছাড়াইয়া এই আলোককে হয়ত সুন্দর বলা চলে, উপভোগ করাও যায়। খানিক ছুটাছুটি, খানিক কলহ-কোলাহল, খানিক বা শুইয়া শুইয়া উপর পানে চাহিয়া থাকা—বেশ লাগে। বুড়া বট গাছের ফাঁকে ফাঁকে আলোর ফুলকি। আলো অন্ধকারে লুকোচুরি খেলা। সারা বাগানটার পলায়িত অন্ধকার ঐ বড় গাছটার তলায় আসিয়া জড়ো

হইয়াছে। হাওয়ায় গাছের পাতাগুলি দুলিল ত অন্ধকারের কি সে কাঁপুনি!

দূর ছাই! এঁদো গলিতে দাঁড়াইয়া একটুকরা মরা-জ্যোৎস্না দেখিয়া তার মন একেবারে পাখা মেলিল যে!

দ্বার ঠেলিয়া সে মেসের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সুবোধ ছাদে পায়চারি করিতেছিল। তপনকে দেখিয়া ছাদের অন্য কোণ হইতে পায়াভাঙ্গা বেঞ্চখানা টানিয়া আনিয়া কহিল, "বোস।"

তপন বলিল, "বসলেই ত ভূমিলাভ।"

সুবোধ বলিল, "না, ও ধারটায় ভাঙ্গা দেওয়াল আছে, পড়বিনে। এই দেখ।" বলিয়া নিজে বসিল।

তপন বলিল, "ঘরেই চলনা কেন?"

সুবোধ হাসিয়া বলিল, "দিব্যি জ্যোৎস্না। এ সময়ে আলো জালিয়ে ঘরের মধ্যে বসতে ইচ্ছে করে?"

তপন বলিল, "তোমাকেও দেখচি কাব্যিতে পেয়েচে!"

সুবোধ বলিল, "কাব্যের বয়স এখনই কি পেরিয়েচে রে? যদিও ওর মাঝখানে মস্ত একটা ছেদ টেনেছি।" কথা শেষ করিয়া সুবোধ আকাশের পানে চাহিল।

তপন উৎসুক হইয়া কহিল, "সেই দুর্গম দুর্গের ইতিহাসটা বলবে, সুবোধ দা?"

সুবোধ বলিল, "ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ভাল নয়, ওতে মনটাকে ভারি কোমল করে। তার চেয়ে মাস্‌ল্ ডানসিং যদি দেখতে চাস—"

তপন আর্ত্তের ভান করিয়া কহিল, "রক্ষে কর তোমার মাস্‌ল্ ডানসিং—তার চেয়ে চাঁদের আলো সইতে রাজি আছি।"

সুবোধ তপনের মুখের পানে নিবদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া সকৌতুকে কহিল, "ব্যাপারটা বড় সুবিধের বোধ হচ্ছে না। শেষ বয়সে শ্লেষ্মা বৃদ্ধির ভয়ে যাঁরা চাঁদকে আমল দেন না, তুমি নিশ্চয়ই সে-দলের নও!"

তপন বলিল "চাঁদ শুধুই শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে না, সুবোধ-দা।"

সুবোধ বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা বটে! প্রকৃতির ওপর ওর আলোটা চিরদিনই সক্রিয়। সমুদ্রে জল বাড়ে, নামে জোয়ার। মনেতে—"

তপন কহিল, "তোমার সায়ান্স রাখ। ঠাট্টা নয়, বলনা তোমার ইতিহাস?"

সুবোধ বলিল "ইতিহাস? মানে অতীত? অতীতের আলোচনায় মনের দৌর্ব্বল্যকে টেনে এনে দেখতে যারা ভালবাসে—আমি তাদের দলে নই, তপন। যা অতীত, তা সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়েই যাক। তার মূল্য যাচাই করতে মাঝে মাঝে দু-একটা দীর্ঘনিশ্বাস বা চোখের কোণে কয়েক ফোঁটা জল টেনে আনা আমার দ্বারা হবে না।"

তপন বলিল, "হয়ত তোমার উপকার না হতে পারে, কিন্তু যারা নতুন, তাদের শিক্ষার কি কিছু নেই এতে?"

সুবোধ হাসিয়া বলিল, "না, কিছু নেই। মনের মানদণ্ডে স্থিতিশীলতার গন্ধও তুমি খুঁজে পাবে না কোনদিন। যেমন ধরনা—মৃত্যু। চোখের উপর অহরহ ঘটচে, তবু অন্যায়, অত্যাচার, পাপ প্রভৃতি বিষয়ে মানুষকে কখনও সচেতন করে তুলতে পারলে না। যেমন প্রেম। অনন্তকালের বিরহ বয়ে আজও যমুনার জলে শ্রীরাধার বিলাপধ্বনি মর্ম্মরিত। কত ট্রাজেডি, কত না রাজ্য, প্রাণ, সম্মান, খ্যাতির পতন ঘটলো, তবু, সাবধান হবার আগ্রহ মানুষের এলো না। অতীতের লেখা পাঠ করে কি হিসাবী মানুষ সাবধান হতে পারত না, তপন?

পারত! কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধির আলোর নীচেয় ওইটুকুই তার ছায়া, ওই-টুকুই তার ফাঁক।"

তপন বলিল, "তা হোক। অতিবুদ্ধির চুলচেরা বিজ্ঞতার মাঝে অসাবধান মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতাটুকু ভারি চমৎকার করে রেখেচে জীবনকে। এত বড় ফিলজফি যিনি সৃষ্টি করেচেন—"

সুবোধ বলিল, "তাঁকে কৃতজ্ঞতা পরে জানালেও কোন ক্ষতি হবে না! আপাতত তোমার বার্ত্তা কি? দেহের নয়, মনের!"

তপন বলিল, "দাঁড়াও, তোমার অতগুলো কথার উত্তর না দিলে মনে করবে,—বুদ্ধি আমার একদম ভোঁতা। আমি তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইনে, যে-হেতু. আমার বিশ্বাস—তিনি বলে কোন পদার্থ এই বিশ্বমাঝে নেই।"

সুবোধ বলিল, "তবে ত তর্কেরও পরিসমাপ্তি।"

তপন সে কথায় কান না দিয়া বলিতে লাগিল, "শাস্ত্র আছে, যুক্তি আছে এবং যাঁদের আছে প্রচুর অবসর—তাঁরা তাঁর সম্বন্ধে গবেষণা করুন। আমার জীবনের দুর্ব্বলতা যদি আমি বুঝতে পারি, সুবোধ-দা—ত বুদ্ধির সতর্কতায় কেন তাকে শুধরে নেব না?"

সুবোধ বলিল, "জীবনের এমন অনেক ক্ষণ কি আসে না যখন ইচ্ছে করেও ভুল করতে ভাল লাগে?"

তপন বলিল, "হয়ত আসে, কিন্তু ভুলকে তখন ভুল বলে মোটেই মনে হয় না।"

সুবোধ বলিল, "ঐ ত মজা। ইতিহাস বারবার পাঠ করলেও নিম্নগতির স্রোত সব সময়ে রোধ করা সম্ভব নয়। যে ভালবাসে—দুঃখ জেনেই ভালবাসে।"

তপন বলিল, "না সুবোধ-দা, ভালবাসে নিজেকে সুখী মনে করে।

হয়ত দুঃখ তার গৌণফল, তবু তার মধ্যে সে সুখের সান্ত্বনাই খুঁজে পায়।”

সুবোধ বলিল, “তবেই বোঝ—অন্ধত্ব তার ঘোচে না। মন যা চায় সে তা না করে পারে না; তা সে দুঃখই বল—আর সুখই বল।”

তপন সুবোধের পানে ম্লানদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, “তাই ত জ্যোৎস্না ভাল লাগচে না, সুবোধ-দা। চল, ঘরে গিয়ে বসি।”

সুবোধ মৃদু হাসিয়া বলিল, “অন্তরে যদি জ্যোৎস্না ওঠে—বাইরের অমাবস্যায় কি যায় আসে! তোমার বিয়ের চিন্তাটাই বুঝি প্রবল হয়ে উঠেচে?”

তপন একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, “ঠিক প্রবল নয়—অথচ কি জান, কিছুতেই ওটা ভুলতে পারচিনে। এমন আশ্চর্য্য এই পৃথিবী, যাকে একবার কামনার মধ্যে চকিতের জন্যও পায়, তাকেই প্রেয় বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করে না। যত বাধা বিপত্তি উত্তাল হয়ে ওঠে, ততই কামনার বেগ বাড়তে থাকে।”

সুবোধ হাসিয়া বলিল, “ওটা মানুষের **instinct.** দেখনা, চোরকে সবাই মিলে ভৎর্সনা প্রহারে নীতিশিক্ষা দিতে ত্রুটি করে না, অথচ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে মন অনুসন্ধান করলে বুঝবে—নীতিবিদ্‌দের মনেও চুরির জন্য ছোট্ট একটু কামনা দিনরাত মিটিমিটি জ্বলচে। যা আমরা নীতি-ধর্ম্মের ভয়ে পালন করতে পারি না, সেই নিস্ফল কামনা অন্যের মধ্যে সাফল্যলাভ করলেই ক্রোধে আমরা আত্মহারা হই। বাধা পেলে বৃত্তি ত প্রবল হবেই। তা না-হলে পৃথিবী-জোড়া এমন সুচারু সভ্যতার উদয় হয়ত কোন দিন ঘটতো না।”

তপন বলিল, “তুমি যে বলেছিলে মনের মধ্যে রচনা কর—এক

দুর্গম দুর্গ! সুবোধ-দা, এযে মানুষের মন। বাইরের গোলাগুলি ঠেকাতে ইট, পাথর, বালি, লোহা অতি প্রয়োজনীয়, কিন্তু এখানে ছোট একটি ফুল বা একটুকরা জ্যোৎস্না অনায়াসে সে দুর্গকে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে পারে।"

সুবোধ বলিল, "তা ত পারেই। তাই ত অনুশাসন দরকার। কিন্তু আপাতত কি এমন হলো যে—"

"বলচি। কিন্তু দোহাই তোমার হেসো না। অন্যের কাছে ছেলেখেলা হলেও এ আমার জীবন-মরণের ব্যাপার।"

অগত্যা সুবোধ চুপ করিল।

তপন একে একে সমস্তই বলিয়া গেল। বোটানিকাল গার্ডেনের পিক্‌নিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া তরুণের মেয়েলী গান—সম্মোহনের জাল বিস্তার,—(এটা অবশ্য তপনের অনুমান) ছায়ার দুটি গণ্ডে অস্ত-সূর্য্যের রক্তাভা এবং সর্ব্বশেষ ছায়ার সেই মন্তব্য,—"মানুষ ত খাঁচার পাখী নয় যে, বেঁধে রেখে কাকলি শুনবেন ?'

সুবোধ মন্তব্য করিল, "**my dear friend, don't talk rot**।"

তপন বলিল, "বাজে! তুমি যদি এমন অবস্থায় পড়তে—"

গম্ভীরভাবেই সুবোধ উত্তর দিল, "তা হলে মেয়েলী অভিমান নিয়ে সেখান থেকে চলে আসতাম না নিশ্চয়। এই বয়সে অতটা সেন্টিমেণ্ট্যাল হওয়া—"

তপন অল্প উত্তেজিত হইয়া কহিল, "তারা আমায় চায় না, অথচ নির্লজ্জের মত আমায় সেখানে থাকতে হবে! এত বড় আত্মসম্মানহানিকর কাজ—"

সুবোধ বলিল, "পৃথিবীতে নেই। কিন্তু কাপুরুষের মত স্বত্বত্যাগ করে আসা তার চেয়েও মুখ্যুমি।"

তপন উত্তরোত্তর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। বেঞ্চের উপর একটা চড় মারিয়া কহিল, "তুমি হলে—"

হাসিয়া সুবোধ বলিল, "শেষ পর্য্যন্ত থাকতাম। ছায়াদেবীকে তাঁর বাড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছে দেবার ভারও হয়ত নিতাম। তিনি যখন ডেকে আমায় আনন্দের ভাগ দিলেন—তখন তাঁকে বিমুখ হবার সুযোগ দেওয়া—অন্তত আমার ভদ্রতায় বাধা উচিত।"

তপন বলিল, "এখনও কি শিভ্যল্‌রির যুগ আছে, সুবোধ-দা? এ বীরত্ব তিনি হয়ত অন্যভাবে নিতে পারতেন।"

সুবোধ বলিল, "অর্থাৎ সাইকোলজির চর্চ্চাটা তুমি পুরোদস্তুরই করেচ দেখচি। তিনি কি করতেন না-করতেন তার চুলচেরা বিচার যদি করতে পারলে—ত তোমার কি করা উচিত ছিল তা কেন একবারও ভাবনি! নাঃ, তুমি দেখচি নেহাৎ আনাড়ী। ইতিহাস নয়, অঙ্ক কষে তোমার বুদ্ধিকে শাণিত করা দরকার।"

তপন কোন কথা না কহিয়া সুবোধের পানে হতবুদ্ধির মত চাহিয়া রহিল।

সুবোধ আশ্বাস দিয়া কহিল, "ভাবনার এতে কিছু নেই। যদি সত্যই তাঁকে ভালবেসে থাক—"

তপন মাথা নাড়িয়া বলিল, "ভালবাসার দুর্ব্বলতা বা অবসর আমার নেই।"

সুবোধ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "তবে?"

তপন বলিল, "তাই বলে আমার কামনার হন্তারক যে অন্যে এসে হবে এ-ও সহ্য করতে পারবো না, সুবোধ-দা। যে ব্যাপার বছর কয়েক পরে ঘটবে, সে ব্যাপারের মধ্যে—অন্যের ছায়া দেখতে আমার এতটুকু আগ্রহ নেই।"

সুবোধ বলিল, "একটু আগে বলছিলে এ খেলা নয়, তোমার জীবন-মরণের কথা। আমি দেখছি—খেলা ছাড়া এর মধ্যে একবিন্দুও সত্য নেই।"

রূঢ় কণ্ঠের আভাসে তপন চমকিত হইয়া উঠিল।

সুবোধ বলিতে লাগিল, "এ কি জান? ফুটবল খেলায় নেমে এক ঘণ্টার জন্যে যেমন জীবনপণ করতে হয়, তেমনি। যাই খেলা শেষ হলো, সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনারও অবসান। তখন খোঁড়া পা নিয়ে কত না ব্যস্ততা! জীবনের সব ক্ষেত্রেই এত অল্পসময়ে হারজিতের মীমাংসা কখনও করতে নেই।"

তপন অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিল, "ও-সব monitory ছাড়।"

সুবোধ দাঁড়াইল। বারকয়েক ছাদে পায়চারি করিয়া তপনের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "স্কুলে যেমন মাস্টারের দরকার, তোমাদের মত তরলমতি ছেলেদের তেমনি monitor. রাগ করো না, তিন বছর পরের সম্বন্ধকে এখন থেকে যদি সত্যি ভাবতে পার ত ভালবাসাকে লজ্জাকর মনে করচো কেন? মনে কর না কেন—ও আমার গৌরব এবং ওই গৌরবের জয়মাল্য একদিন আমারই কণ্ঠকে গৌরবান্বিত করবে।"

তপন হাসিয়া কহিল, "তুমি উত্তেজিত হয়েছ, সুবোধ-দা।"

সুবোধ পেশীস্ফীত বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া কহিল, "হয়ত হয়েছি। মন যা স্বীকার করে মুখে তা প্রকাশ করাই লজ্জার—এই মনোভাবকে আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না। একটা বাহ্যিক ভান, মানুষকে নীচেয় নামাতে ওর অসাধারণ ক্ষমতা। যদি ভালবাসবে—সে-কথা স্পষ্টই স্বীকার করবে। লোকের মতামতের ওপর তোমার মনকে দাঁড় করিয়ে যদি চল ত—ছদ্মবেশের লজ্জা ও গ্লানি আজীবন তোমায় বইতে হবে জেনো।"

সুবোধ তপনের পানে না চাহিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল।

তপন কি ভাবিয়া একবার উপর পানে চাহিল। তীরগতিতে নীল আস্তরণ ভেদ করিয়া চাঁদ ছুটিয়া চলিয়াছে। আসেপাশে সঞ্চরণশীল মেঘের সঙ্গে তার প্রতিযোগিতা। কৌশলী চাঁদ দক্ষ রথীর মত কখনও বা পাশ কাটাইয়া, কখনও বা মেঘব্যূহ ভেদ করিয়া তরতর করিয়া চলিয়াছে। যদি বা মালিন্য জমিতেছে—মুহূর্ত্তের তরে, গতি নিমেষের তরেও ব্যাহত হয় নাই। প্রকৃতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জীবনকে মিলাইয়া মানবের অজ্ঞাত-নয়নের দৃষ্টিকে বুঝি তীক্ষ্ণতর করিয়াই তুলে!

উপর হইতে চক্ষু ফিরাইয়া সে ছাদের পানে চাহিল। ওধারে প্রকাণ্ড বারবেলটা পড়িয়া আছে। ছেঁড়া কাগজ, ভাঙা বেতের চেয়ার, সাইকেলের চাকা একখানা কতকগুলি তক্তার সঙ্গে এককোণে জড়ো করা।............

ভাল কথা, কি সে বলিতে আসিয়াছিল—সুবোধকে? মুক্তির কথা। তার মোহের অবসান হইয়াছে এই কথা না? কিন্তু এতক্ষণ ধরিয়া কি সব শোনাইল? তার না আছে অর্থ, না আছে যুক্তি। ওই ছেঁড়া কাগজ, ভাঙ্গা চেয়ার, তোবড়ানো চাকা ও অদরকারী কাঠের টুকরার মত তা নিতান্তই বাজে। মুক্তির সংবাদ দিতে গিয়া বন্ধনের বিস্তারকে সে এমনই ভাবে প্রচার করিয়া দিল!

* * *

সারারাত্রি অবশ্য নহে, যে সময়ে সে নিদ্রা যায় তাহারও দণ্ড দুই বেশি সময় সেদিন ঘুমাইতে পারিল না। কেবল সুবোধের কথা ও বাগানের আচরণের তুমুল আলোচনা চালাইয়া স্থির করিল, মনের মধ্যে কামনা যখন কায়া বিস্তার করিয়াছে—তখন সে কায়ায় জীবন-প্রতিষ্ঠার ভার বা দায়িত্ব তার নিজেরই। সুবোধ ঠিকই বলিয়াছে, কাপুরুষের মত স্বত্ব ত্যাগ করিয়া আসা মূর্খতা। ঠিকই ত! কাল প্রত্যূষেই সে ত্রুটি শুধরাইয়া

লইবে। বারকয়েক প্রতিজ্ঞা করিয়া সে চক্ষু মুদিল এবং অচিরেই ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রভাতে উঠিয়াই সর্ব্বপ্রথম ভাবিতে লাগিল, কাল রাত্রিতে কোন স্বপ্ন দেখিয়াছে কি না! কৈ, না ত। বেশ গভীর সুনিদ্রাই হইয়াছিল। স্বপ্নে নাকি অনেক সময় ভবিষ্যৎ জীবনের ফল-রেখা নির্ণীত হইয়া যায়। নব-প্রকাশিত 'স্বপ্ন-রহস্য' প্রবন্ধে দিনকয়েক পূর্ব্বে সে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিয়াছে। অন্তত যদি একটা দুঃস্বপ্নও দেখিত ত পাঁজি উল্টাইয়া ফল-চর্চ্চায় খানিকক্ষণ কাটাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু আশ্চর্য্য, মনের তুমুল ঝড় যেই মাত্র নিদ্রার রূপারকাঠি স্পর্শে শান্ত হইয়া গেল, অমনই কি সমস্ত অনুভূতি তার মরণের মত স্থির—শীতল।

আলমারির উপর বইয়ের রাশি গোছানো। টানিয়া মনোনিবেশ করিবে নাকি? তাই ভাল, ক্লাশে না যাইলে **percentage** লইয়া গোলযোগ বাধিতে পারে।

বই ও খাতা লইয়া বসিল। অঙ্কশাস্ত্র নীরস কাঠের মত মাথার মধ্যে বারবার আঘাত করিতে লাগিল। বিজ্ঞান আরও বাজে। সাহিত্যে রসের তত্ত্ব মিলিলেও এখন মনে হইল, সে রস বড় ফিকা। মনকে মাতাইবার মত গাঢ়ত্ব তার নাই।

খালি পায়ে ঘরের মধ্যে বারকয়েক পায়চারি করিয়া অর্গ্যানটার সামনে গিয়া বসিল। রীডে অঙ্গুলি স্পর্শ হইতেই সেগুলা হইতে এমন বিকট আওয়াজ উঠিল যে, ত্রস্ত তপন ঘর ছাড়িয়া পলাইবার পথ পাইল না। অবশ্য যাইবার সময় চটিটা সে পায়ে দিয়াই গেল।

বাগানে নরম নরম ঘাসের উপর সুকোমল শিশির বিন্দু জমিয়াছে।

কঠিন জুতার আঘাতে সে-গুলিকে দলিয়া শ্রীভ্রষ্ট করার মধ্যে কোথাকার ছন্দ যেন ব্যাহত হইল। অন্যদিন আপন মনে নীচের দিকে না চাহিয়াই তপন পায়চারি করে; আজ কোন কিছুই ভাল লাগিতেছে না বলিয়া—ছোট বিষয়ে তার মনোযোগ অসাধারণ। ও-সব চিন্তা বা চর্চ্চায় মন নিজেরই অজ্ঞাতে কোমল হইয়া আসে এবং তুচ্ছ বস্তুও অসামান্যতা লাভ করিয়া দৃষ্টিতলে আত্মপ্রকাশ করে। ঘাসের সঙ্গে আরও কি একটা কোমল জিনিষের সাদৃশ্য আপনা হইতেই মনে জাগে। মরসুমী ফুলের হাসিটুকুও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া অপলকে দেখিলে সময়ের অপব্যয় হইল বলিয়া ত আক্ষেপ হয় না। জুতা খুলিয়া ফেলাই যাক।

আঃ! নরম কচি শিশির-ভেজা ঘাস—বৈঠকখানার পুরু গালিচার চেয়েও আরামপ্রদ। চিত্ত যেন এতক্ষণ এমনই একটা নিঃশব্দ মনোরম তাজাস্পর্শের প্রতীক্ষায় উন্মনা হইয়া ছিল। রাত্রির আকাশ চন্দ্র-তারার পাশ দিয়া চলিতে চলিতে কখন বুঝি প্রভাতের স্বপ্নে বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল এবং তার সারা দেহের স্বেদজল শিশির হইয়া ধরণীর তৃণলতায় ঝরিয়া পড়িয়াছিল। এখন প্রভাত; রাত্রি মিলাইয়াছে। কিন্তু সুখস্বপ্নের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ তৃণশিরে এই শিশির বিন্দু। প্রকৃতি মানব মনকে মিলাইয়া ছন্দ গাঁথিতে ভালবাসে; বিজ্ঞানের এ একটা বিচিত্র তথ্য বটে। এ বিষয়ে একটা থীসিস্ লিখিলে……কিন্তু এ-সব চিন্তা থাক! পায়ের তলায় অতি সুকোমল শ্যামল স্পর্শ……তপন হাসিল। স্পর্শ শ্যামল? কাব্যের আর বাকি বা রহিল কি? পরমুহূর্ত্তে গম্ভীরভাবে সে ঘাড় নাড়িল। হাঁ, শ্যামলই ত। মাটির রসে তৃণ যেমন শ্যামল অর্থাৎ প্রাণরসে রঙীন— তেমনি তার স্পর্শ। পায়ের তলা দিয়া হৃদয় ভেদ করিয়া একেবারে

মাথায় গিয়া পৌছায়। না, বিজ্ঞানের তথ্য ভারি সহজ বলিয়াই বোধ হইতেছে। মাথায় পৌছিয়া—তারপর—ধীরে ধীরে সে শিরায় রক্ত-কণিকায় ছড়াইয়া পড়ে। তার পর—বোধ বা চেতন-শক্তির ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে চলাফেরা।

জুতাটা আবার সে পায়ে দিল। স্বপ্ন রাত্রিই ওই অসীম শূন্যের যাত্রী হইয়া দেখিয়াছিল বটে এবং স্বেদজলে তৃণশিরে সে-মোহ এমন করিয়া মাথাইয়া রাখিয়াছে যে, স্পর্শমাত্র মানব মনও প্রমত্ত হইয়া উঠে। ঈষৎ তন্দ্রাতুর, ঈষৎ আলস্য। শীত-প্রত্যূষে উষ্ণ চায়ের স্পর্শমাত্র ওষ্ঠ যেমন অবসাদ-মিশ্রিত আরাম সংগ্রহ করিয়া সারা দেহকে স্নেহসিক্ত করিয়া তুলে।

বাসে উঠিয়া সেই দূর শ্যামবাজারে যাওয়া উচিত! কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া সে আপনমনেই হাসিল। ভয় দেখ একবার! কাল রাত্রির মধ্যে ছায়া যেন তরুণেরই ছায়া হইয়া গেল। সে যে-দিকে ফিরিবে তার বিপরীত দিকে পদতল-প্রসারিত দীর্ঘতায় তার অস্তিত্ব। আর এই যে দীর্ঘদিন পরে সম্বন্ধ-বন্ধনের সূত্রটি শক্ত হইয়া উঠিবার অপেক্ষায় দু'টি সংসারকেই রঙীন করিয়া তুলিয়াছে—তার কি একবিন্দুও সত্য নহে? কল্পনার দোষ অনেক। কুযুক্তি তার একমাত্র সহায় বলিয়া, যত কিছু যুক্তিবিরুদ্ধ—সেই সবকেই মনে মনে পোষণ করে। আশ্চর্য্য!

বীডনস্কোয়ারের পাশ দিয়া বেথুনের বাস বাহির হইয়া গেল। বাসের পিছনে কতকগুলি মেয়ে হাঁটিয়া আসিতেছে। ছায়া নিশ্চয়ই ওই দলে।

বাসে বন্দিনী হইয়া যে-সব মেয়ে—প্রতিদিন কলেজে পড়িতে যায়, তাহারা পর্দ্দার পিছনে থাকিয়া,—কিছু বা সম্ভ্রম বাঁচাইয়া শিক্ষার আলোকে

ক্রমশঃ মনকে প্রশস্ত করিয়া তুলে। (কেহ কেহ যে দূরত্ব-নিবন্ধন বাসের আরোহিণী হইতে পারে—এ সম্ভাবনাকে তপন একদম আমলেই আনিল না। কেন ট্রাম রহিয়াছে কি জন্য? সাধারণ বাস?) উহাদের বাড়ির আচার-অনুষ্ঠান সবেমাত্র হয়ত বন্ধনসীমা অতিক্রম করিতেছে। সমাজকে সন্তর্পণে বাঁচাইয়া উহারা প্রগতির দিকটাকে বাছিয়া লইয়াছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে এক উদার সমাজ গঠনের কল্পনাও মনে মনে পোষণ করেন। সেই সব শিক্ষিত সনাতনী হিন্দু পিতামাতার সন্তান ইহারা।

ছায়ার শিক্ষা কুণ্ঠা-সঙ্কোচশূন্য হইয়াই আরম্ভ হইয়াছে হয়ত। বীডনস্কোয়ার হইতে শ্যামবাজারের দূরত্ব অল্প নহে। বাঙালী মেয়ের ট্রাম বা বাসে উঠা আজকালও একটা দুরূহ ব্যাপার। মিহি শাড়ি ভেদ করিয়া কতজোড়া কামনা-কলুষিত দৃষ্টি যে তীক্ষ্ণ তীরের মত সর্ব্বাঙ্গে আসিয়া বিঁধে তাহা একান্ত অবহেলায় গ্রাহ্য না-করার মত শক্তি কয়টি মেয়েরই বা আছে? ক্রোধ হইলেও মুখ ফুটিবে না, লজ্জা হইলেও চক্ষুকে পল্লবাবৃত করিবে না বা মুখ ফিরাইয়া লইবে না। স্থির অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে হইবে। একা পড়িলে ত রক্ষা নাই। মুখ বুজিয়া যেন ফাঁসিকাঠের আসামী।

ছায়া ট্রামে উঠিল না, বাসের প্রতীক্ষায়ও দাঁড়াইল না—হাঁটিয়াই চলিল। সাহসিকা বটে। স্যাণ্ডেল পায়ে দু'পাশের কৌতূহলাক্রান্ত জনতার মাঝখান দিয়া পথ করিয়া চলা—যে-কোন বিশাল সৈন্য বাহিনীর সম্মুখীন হওয়ার সমান। তপন মনে মনে ছায়ার উপর শ্রদ্ধান্বিত হইল। হাঁ, মেয়েটির মনে তেজ আছে। অকুণ্ঠ—অদম্য সে তেজ। সূর্য্যকিরণের মত যাতে পড়ে তাকেই উজ্জ্বল করিয়া তুলে। বীডন-উদ্যান হইতে বাহির হইয়া তপন ছায়ার সন্নিহিত হইতে মোড় পার

হইবার জন্য যে একমিনিট অপেক্ষা করিতেছিল, সেই একমিনিট অকস্মাৎ যেন ঘণ্টার ঘরে আসিয়া ঠেকিল। ট্রামই একখানা সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। ট্রামের ফাষ্ট ক্লাসে কোঁকড়াচুলেভরা মাথাটি লইয়া পাঁশনে চোখে তরুণের মূর্ত্তি। ও-পাশে ফুটের পানে চাহিয়া তার চক্ষু দুটি অকস্মাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মাথাটি মনোজ্ঞ-ভঙ্গিতে হেলাইয়া স্মিতহাস্যে সে ছায়াকে (ট্রামের আড়ালে পড়িলেও তপন অনুমানের চক্ষুতে দেখিল) অভিবাদন জানাইল এবং হাত নাড়িয়া ট্রামে উঠিবার ইঙ্গিত করিল বোধ হয়। ছায়ার মূর্ত্তি তরুণের পাশে—দেখা গেল না। ট্রামটা সেকেণ্ডকয়েক থামিয়া চলিয়া গেল বলিয়াই কি ছায়া উঠিবার অবসর পাইল না? না, ইচ্ছা করিয়াই উঠিল না? তরুণের ঐ সুষ্ঠু অভিবাদন, হাত তুলিয়া ইসারা—তপনকে যেন চোখ রাঙাইয়া শাসন করিয়া দিল। তরুণ জনসমাজে সুন্দর রুচি ও মার্জ্জিত ব্যবহারের সৌজন্যতায় অতি সহজেই স্থান সংগ্রহ করিয়া লইবার কৌশল জানে। গলা মিষ্ট, কথার প্রয়োগ-নৈপুণ্যও তার আছে। এই যে অসংখ্য মেয়ে পায়ে হাঁটিয়া বিদ্যায়তনের বাহিরে আসিল ও কৌতূহলী জনতার দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া কলহাস্যে সঙ্গিনী সহ পথ অতিক্রম করিতে লাগিল—একটু আগে তপন উহাদের সাহসিকতায় শ্রদ্ধান্বিত না হইয়া পারে নাই। কিন্তু এখন মনে হইল, কিছু অশোভনতা যেন এই সব সাবলীল স্বচ্ছন্দ-গতির কোথাও না-কোথা লুকাইয়া আছে। পুরুষের লালসা-কলুষিত দৃষ্টি তীরের মত আসিয়া যখন রূঢ় আঘাত করে, তখনই মনে জাগিয়া উঠে অসন্তোষ; কিন্তু ভদ্রতার কোমল আবরণে মণ্ডিত হইয়া সে স্নিগ্ধদৃষ্টি চন্দ্রকিরণের মত সর্ব্বাঙ্গে পুলকসঞ্চার করে,—তাহার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন লালসার পঙ্কিলতা নাই,—তাহাই বা কে বলিবে? সোজা দৃষ্টিকে অবজ্ঞা

বা অন্য উপায়ে ব্যর্থ করা যায়, কিন্তু এই সব সৌজন্যভরা-আচরণের —কলুষ-ত্রুটি নিরীক্ষণ করিবার মত চক্ষু কয়জনের আছে? অতি লজ্জার মধ্যে জড়তামিশ্রিত সঙ্কোচ যেমন মনকে উত্যক্ত করিয়া তুলে, অতিসাহসিক আচরণেও তেমনই একটা অমার্জ্জনীয় রূঢ়তা।

"হ্যাল্লো, মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবচেন?"

তপন চমকিত হইয়া সম্মুখে চাহিল। সঙ্গিনীরা কেহ নাই, একাকিনী ছায়া। মনের মধ্যে অকস্মাৎ উল্লাসের একটা মৃদু কলরব উঠিল! ছায়া সোজা না চলিয়া এ-পারে আসিল কেন? তপনকে দেখিয়া কি?

সে উত্তর দিল, "হাঁ, মোড় পার হতে যাব এমন সময় ট্রামখানা এসে পড়লো। এ-দিকে ফিরলে যে?" বলিয়াই একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল। ছায়া হয়ত ভাবিতে পারে—তপন তাহাকে গেট হইতে লক্ষ্য করিয়াছে, নহিলে এমন একটা প্রশ্ন করিয়া বসিবে কেন?

ছায়া সে-সব কিছু না মনে করিয়াই বলিল, "ফিরলুম এমনি। সামনেই বাগান, মনে হলো খানিক বসেই যাই।"

অকারণ-উল্লাসের কলবর থামিয়া গেল। ছায়া তাহাকে দেখিয়া ফিরে নাই।

ছায়াই কথা বলিল, "আসুন, বসবেন না?"

তপন নিরুৎসাহভাবে উত্তর দিল, "অনেকক্ষণ বেরিয়েচি—"

ছায়া অনুনয়ের স্বরেই বলিল, "তা হোক, আসুন। খানিক গল্প করা যাক।"

ঘাসের উপর দু'জনে বসিল।

আসেপাশে চারিধারেই বালক, বৃদ্ধ, যুবক হাসিগল্পে মাতিয়া উঠিয়াছে। হংসডিম্বাকৃতি দীঘি ঘিরিয়া স্বাস্থ্যকামীদের সে কি দ্রুত

পদচারণা। কোন প্রকারে বারকতক পাক দিতে পারিলেই দেহযন্ত্রটা উন্নত করিতে পারিবে, এই ভরসা তাহাদের মনে প্রচুর। চারিপার্শ্বের রাজপথ হইতে বাস-মোটরের যাতায়াতে ধূলি উড়িয়া বাগানের পত্র বিবর্ণ করিয়া দিতেছে, স্বাস্থ্যকামীদের চোখে সে ধূলার লেশমাত্রও ধরা পড়ে না! পড়িলে এই সঙ্কীর্ণতম পুষ্করিণী ঘিরিয়া চলিবার উৎসাহ সেই মুহূর্ত্তেই লোপ পাইত।

যাহারা বেঞ্চে বসিয়াছে বা ঘাসের উপর দেহ প্রসারিত করিয়া দিয়াছে তাহারাও, মনে হয়, পরম আরামে একটা জিনিষ উপভোগ করিতেছে। আলস্য। অন্যান্য জিনিষের মত এ-জিনিষটা কি করিয়া উপভোগ করা যায়, শহর উদ্যানে না আসিলে বুঝাইয়া বলা বড় শক্ত।

তপন ও ছায়া ঘাসের উপর বসিল, আলস্য উপভোগ করিবার জন্য নহে, গল্প করিবার জন্য। যদিও কার্য্যটা আলস্যেরই নামান্তর, তবু শ্রান্ত তরুণ-তরুণীর কানে বিশ্রম্ভালাপের এমন একটা সহজ সরল সংজ্ঞা বিশেষ মধুর ঠেকিবে না বলিয়াই···হাঁ, গল্প করিবার জন্যই তাহারা বসিল। কিন্তু কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলেও কেহ কোন কথা কহিল না। সঞ্চরমাণ জন-স্রোতের পানে চক্ষু নিমগ্ন হইয়াই রহিল; কখনও বা উর্দ্ধ আকাশ-প্রান্তে। শহর না হইলে তারাগণনার খেলা চলিতে পারিত, নদী থাকিলে নৌকাও হয় ত গণিত। দাঁড়ের জলে সোনা-জ্বলা দেখিয়া যে-আনন্দ পাইত—এই শতাব্দীতে সে-আনন্দ আর কেহ পাইবে বলিয়া ভরসা হয় না। (স্টীম এঞ্জিনের যুগ, মন্থরগতির তালে তালে অন্তর মন তিক্ত বিরক্ত হইয়া উঠে) আর বনফুলের মালা? ফেরিওয়ালার নিকট হইতে কোন রকমে লুকাইয়া যদি বা কেনা যায়, গলায় পরিবার বা পরাইবার বর্ব্বরতা কোন তরুণ-তরুণীরই নাই। ও মালা যে শৃঙ্খলের প্রতীক এ কথাটা এ-যুগের মত স্পষ্ট করিয়া কে কবে বুঝিয়াছে!

যাহা হউক, ঘাসের উপর বসিয়া তারা, ফুল বা নৌকার জন্য অধীর না হইলেও কয়েকটি কথার অদম্য স্পৃহা দুইটি তরুণ বুকে খোঁচা মারিতে ছিল।

কথার অভাব ছিল না বলিয়াই হয়ত কথা কহা ঘটিয়া উঠিল না। স্কুল-কলেজের প্রশ্ন বহুবার বহুরকমে হইয়াছে। চোখে না দেখিয়াও বারান্দা-ওয়ালা ছাত্রীনিবাসগুলি তপন স্পষ্টই দেখিতে পায়। সারি সারি ঘর। ঘরে ছোট তক্তাপোষ, ছোট টিপয় বা গোলটেবিল, বইয়ের সেল্‌ফ, কাপড় জামা রাখিবার আলনা, চেয়ার টেবিলল্যাম্প ইত্যাদি। টেবিলের উপর দোয়াত কলমের বালাই কম, ফাউন্টেনেই লেখা চলে। ফুলদানির বাসি ফুলে রোজ অল্প জল কেহ কেহ ঢালিয়া চার পাঁচ দিন সেই সৌন্দর্য্যকে অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করে! কোন কোন ঘরের কোণে স্টোভটা সকাল সন্ধ্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠে ও মজলিস জমিতে বিলম্ব হয় না। দোতলা-বাসের দৌরাত্ম্যে পথের ধারে জানালায় পর্দ্দা বিলম্বিত থাকে বলিয়া তপন ছায়ার মুখে শুনিয়াই (অবশ্য সবটুকু সে শোনে নাই। যেমন স্টোভের গর্জ্জন, ফুলদানিতে জল ঢালা ইত্যাদি। ও-গুলি তার কল্পনা-প্রসূত।) মোটামুটি এই অসম্পূর্ণ ছবিটি আঁকিয়াছে।

চশমা-আঁটা চোখের ভ্রূকুটি, রক্তলেশহীন করের সঞ্চালন, পায়ের স্যাণ্ডেল জুতার শব্দ ও সেমিজের উপর কাপড় পরিবার ধারণটিতে মাস্টার চিনিয়া লইতে কষ্টবোধ হয় না। বেত হাতে না থাকিলেও সারা মুখ-খানিতে যে রুক্ষতা ফুটিয়া থাকে, সুকুমারমতি বালিকাদের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। (ইহাও তপনের কল্পনা। কারণ প্রত্যেক নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। কোন বিশেষ মাষ্টারকে দেখিয়া সমস্তের উপর এই ধারণা পোষণ অজ্ঞতারই নামান্তর নহে কি?)

পাঠ্যপুস্তকের কথা না তোলাই ভাল। একটি ম্যাট্রিক ক্লাসের

মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলে সেও অনায়াসে বি, এ, ক্লাসের পাঠ্যতালিকা নির্ভুল মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারে। খেলার বেলায়ও একথা বলা চলে। মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল, এরিয়ান্স প্রভৃতি ক্লাবের খ্যাত-অখ্যাত সকল খেলোয়াড়ের নাম, চেহারা বা বংশপরিচয় সংবাদপত্রের মারফৎ সকলেই এমন নিখুঁত জানেন যে, নিজের বংশ, গোত্র, ঘর-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে উত্তর না দিতে পারিয়া অপদস্থ হওয়ার মত দারুণ লজ্জা কোন কালেই ভোগ করিতে হয় না।

বাকি রহিল আবহাওয়া। প্রথম আলাপ জমাইবার এ এক মন্দ কৌশল নহে। কিন্তু পরিচিতকে কথা বলাইবার প্রয়াস—এই তথ্যের মধ্যে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। শীতের সময় শৈত্যাধিক্য, গ্রীষ্মে তাপ এবং বর্ষার দিনে মেঘলা আকাশ ও অশ্রান্ত ধারাবর্ষণ লইয়া অনেকক্ষণ গল্পগুজব চলিতে পারে। শরতের নির্মেঘ আকাশে—না শীত, না গ্রীষ্ম, না বর্ষার দিনে কি যে আলোচনা চলিতে পারে, তপন ও ছায়া ত ভাবিয়াই পায় না।

কবি হইলেও বা দুই এক ছত্র লিখিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইতে পারিত। কবি নহে বলিয়া সাহিত্যের নামগন্ধও তাহারা করিল না। তবে কি লইয়া কথা বলিবে?

সেদিন বোটানিকাল গার্ডেনের কথাটা তুলি তুলি করিয়াও কেহ তুলিল না। এবং পরস্পরের সাক্ষাৎ-মুহূর্ত্তে সেই দিনের কথা মনে হওয়াতেই বোধ করি এই নিতান্ত সহজ জিনিষটিকে তারা ধরিয়া ছুঁইয়া পাইল না।

বারকয়েক চোখোচোখি হইতেই চারিটি অক্ষিতারাই শিহরিত হইল, চারিটি গণ্ডেই সঙ্কোচের পাণ্ডুরতা ফুটিল এবং দুইজনেরই মাথা বিপরীত দিকে অল্প একটু হেলিয়া পড়িল।

সঙ্কোচ, শিহরণ ও স্তব্ধতায় যে-কথা না বলা হইল, সেই কথাটিই স্পষ্টতর হইয়া সহজ আলাপের সমস্ত উদ্যমকে ব্যর্থ করিয়া দিল।

অবশেষে গ্যাসের আলো জ্বলিতেই তপন চমকিত হইয়া কহিল, "চল ওঠা যাক।"

ছায়া লজ্জিতার মত হাসিয়া বলিল, "হাঁ, এতক্ষণ ধরে খুব গল্প করলুম —যা হোক!"

তপন বলিল, "দীঘির ধারে বসে গল্প করার চেয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখায়—বেশ একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়।"

ছায়া বলিল, "একা একা হয়ত তাই ভাল লাগে।"

তপন বলিল, "অথচ কি গল্পই বা আমরা করতুম। পুরানো খবর; খেলা, স্কুল, কলেজ, প্রোফেসারদের কথা, বইয়ের নোট, আব্‌হাওয়া—এইত!"

ছায়া অদূরে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "ওরা এত বক্‌বক্‌ করচে কি করে? এত হাসি, গল্প—"

তপন বলিল, "মনের মেজাজ যদি ভাল থাকে ত কারণের জন্য আটকায় না। মানুষ অনেকরকম অস্থিরতা দেখিয়েই আনন্দ লাভ করে।"

ছায়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "তা হলে মানতে হয়, আমাদের মনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।"

তপন কহিল, "তা কেন? আমরা নিঃশব্দে যা উপভোগ করচি—ওরা কলরবে তাই ব্যক্ত করচে। তাতে প্রমাণ হয় না—"

ছায়া বাধা দিয়া বলিল, "আপনার কথা না হয় বাদ দিলুম। কিন্তু আমার মনের অবস্থা যদি শোচনীয় না-ই হবে ত গল্প করতে ডেকে এনে চুপ করে বসে বসে বিকেলটাকে সন্ধ্যের দিকে ঠেলে দিলুম কেন?"

তপন বলিল, "গল্প করলেও বিকেল থেকে হতো সন্ধ্যা এবং তারপর রাত্রি। বাজে বকার দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেলুম বলে আমরা, হাঁ,—তুমি ঈশ্বর মান?"

ছায়া হাসিয়া বলিল, "বিপদ, বার্দ্ধক্য বা বলহীনতা কোনটাই যে আমায় আক্রমণ করেনি। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?"

তপন বলিল, "আগে বল মান কি না?"

ছায়ার চক্ষুপল্লব কৌতুকে নাচিয়া উঠিল। তরল কণ্ঠে সে উত্তর দিল, "বাঃ রে,—ভারি মজা ত! এ-যেন রোদ বা জলের মত একটা সহজ কিছু! কিংবা আইসক্রীম, তাই টপ করে উত্তর দেব!"

তপন ঈষৎ চঞ্চল স্বরে কহিল, "বল।"

ছায়ার হাসির মাত্রা বাড়িয়া গেল। কৌতুক জমিতেছে মন্দ নহে। খেয়ালী মানুষটির বিচিত্রতর খেয়াল! কহিল, "ঈশ্বর কি—"

তপন স্বরে গাম্ভীর্য্য ঢালিয়া কহিল, "বল না?"

ছায়ার কৌতুক একমুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল। বোটানিকাল গার্ডেনের মত একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটিবে নাকি? না, কৌতুকের মধ্যেও মানুষের জুলুমের অন্ত নাই। তর্কে—আপন প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে অসম্ভব বা যুক্তিবিরুদ্ধ তর্ক করিতেও তাহার বাধে না! প্রতি পদক্ষেপেই প্রভুত্বের সঙ্কেত। মানুষে মানুষে অতি তুচ্ছ কথা বা ঘটনা লইয়া প্রতিনিয়ত বিরোধ বাধে বলিয়াই বুঝি মিলনটাকে কাব্যে-উপন্যাসে মানুষ উজ্জ্বল করিয়া আঁকিতে ভালবাসে। মরুভূমির মাঝে যেমন পান্থপাদপ। দুর্লভ, তাই রমণীয়।

বেশিক্ষণ ছায়া এ-সব ভাবিতে পারিল না। মুখের হাসি নিবাইয়া উত্তর একটা দিতেই হইল, "আগেই বলেচি ত। না-মানার নির্ভীকতা আমার নেই, মানার হেতুও বুঝিনে। হয়ত তিনি আছেন, হয়ত নেই।

কিন্তু এ-সব তত্ত্ব এত শীঘ্র না বুঝলেও যে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হবে—”

তপন হাসিয়া বলিল, “তবে আমার ধন্যবাদ তোমাকেই দিলুম।”

ছায়া সহজভাবেই উত্তর দিল, “আপনার নিকট হতে বহুবারই ধন্যবাদ পেয়েচি এবং আশা করি, যতবার আমাদের সাক্ষাৎ হবে, ততবারই পাব।”

তপন মুখ ফিরাইয়া কহিল, “না-পেতেও পার। কিন্তু সেদিনের ধন্যবাদ—”

ছায়া টপ্‌ করিয়া কহিল, “আন্তরিক নয়? তা আমি জানি।”

তপন কহিল, “জান?—তার মানে?” স্বরে ব্যগ্রতা ফুটিয়া উঠিল।

ছায়া কহিল, “আন্তরিক হলে এই বাগানে বসে দ্বিতীয় ধন্যবাদ আমি পেতুম কিনা সন্দেহ!”

সবেগে মুখ ফিরাইয়া তপন কি বলিতে যাইতেছিল, তেমনই অকস্মাৎ সে-ভাব দমন করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। ছায়ার পরিহাস মার্জ্জিত এবং তীক্ষ্ণ। কিন্তু তপনের ধৈর্য্যও অসাধারণ। সে কোন কথাই কহিল না।

ছায়া তপনের চাঞ্চল্যটুকু লক্ষ্য করিয়া মনে মনে খুশী হইল। কিন্তু সে-ভাব প্রকাশ না করিয়া সহজ স্বরেই বলিল, “আচ্ছা তপনবাবু, এই ধন্যবাদের পালাটা যদি সভ্যতার অঙ্গ থেকে ছেঁটে ফেলা যায় ত মানুষ আচার-ব্যবহারে অনেকটা সহজ হয়ে আসে নাকি?—”

তথাপি তপন কোন উত্তর দিল না।

ছায়া বলিল, “বলুন না,—হয় কি না?”

তপন বলিল, “শুধু ধন্যবাদ নয়, অনেক জিনিষেই কাঁচি চালানো দরকার।”

ছায়া বলিল, “যথা?”

তপন মনে মনে যথেষ্ট বিরক্ত হইলেও সে-ভাব দমন করিয়া শান্ত স্বরেই বলিল, "পাশ্চাত্যের যে-কোন অনুকরণই আমার মতে ভাল নয়।"

ছায়া সকৌতুকে হাততালি দিয়া বলিল, "বাঃ রে! সামনে সূর্য্য উঠলে সে-দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চলাই বুঝি আমাদের সনাতনের ইঙ্গিত? তা হলে বলুন না কেন, পার্কের ইলেকট্রিক বাতিগুলো নিবিয়ে কেরোসিনের আলো জ্বালিয়ে দিতে বলি!"

তপন কথার উপর জোর দিয়া বলিল, "নিবিয়ে দিলেও খুব বেশি ক্ষতি হয় না। বলনাচ, পিক্‌নিক, পরিচয়ের সৌজন্যতা কিছু কমলে বোধহয় ভারতবর্ষ বিশেষ আঁধারগ্রস্ত হবে না!"

ছায়া বলিল, "শিক্ষার কথাটাও বলুন। শুধ্ গাছের ডাল ধরে নাড়া দিলে—মস্ত বড় গাছটা উপড়ে না-ও আসতে পারে!"

তপন বলিল, "যার নেবার শক্তি আছে, কোন শিক্ষা থেকেই সে অসার কিছু সংগ্রহ করে না।"

ছায়া বলিল, "কিন্তু যাদের নেবার শক্তি নেই? শতকরা নব্বুই জনের কথাই বলচি। যে ক'টা বছর আমাদের স্কুল-কলেজে কাটে,—আচার-ব্যবহার বা বইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা কি পাই? সংস্কৃতি, সভ্যতা, সাহিত্য কোন্ দিক দিয়েই না অনুকরণ করতে ভালবাসি ওদের? আপনিই বলুন দেখি, লেখাপড়া না-জানা একটি মেয়ে—পথ চলতে পায়ে পায়ে বাধে, ঘোমটার দু'পাশের কিছু দেখতে পায় না, কথাটি বলে ভয়ে, সঙ্কোচে, লজ্জায় ওজন করে—তার সঙ্গে চিরদিন পরদার আড়ালে বাস করতে মন চায়?"

তপন বলিল, "থাক ও-সব তর্ক। ভারতের ভাবধারার অনুকূলে এমন অনেক যুক্তি আছে যা আমি জানি না। না জেনে শুনে উত্তর দেওয়া ভাল নয়।"

ছায়া বলিল, "বেশত, আমি না হয় অপেক্ষাই করবো। জেনেই এর উত্তর দেবেন।" বলিয়া ছায়াও উঠিল।

তপন কোন কথা না কহিয়া ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে গেট পর্য্যন্ত আসিল।

ছায়া মুখ ফিরাইয়া বিদায়-অভিবাদন জানাইতেই তপন সহসা প্রশ্ন করিল, "আর যদি আমার উত্তর না পাও, ছায়া ?"

ছায়া হাসিল। সমস্ত মুখখানি তার হাসির ছটায় অপরূপতা লাভ করিল। অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণের পর দিনদেব যেমন করিয়া হাসির কিরণে ভুবন ভরাইয়া দেন।

কহিল, "তাহলেও আমার সুনিদ্রার ব্যাঘাত হবে না, জানবেন।"

তপন কহিল, "শুনে আশ্বস্ত হলুম।"

ছায়া ওষ্ঠে অঙ্গুলি রাখিয়া কহিল, "তারপর বুঝি ধন্যবাদ ? কিন্তু না, একটু আগে ওর ওপর নির্ম্মম ভাবেই কাঁচি চালিয়েছেন।"

বলিয়া খিল খিল করিয়া হাসিল।

তপন, কি জানি কেন, বিরক্ত হইতে পারিল না। ছায়ার কৌতুকপ্রিয়তার মধ্যে অসামান্য যে জিনিষটি এই মুহূর্ত্তে তার চোখে পড়িল, সে সারল্য। কৃষ্ণতার আয়ত চক্ষুতে সরল সুন্দর দৃষ্টি (নির্ব্বোধের মত ভাবহীন নহে) সমগ্র মুখখানির শ্রী বিকাশ করিয়াছে। টিকলো নাসিকা হইতে পাতলা ঠোঁট দু'খানি ও চিবুক পর্য্যন্ত—একটা সুবিন্যস্ত সুসমঞ্জস রেখা—যাহা শিল্পীর গঠন-পারিপাট্যেরই শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। পাতলা ঠোঁটের অন্তরালে সাদা মুক্তার সারি দেখিলে—শুধু রমণীয়তা নহে, চরিত্র-মাধুর্য্য ও শিক্ষার গরিমাও উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আর বাড়িতে পান-দোক্তার চর্ব্বণে এই জিনিষটাকে মেয়েরা এমন অপরিষ্কার করিয়া রাখে যে, আলোর মাঝে বার বার চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে না। কেশ হইতে কাপড় পর্য্যন্ত সুরুচি মাখানো। এমন কি ঈষৎ আল্‌গাভাবে

পায়ে স্যাণ্ডেলটি বিন্যস্ত করায়ও কমনীয়তা আছে। অথচ সেইদিন তরুণের গান শুনিয়া এই চোখেই মুগ্ধ দৃষ্টি······দূর হউক।

ছায়া পিছন ফিরিল। এক সময়ে গজেন্দ্রগমন কাব্যলোকে এবং বাস্তব জগতে সমাদর লাভ করিলেও—আজ মনে হয় ভাববিলাস। এমনই ঋজু, দৃপ্ত, ভঙ্গিহীন রেখাটির মত—আপনার স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করিয়া সুবিন্যস্ত পদক্ষেপ কাহারই বা দেখিতে ভাল না লাগে। কাব্য না লিখিয়াও, ওই অত্যন্ত সরল গতিটিতে এমন ছন্দ একটা মিলে যাহা কবিপ্রতিভার মতই দুর্লভ। ভাববিলাস বর্জ্জিত, অথচ রূঢ় নহে।

ভারতের ভাবধারা-বিষয়ক শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিবার উৎসাহ তপনের লোপ পাইল। তর্কের খাতিরে যে তর্ক—তাহার যে একটা মীমাংসা করিতেই হইবে, এমন কিছু বাঁধাধরা নিয়ম নাই। থাকিলেও সে-নিয়ম মানার প্রবৃত্তি তপনের নাই। না, উত্তর সে দিবে না।

* * *

বাড়ি আসিয়া তপন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল। নিজের ঘরখানিতেই আসবাবগুলি এমন করিয়া সাজানো রহিয়াছে—যাহা বিশৃঙ্খলতারই নামান্তর। খাটখানা অবশ্য জানালার ধারে, হাওয়া আলো ওদিক হইতে প্রচুরই আসে। স্বাস্থ্যের পক্ষেও অনুকূল। কিন্তু মশারিটা কি বিশ্রী করিয়া টাঙানো। মাঝখানে যেন দশ মণ ভার, এমনই ঝুলিয়া আছে। খাটের পায়াগুলি চকচকে, কিন্তু লতাফুলের মধ্যে একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে ময়লা যথেষ্ট পাওয়া যায়। ছবি যে-গুলি ঘরে টাঙানো আছে—কোনটার সঙ্গে কোনটার সামঞ্জস্য নাই। আটখানি ছবির মধ্যে কোনখানিরই ফ্রেমের বা সাইজের মিল নাই। যে-গুলি খিলানের মাথায় টাঙাইলে মানায় সে-গুলি আছে নীচেয়, এবং খিলানের মাথায় যে-গুলি টাঙানো, সে-গুলি পাখা বা মশারির আড়ালে এমন ভাবে

আধঢাকা পড়িয়াছে যে, বিষয়-বস্তু বুঝিবার জন্য কাহাকেও মাথা ঘামাইতে হয় না। অর্থাৎ কাহারও কৌতূহল জাগে না। আলনায় এলোমেলো কাপড় গুছানো। জামায়, গেঞ্জিতে, কাপড়ে, আণ্ডার-অয়্যারে এমন তালগোল পাকাইয়া আছে যে, দেখিলেই মনে হয় ধোপাবাড়ি দিবার জন্যই ও-গুলি ছাড়িয়া রাখা হইয়াছে, সে না আসাতেই এই জঞ্জালের সৃষ্টি।

বইয়ের সেল্‌ফ? ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ঠাসাঠাসি। নোটের খাতাগুলিও তাই। যে খুঁজিয়া ঠিক বইখানি বাহির করে—শীতের দিনেও তার কপালে ঘামের বিন্দু না ফুটিয়াই পারে না। অর্গ্যানটারই বা কি শ্রী? আছে, না আছে! বাজে—এই পর্য্যন্ত। একটা সুদৃশ্য পরদা ওই কোণে ফেলিয়া দিলেও অন্তত ঘরের চেহারা ফিরিত।

খাটের তলায় ছেঁড়া চটির রাশি। কখন কোনটা সে পায়ে দেয়—ঠিকঠিকানা নাই। তোয়ালেটা বিছানারই এক পাশে এবং টিপয়টার উপর টাটকা ফুলে-ভরা ফুলদানির পাশে কতগুলি খালি চায়ের প্লেট কাপ জড়ো করা।

মুক্তাপাঁতির মত একসারি দাঁত দেখিয়া সমগ্র মানুষটির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সেদিন ছায়া এ ঘরে আসিয়া কি লইয়া গিয়াছে?

না, ছায়ার দোষ নাই। তরুণ যদি তাহাকে মুগ্ধ করিয়াই থাকে, সে গুণ তরুণের। বইয়ের রাশির মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া বাহিরের যে এতবড় জগৎটা প্রতিদিনকার সূর্য্যালোকে বিকশিত হইয়া উঠে—সকালে, দুপুরে, বৈকালে বিভিন্ন রাগিণীতে তার স্বর-আলাপ চলে, সে কথা ত তপন একদম ভুলিয়াই গিয়াছিল। আকাশে মেঘ-সমাবেশে বিধাতার কৃতিত্ব বড় কম নহে। রাত্রির কৃষ্ণ-মণ্ডলে অগোছালো তারা একটিও দেখিতে পাইবে না। সবক'টি বিন্দুই উজ্জ্বল এবং

নীল আস্তরণের উপর পরিপাটীরূপে সাজানো; এমন কি, ছায়াপথের আলো-ফুল-ঘেরা ঈষদ্দীর্ঘ মালাটি। মালা ছিঁড়িয়া গেলেও—সুচিক্কণ মেঝের উপর যেমন বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, উপরের যবনিকাতেও সেই অপরূপতা। এতদিন এ-সব দৃশ্য চোখে পড়ে নাই। উন্মুক্ত নয়নের অন্তরালে চির-আবদ্ধ দৃষ্টি অকস্মাৎ দৃপ্ত পদক্ষেপের শরাঘাতে সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। তাই ঘরের মধ্যে চিরদিনের সঞ্চয়কে মনে হইতেছে, স্তূপীকৃত জঞ্জাল।

তপন এ-ঘর ও-ঘর বারাণ্ডা সর্ব্বত্রই ঘুরিল। সর্ব্বত্রই অপরিচ্ছন্নতা. রুচিবিকার ও আলস্য পরিস্ফুট।

বড় বৌদি রহস্য করিলেন, "কি ঠাকুরপো, ঘুরে ঘুরে কি খুঁজচো? মানিক বুঝি?"

তপন তাঁহার পানে চাহিয়া হাসিল। সে হাসি করুণার্দ্র। বড়-বৌদির রং ফরসা, বেশ মোটাসোটা মানুষ। কাপড়ের আঁচলখানি বার বার মাথা হইতে খসিয়া পড়িতেছে, খোঁপাটাও এলানো। গায়ে অতিরিক্ত গহনা, মুখের পান-দোক্তার মতই। মুখখানি যেন তন্দ্রাতুর—একটু ঘুমাইয়া লইলেই ভাল হয়। কিন্তু বৌদি ঘুমান সেই দুপুর-রাত্রিতে। সারাদিন ও রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত ছেলে ও সংসার লইয়া তাঁহার ব্যস্ততার অন্ত নাই। এই অতিপরিশ্রমের ফলে বিশৃঙ্খল সংসারে এতটুকুও সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে না, লাভে হইতে তিনি তন্দ্রাতুর আলস্যে শিথিল পা দু'খানি টানিয়া লইয়া ফিরেন।

বড় বৌদি কহিলেন, "হাসলে যে বড়?"

তপন বলিল, "মানিক এ বাড়িতে কোথায় পাব, বড় বৌদি তোমাদের জ্বালায়—তা কি দেখবার জো আছে?"

বড় বৌদি সজোরে হাসিয়া উঠিলেন ও হাসিতে হাসিতে মেঝের

উপর বসিয়া কহিলেন, "তা বটে! আর দু'টো বছর যাক, তখন দেখবে বৈ কি!"

তপন হাত জোড় করিয়া কহিল, "রক্ষে কর বৌদি, এই জঞ্জালের মধ্যে সে-জিনিষ না দেখাই ভাল।"

বড় বৌদি কহিলেন, "জঞ্জাল কি গো?" একমুহূর্ত্ত থামিয়া হাসিয়া কহিলেন, "জঞ্জাল কেন গো, অরণ্য বললেও পার। আহা! তোমার দুঃখু দেখে আমার চোখে জল আসচে, ঠাকুরপো।" বলিয়া হাসির মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন।

তপন কহিল, "কিন্তু তোমার দুঃখু দেখে সত্যিই আমার চোখে জল আসবার উপক্রম হয়েচে! থাম গো, থাম।"

বড় বৌদি থামিলেন, কিন্তু রহস্য করিতে ছাড়িলেন না। বলিলেন, "আমাদের কথায় এখন জল ত আসবেই, ঠাকুরপো! তা মা যে কিছুতেই শুনচেন না, সামনে অঘ্রাণ মাস—বলত—"

তপন বলিল, "তা মন্দ কি। তোমরাও বাঁচ, আমিও নিশ্চিন্ত। একবার এই সংসার-কলে সেই জীবটিকে ফেলতে পারলে—ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে হবে না। সহজ সরল জীবন। খাও দাও—গল্প কর, ব্যস্।"

বড় বৌদি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, "উঃ, সে জীবটির ওপর তোমার দরদ দেখে যে আর বাঁচি না গো!"

তপন হাসিয়া কহিল, "দরদ হবে না! সে যে মানিক মুক্তো—এই একটু আগে তুমি যা বললে।"

বড় বৌদি ত্বরিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও গমনোদ্যত হইয়া কহিলেন, "দাঁড়াও, কথাটা মাকে বলে যাতে সে-মানিক শীগ্‌গির আনবার ব্যবস্থা হয়—তাই করচি। বলিগে ঠাকুরপোর আর তর সইচে না!"

তপন তাঁহার আঁচল টানিয়া ধরিয়া কহিল, "দোহাই তোমার

বড় বৌদি—ঘাট মানচি। মানিক-মুক্তোয় আমার এতটুকু লোভ নেই। তুমি বরঞ্চ এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাইয়ে আমার প্রাণ বাঁচাও।"

চারু জলই আনিয়া দিল।

তপন বলিল, "আঃ! তোমাদের ভাষায় ধন্যবাদের বদলে কি বলতে হয়, বৌদি?"

চারু অবাক্ হইয়া কহিল, "সে আবার কি?"

নেপথ্য হইতে হাস্যচপল কণ্ঠের উত্তর আসিল, "আমরা ধন্যবাদই বলি, যদিও জানি, ওটা ও-দেশের প্রথা।

তপন সুলতার পানে চাহিয়া কহিল, "আমি বড় বৌদির কাছে হিন্দু-শাস্ত্র শিখবার ইচ্ছা করেচি, তুমি হচ্চ তার হন্তারক।"

সুলতা কহিল, "বড়দি কি আজকাল মাস্টার মশাই হয়ে উঠলে? দাঁড়াও গুরু-মা, আমিও তোমার কাছে পাঠ নেবো।" বলিয়া তাড়াতাড়ি খাটের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া ছোট মেয়েদের মত ঘাড় দোলাইয়া পাঠ আবৃত্তি করিতে লাগিল।

চারু হাসিতে হাসিতে কহিল, "মরণ!—এতও জান!"

তপন হাসিতে হাসিতে মুগ্ধচোখে সুলতার রহস্য-উজ্জ্বল মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "স্কুলের দিনে ফিরে যেতে ভারি ইচ্ছে করে, না মেজ বৌদি?"

সুলতার মুখে নিমেষের তরে ম্লান ছায়া ভাসিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল। বুকের মাঝে একটি অতি ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাসও হয়ত। চোখ নাচাইয়া সে কহিল, "লোভ হয়ই তো। তোমরা পড়বে বুড়ো বয়স অবধি, আর আমাদের বেলায় গৃহ-বন্ধন। আবার তোমরাই বলতে কসুর কর না—কুড়ি পেরুলেই বুড়ি। বলি, বুড়ি হবার ব্যবস্থাটা কারা করেচে শুনি?"

চারু কহিল, "তা হোক, বুড়ি হওয়াই ভাল। ছেলে-মেয়ে ঘর-গেরস্থালী নিয়েই না মেয়েমানুষের তৃপ্তি।"

স্নলতা বলিল, "এই তৃপ্তির লোভে মনে হয়, এক লাফে পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশে গিয়ে উঠি। তারুণ্য থেকে একেবারে প্রৌঢ়ত্ব, না বড়দি?"

চারু কহিল, "হয়ই ত। ছোট বয়সের ঝঞ্ঝাট কি কম। এখানে—", বলিয়া তপনের উপস্থিতি ধারণায় আসিতেই কথাটা সামলাইয়া লইল। কথাটার ইঙ্গিত স্নলতা স্পষ্টই বুঝিল। তপন দেওয়ালে-টাঙানো স্যাণ্ডো-মূর্ত্তির পানে চাহিয়াছিল বলিয়াই কথাটায় কান দেয় নাই। কথা শুনিলেও ও-সবের অর্থবোধ তার পক্ষে দুরূহই হইত সন্দেহ নাই।

নারী যৌবনকে পিছনে ফেলিয়া দ্রুতবেগে প্রৌঢ়ত্বের পানে চলিতে চাহে—কি অসহ্য লাঞ্ছনায় সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া, সে বেদনা বুঝিবার মত মন এক নারী ছাড়া কাহারই বা আছে? যে-নারী যৌবনে এই কামনা করে, তাহার দুঃখের সীমা খুঁজিয়া প্রতিকার করিতে যাওয়ার মত ব্যর্থতা আর কি আছে!

আশ্চর্য্য এই সংসার! সুখের অন্তরালে দুঃখের তীর শানাইয়া—প্রতিনিয়ত সে নরনারীর হৃদয় সন্ধান করিতেছে। তীর আসিয়া বুকে বিঁধে, মানুষ মরে না। বৃহৎ আশাই তাহাকে বাঁচাইয়া রাখে।

স্নলতা হাসাইতে আসিয়া বার বার কান্নার ঢেউ তুলিতেছে দেখিয়া অপ্রতিভ হইল। তপনের পানে চাহিয়া বলিল, "কি বলছিলে, ঠাকুর-পো—এই ঘরদোর সম্বন্ধে?"

চারু উত্তর দিল, "এই সংসার নাকি ভারি অগোছালো! এর মধ্যে মানিক খুঁজে বেড়ানো মিছে।"

সুলতা কহিল, "সত্যি ? কিন্তু ভাই, আজ দুঃখু করলে হবে কেন ? তোমরাই ত বেছে বেছে এই আগোছালো মানুষগুলিকে নিয়ে এসেচ।"

তপন কহিল, "ধ্যেৎ ! কি কথার কি উত্তর !"

সুলতা হাসিয়া বলিল, "ভাল উত্তর একটা মনে এসেচে। দাঁড়াও আসচি।" বলিয়া সে দ্রুতপদে কক্ষান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এমন সময়ে কক্ষান্তরে চারুর পুত্রকন্যার কলহ-কোলাহল উঠিতেই চারুও আর সেখানে দাঁড়াইল না! চারু যাইতেই গোলমাল বাড়িয়া উঠিল। অভিযোগকারীরা ক্রন্দন ও তীব্র মন্তব্যের দ্বারা চারুকে হয়ত বা আচ্ছন্নই করিয়া দিল।

তপন মনে মনে হাসিল। সংসারের শৃঙ্খলা-বিধান! ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিই মায়ের শাসন মানে না! কেন মানে না ? চারু ঢিলা প্রকৃতির বলিয়া ছোটরাও এক আঁচড়ে চিনিয়া লইয়াছে। এই লোক চেনার কথায় একটা গল্প মনে পড়িল :—

শহরের এক উকিল। পশার তাঁর খুবই আছে। বড় ছেলেটিকে উত্তরাধিকারী করিবার মানসে যতদূর পারিলেন—শিক্ষা দিলেন। শিক্ষা-শেষে ছেলে আদালতে বাহির হইতেই বাপ বৃদ্ধাবস্থার অজুহাতে অবসর লইলেন। কিন্তু দু'টি মাস কাটিয়া গেলেও ছেলের উপার্জ্জনের একটি পয়সাও সংসারের সচ্ছলতা বাড়াইল না। বাপ একদিন ছেলেকে ডাকাইলেন। সে আসিলে বলিলেন, "হাঁরে, তোর রকমখানা কি ? ঘর থেকে আমি বরঞ্চ তোর জলখাবার গাড়িভাড়ার টাকা দিই, অথচ আজও পর্য্যন্ত একটা পয়সা ত তোর কাছ থেকে পেলুম না! বলি মক্কেল টক্কেল হয় না বুঝি ?"

ছেলে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হয় ত বাবা! এত হয় যে, অন্য উকিলরা আমায় গাল পাড়তে থাকে।"

বাপ সবিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, "তবে? টাকাগুলো যায় কোথায়?"

ছেলে বলিল, "মক্কেলই হয় বাবা, পয়সা ত জোটে না।"

বাপ বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া শুধুই চাহিয়া রহিলেন।

ছেলে বলিয়া চলিল, "তারা আসে, মোটা ফীও কবলায়, কিন্তু কাজ মিটলে একটা পয়সাও দেয় না।"

বাপ ছেলের মুখের পানে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ক্ষণকাল চাহিয়া কহিলেন, "হুঁ, বুঝেচি, তারা কেন যে পয়সা দেয় না—"

ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বুঝলেন বাবা?"

বাপ বলিলেন, "তুই যে একটা আস্ত বেকুফ, তা তোর মুখে চোখেই লেখা। ধূর্ত্ত মক্কেল দেখলেই বুঝতে পারে। থাক বাপু, কাল থেকে শামলাটা আর চাপিয়ো না। এ লাইন তোমার নয়।"

বড় বৌয়ের তন্দ্রা-শিথিল চক্ষু দেখিয়া করুণাই জাগে, ভয় পাইবার কথা নহে। তাই ছেলেমেয়েরা অকুণ্ঠ হইয়াই কোলাহল করে।

সংসারে আদেশপালনতৎপর অবনতশির নরমপ্রকৃতির ব্যক্তিকে মানিবার মত দুষ্প্রবৃত্তি অল্প লোকেরই থাকে!

তপন নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল।

আসিয়া দেখে, গোল টেবিলের উপর পেপারওয়েট চাপা এক খানা কাগজ। সুন্দর অক্ষরে কয়টি লাইনে—তলায় ইংরেজী কবিতার অংশ।

I have forgot much,*,gone with the wind,
flung roses, roses, riotously with the throng,
Dancing, to pat thy pale, lost lilies out of mind,

* * *

I have been faithful to thee,*, in my fashion.

নীচেয় * চিহ্নের নোট—যে কোন প্রিয় নাম বসাইতে পার—নিজের ইচ্ছামত।

তপন হাসিল। মেজ বৌদিও আজকাল quotation ধরিয়াছেন! কিন্তু এ-কথাও অস্বীকার করিয়া লাভ নাই, তরুণ মনে এই যে আকস্মিক সৌন্দর্য্য-পিপাসা জাগিয়াছে, ইহার উৎসমূলে এক তরুণী।

কাব্যে, সাহিত্যে যে বিষয়ের এত বাগ্‌বাহুল্য, এত উচ্ছ্বাস—অবশেষে তাহার জীবনে কি সেই চিন্তামগ্নতার অলক্ষিত পদক্ষেপ!

সেইদিনের পরিচয় হইতে আজ সন্ধ্যার বিদায়ক্ষণটি পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি ঘটনার অভিনিবেশে কোন্ জিনিষটি ফুটিয়া উঠে? দুর্ব্বলতা। মুক্তির মহিমা প্রচারই বল, তরুণের উপর অকারণ ঈর্ষাই বল এবং ধন্যবাদের মধ্যেও—প্রতিনিয়ত সে দুর্ব্বল মনকেই প্রকাশ করিয়াছে। তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ছায়া সে কথা সেই মুহূর্ত্তেই বুঝিয়াছে। হয়ত বা তপনের তরুণ চিত্তের চাপল্য। না, হাতের কাছে শেলী নাই, রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ আছে। দেখা যাক, আমাদের মরমী কবি এ বিষয়ে কি বলেন!

* * *

মাস কয়েক ধরিয়া পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে কাব্য-কুসুম চয়নও চলিল। এ-যেন এক অগাধ অনন্ত-বিস্তৃত সৌন্দর্য্য-পারাবার। রহস্য-মণ্ডিত সৌন্দর্য্যের মতই অর্দ্ধ-প্রকাশিত, সূক্ষ্ম কুহেলী-অবগুণ্ঠনে আবৃত! সামাজিক আচার-ব্যবহারের বিভিন্নতা সত্ত্বেও দেশকালপাত্র ভেদে এক দেশের কবির সঙ্গে অন্য দেশের কবির কি চমৎকার অন্তরের যোগ। ইনি বীণায় ঝঙ্কার তুলিয়াছেন, উনি ক্লারিওনেটে; সুরসঙ্গতি ঘটিয়াছে সেই এক চমৎকারিত্বের মধ্যে। সেই চক্ষু, নাসিকা, আচার, ব্যবহার,

কথা ও ভঙ্গির মধ্যে পরম সুন্দরের বন্দনা গান। যে সুন্দর, অতিবৃদ্ধ ধরণীকে বার বার তরুণ সূর্য্যালোকে স্নান করাইয়া নব নব রূপ-পরিকল্পনায় কল্পলোকের কামনীয় করিয়াছেন; বার বার ফিরিয়া-আসা ঋতুবৈচিত্র্যে পুরাতন ফুলকেই নূতন করিয়া ফুটাইয়া তুলেন; আকাশকে নিত্য করেন সুনীল, ধূসর ছায়াপথের রহস্যময়তাকে সুনিবিড় এবং চাঁদ উঠিলে বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তরকেও মূঢ় উদ্বেগে প্রকাশ-ব্যাকুলতার অজস্রতায় ভরাইয়া দিয়া উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে ফেনিল,—তাঁরই আগমন-উপলক্ষ্যে অতিবৃদ্ধেরা যে গান শেষ করিয়া গিয়াছেন, অতিতরুণেরা তাহারই ছন্দে সুরসংযোগ করিতেছেন। শুধু প্রকাশভঙ্গিমার অভিনবত্বেই পুরাতনকে পুরাতন হইতে দেয় না।

মন একটি বৃত্তিকে মুখ্য করিয়া অচিরেই অপরটিকে গৌণ করিয়া তুলে। সুতরাং থার্ড ইয়ারের ফল সন্তোষজনক হইল না। বাড়িতে এ-বিষয়ে বিশেষ কলরোল না উঠিলেও বন্ধুমহলে গুঞ্জনটা কিছু দিন ধরিয়া চলিল।

মুহ্যমান তপন মোহ কাটাইবার জন্য একবার চেষ্টা করিল। ছায়া যেন দুর্জ্ঞেয় প্রহেলিকা। প্রতিটি কথা তার কৌতুকরসের মধ্য দিয়া অন্তরকে স্পর্শ করে, আঘাত করে এবং সেই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও যে না জাগাইয়া তুলে তাহা নহে। তর্কে হারিয়াও যেমন তর্কপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়া—প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করিবার উৎসাহে মাতে।

ছায়ার যে-টুকুতে সৌন্দর্য্য, সেইটুকু লইয়াই বহুক্ষণ ধরিয়া আলোচনা চলে। সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধতা বা প্রখরতা তপন অনেক দেখিয়াছে, কিন্তু বিন্যাসে যে সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট তাহা তুলনাহীন। তাহাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে মজলিস বসে। কখনও গাহিবার জন্য, কখনও বা এমনই।

তপন সে মজলিসে যোগদান করে। নূতন ব্যারিষ্টার-পত্নী বিংশবর্ষীয়া মিসেস সেনের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সে বহুবার দেখিয়াছে। রং এমনই উজ্জ্বল যে, গাউন পরিয়া দাঁড়াইলে সহসা মেম বলিয়া ভ্রম না হউক, পার্শীরমণীর গোলাপ-গৌরবকে স্মরণ করাইয়া দেয়। দু'টি আয়ত চোখের তুলনা নাই। গঠন এবং প্রসাধন-পরিপাট্যের জন্য তিনি নাকি গতবার ফ্যান্সি ড্রেসের একখানি সোনার মেডেলও পাইয়াছেন। তিনি যেদিন মজলিসে আসিয়া বসেন—সেদিন অন্য সকলে নিষ্প্রভ হইয়া যান। তবু ছায়ার সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে না। তাঁর উগ্র সৌন্দর্য্যের মধ্যে অপরিস্ফুট কিছু নাই; মালিন্য, ত্রুটি কিংবা ব্যবহারের অসামঞ্জস্যতা কোথাও কেহ পাইবে না; হয়ত-বা এই জন্যই সেই অপরূপ কিরণের তীক্ষ্ণতায় মুগ্ধ মন তৃপ্তিলাভ করে না। সাধারণ মানুষ, বিশেষ করিয়া তরুণ অন্তর চাহে—সৌন্দর্য্যের সঙ্গে রহস্যকে। আচরণে তুচ্ছ একটু ত্রুটি যাহা অনেক নীরব মুহূর্ত্তকে হাসিকৌতুকে বহুক্ষণ ধরিয়া সমুজ্জ্বল করিয়া তুলে এবং অবসর সময়ে যে চিন্তায় অসীম তৃপ্তি। পরস্পরের কথাবার্ত্তা বা আচার-ব্যবহারের সামান্য স্খলন কৌতুকপ্রিয়তার মধ্য দিয়া দুইটি হৃদয়কে কাছেই টানে। একের গৌরববোধের উচ্চমঞ্চে যেইমাত্র অন্যে মুহূর্ত্তের তরে অবনতশির হয়, অমনই ভুলের মধ্যে করুণার ছায়া এবং তার পশ্চাতে সুনিবিড় বেদনাবোধ। এই বোধের মধ্যে যে বৃত্তি প্রতিদিন পরিপুষ্ট হইতে থাকে, হয়ত তাহাই ভালবাসা! হয়ত তাহাই পুরাতন পৃথিবীকে নূতন সৌন্দর্য্য দান করে, নারীকে করিয়া তুলে প্রিয়া।

তারপর, মিসেস সেন না আসিলে যে মেয়েটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে রাইপুরের জমিদার-বাড়ির বড় মেয়ে রেণু। বয়স আঠারো। বিবাহিতা। শ্বশুরবাড়ির কথায় রেণুর গৌরমুখে লজ্জার অরুণরাগ

ফুটিয়া উঠে, কৃষ্ণপক্ষ্মাবৃত নয়ন দু'টি ধরণীর আলো দেখিবার জন্য বারেকের তরেও ব্যগ্র হয় না। সমগ্র ভঙ্গির মধ্যে সলজ্জ প্রকাশ। অবশ্য এই সলজ্জ কুণ্ঠিত প্রকাশ নারীকে যে গৌরব-শ্রী দান করে—তাহার তুলনা অন্য দেশে দুর্লভ।

তীব্রতায় নয়ন যেমন আকস্মিক জ্যোতিপ্রবাহে ক্ষণেকের তরে নিশ্চল হইয়া যায়, মেদুরতার স্নিগ্ধমণ্ডলে তেমনই সে অসীম পরিতৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু চঞ্চল জগতে চোখ কান বুজিয়া বাঁধা-ধরার মধ্যে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করা মানে—চক্ষুকে সৌন্দর্য্যের সুখদুঃখ হইতে চির নির্ব্বাসিত করা।

তরুণ মনের কামনা প্রদোষান্ধকার ভেদ করিয়া সুদূর ভবিষ্যতের আলোক-প্রকাশ লক্ষ্য করিবার অবসর কখনই বা পায়? তার পরম রমণীয় বর্ত্তমান চঞ্চল কয়টি মুহূর্ত্তের পাখায় ভর করিয়া প্রতিনিয়ত পৃথিবীর মেঘলোকে ব্যাকুল ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাই মোহ বা তৃপ্তি অধিকক্ষণ সে-চিত্তকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না।

ছায়ার যত বয়সই হউক, সৌন্দর্য্য নাই থাকুক; কথার মধ্যে কোমলতার সঙ্গে যে পটু-পরিহাস ও সুমার্জ্জিত-তীক্ষ্ণতা তাহাও হয়ত তপনকে তত আকৃষ্ট করে না, কিন্তু অকুণ্ঠিত তার প্রকাশ—বাক্যে ও ব্যবহারে, অথচ সুনিবিড় রহস্যজাল বুনিয়া নিজেকে দুর্ভেদ্য করিয়া তুলে—তাহারই চিন্তায় তপন তন্ময় হইয়া যায়। তপন জানে না, তরুণ বয়সে এমনটাই হয়। বিশেষ করিয়া তরুণীর অপর পার্শ্বে যদি কোন গুণমুগ্ধের শুভ আবির্ভাব ঘটে ত—সাধারণ কথা ও ভঙ্গিতেও সে দুর্জ্ঞেয় হইয়া উঠে।

হয়ত ছায়া খেলা ভালবাসে, তাই তরুণকে তার প্রয়োজন। তাই বোটানিকাল গার্ডেনে অমন একটা পার্টির আয়োজন হইয়াছিল!

কিন্তু বিশেষ করিয়া তপন ওই কথাটা ভাবে কেন? কেন অদম্য জয়-তৃষ্ণা তাহার অন্তরকে আকুল করিয়া তুলে? ছায়াকে চাই। তরুণের গ্রাস হইতে সে তাহাকে উদ্ধার করিবে। মস্তবড় একটা শিভ্যল্‌রি; যদিও বীরত্বের সে-যুগের শেষ হইয়াছে। অমন একটা গৌরবময় কার্য্যকে আজকালকার মেয়েরা গোঁয়ার্ত্তুমি বা দস্যুতা মনে করে।

তাই কি? না, কখনই নহে। হয়ত তরবারি দ্বারা বলপ্রকাশের দিন গিয়াছে, কিন্তু বীরত্ব মরে নাই। প্রতিযোগিতা না থাকিলে জগৎটাই যে লুপ্ত হইয়া যাইত! পরীক্ষার ক্ষেত্র এই যে কলেজ-জীবন ইহার মধ্যেও ত অপরিসীম বীরত্ব নিহিত। ব্যায়ামে বছর বছর পুরস্কার বিতরণ করা হয় কেন? ফুটবল খেলায়, ক্রিকেট ম্যাচে—কেন কাপ, শীল্ডের ব্যবস্থা? ডিগ্রি, পদক, খেতাব, খ্যাতি কিসের পুষ্পাঞ্জলি?

তপন হাসিল। সুতরাং ছায়াকে চাই।

কিন্তু দু'টি বৃত্তি একই সঙ্গে মুখ্য করিয়া রাখিলে কোনটিরই ফললাভ হইবে না। যা রেজাল্ট হইয়াছে থার্ড ইয়ারের। ছায়া ও তরুণের চিন্তায় আর বারটা মাস কাটিলেই Finalএ তপন ধরাশায়ী হইবেই।

সুতরাং কাব্য আলোচনাও এই সঙ্গে বন্ধ থাকুক।

সম্মুখে গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ অবসর। গরম হাওয়া খাইয়া কিছু দিনগুলা মোলায়েম ভাবে কাটিবে না! কাব্য ড্রয়ারে বন্ধ করিলে চলে কৈ?

অর্গ্যানের রীডে অঙ্গুলি প্রহার করিতে করিতে তপন এই সব কথাই ভাবিতেছিল।

অকস্মাৎ তাহার মুখ প্রফুল্ল হাসিতে কোমল হইয়া উঠিল। ঠিক, ঠিক। শহরের দূষিত বায়ুতে সন্তরণ করিয়া মনের মাঝে ক্লান্তি ও অবসন্নতা জমা হইয়া উঠিয়াছে! ওই ধূমল আকাশ—বর্ণহীন, ভাবহীন, ভাষাহারা। ইটকাঠে ঘেরা অরণ্যের কোনদিকেই শ্যামলতা চোখে

পড়ে না। হেদুয়ার বাগানে দল বাঁধিয়া পাক খাওয়া বা গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখিতে গিয়া নরসমুদ্রের ঢেউ গোণায় উন্মাদনা নাই। অত বড় প্রকাণ্ড গড়ের মাঠ—গ্যালারি গড়িয়া, গ্রাউণ্ড তৈয়ারী করিয়া, তাঁবু ফেলিয়া প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোককে আহ্বান করে। ভিড়ের চাপে ঘাসগুলা পর্য্যন্ত সবুজ শ্রী হারায়; ফেরিওয়ালার চীৎকারে ও ক্রীড়া-কোলাহলে চিত্তকে অস্থির করিয়া তুলে। সর্ব্বোপরি মোটর ও বাইকের উৎপাতে রাস্তাঘাট যেন কণ্টকাকীর্ণ হইয়াই আছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে মানুষ ভূষণ পরাইয়াছে, কিন্তু ভূষণভারগ্রস্তা প্রকৃতি অপঘাতে মরিয়াছেন। জীবন, চাঞ্চল্য বা উন্মাদনা সবই তাঁহার আছে; নাই শান্ত সবুজ শ্রী, অনাহত গতি ও অনাড়ম্বর কথাগুলি।

সুবোধদের দেশে বেড়াইয়া আসিলে মন্দ হয় না। পূজার সময় যাওয়া হয় নাই। কাব্যালোচনায় সে-কথা ভুলিয়াই গিয়াছিল। এখন একবার শহরের বন্ধকারা হইতে বাহির হইয়া উদার অবারিত আকাশতলে দাঁড়াইয়া সত্যকার প্রকৃতিকে দেখিবার ইচ্ছা করে। কাব্যের পাতায় পাতায় এই পল্লীরই কল্পনাবিলাস। শহরকে লইয়া মানুষ কেন যে কাব্য রচনা করে না? আচ্ছা, এ-তথ্য পরে জানিলেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না। উপস্থিত সুবোধদের দেশে যাওয়াই স্থির।

* * *

নূতন যাত্রায় নূতন করিয়া যেন জীবনের আরম্ভ।

দুপুরবেলায় ট্রেন ছাড়িল অসহ্য গুমোটের মধ্যে। পশ্চিম দিকের জানালা ঘেঁষিয়া তপন বসিয়াছে। মধ্যাহ্নের রৌদ্র ও-দিকটায় প্রখর বলিয়া জন-সমাগম কম। যদি বা কেহ বসিয়াছে কাঠের কপাটটি দিয়াছে তুলিয়া, রৌদ্র প্রবেশ-পথ পায় নাই। গুমোট সে-দিকটায় দুঃসহ

হইয়া উঠিয়াছে, ওই লোকগুলার দ্রুত তালবৃন্ত সঞ্চালনের বেগ দেখিয়া সে-টুকু অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে।

সুবোধ হাসিয়া বলিয়াছিল, "আর একটু সরে এসে বোস, রোদ্দুরে মাথা ধরাবি শেষে।"

তপন বলিয়াছিল, "ধরুক। হাওয়া আমার চাই, বাইরের দৃশ্যটা দেখা হবে।"

সত্যই শহরবাসীর পক্ষে এ এক নূতন দৃশ্য। মেঘশূন্য আকাশে মধ্যাহ্নের জ্বলন্ত রবি—প্রখর অগ্নিজ্বালায় সমগ্র ধরণীকে মুহ্যমান করিয়া প্রমত্ত উল্লাসে শূন্যপথ বিদীর্ণ করিয়া রথ চালাইয়াছেন। নিঃশব্দ দ্রুত-গতি,—গর্জ্জনহীন দাহন। তাপদগ্ধা ধরিত্রীর বুকে ধূ-ধূ বিস্তীর্ণ মাঠে মাঠে আগুনের ধোঁয়া। মাঠ ফাটিয়া চৌচির, রুক্ষ প্রান্তরে এলানো লতাগুল্ম। কি দাহ, কি উল্লাস।

ট্রেন ওই অতিদ্রুত নিঃশব্দ গতির তালে তালে শব্দ করিয়া ছুটিতেছে। রৌদ্রের ভয়ে এমন দৃশ্য না দেখিলে যে আক্ষেপের সীমা থাকিত না।

মাঠের বুকে এখানে ওখানে জলা। রৌদ্রতাপে সেখান হইতে বাষ্প উঠিতেছে, পাড়ে বসিয়া সাদা বক চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতেছে। District Boardএর পাকা সড়কের দুই ধারে কৃষ্ণচূড়া, অশ্বত্থ ও আমের গাছ। ক্লান্ত পাখীর দল তারই ছায়ায় বসিয়া কলরব করিতেছে। কোথাও কোন দূরদূরান্তরের যাত্রী ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষতলে পুঁটুলি ঠেস দিয়া বসিয়া থেলো হুঁকায় তামাক টানিতেছে ও শ্রান্তি দূর করিতেছে। ট্রেনের শব্দে হুঁকা হইতে মুখ সরাইয়া অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু বিস্ময়বিস্ফারিত করিয়া এদিকে হয় ত চাহিয়াই রহিল। পুলের নীচে হাঁটুভোর জল এখনও জমিয়া আছে। কয়েকটি মহিষ সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া সেই জলটুকুতে দেহ ডুবাইয়া পড়িয়া আছে; রাখালের পাচনবাড়ির ইঙ্গিতেও

উঠিবার লক্ষণ দেখাইতেছে না। ও-মাঠ হইতে একটা গাভী উর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া ছুটিতে ছুটিতে বড় সড়কের উপর আসিল এবং গর্জ্জমান চলন্ত ট্রেনের শব্দে কান খাড়া করিয়া খানিক দাঁড়াইল; তারপর—ট্রেনের সঙ্গেই পাল্লা দিয়া ছুটিতে লাগিল। এক একবার ক্লান্ত ঘুঘুর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছে, ট্রেনের ঘস্ ঘস্ শব্দ না থাকিলে অলস মধ্যাহ্নে সেই একটানা করুণ স্বর ভারি মিঠা লাগিত।

মধ্যাহ্নরৌদ্রঝলসিত দিগন্ত-প্রসারিত মাঠের সুনিবিড় স্তব্ধতার মধ্যে এই কচ্চিৎ শব্দপ্রবাহ ও বাস্তব জগতের আকস্মিক প্রকাশ—কোকিল কূজিত যে কোন শুক্লা বাসন্তীনিশার বেলা-চম্পক-গন্ধামোদিত মোহময় মুহূর্ত্তগুলির চেয়ে দৃশ্যগৌরবে গরীয়ান্।

রজনীর তিমিরাবগুণ্ঠনে কুহেলিকাচ্ছন্ন মোহ আসিয়া আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মনকে অতিমাত্রায় চঞ্চল করিয়া তুলে। সেই অনির্ব্বচনীয়তাকে হাস্যে, কলরবে, স্পর্শে নিবিড় করিয়া পাইবার আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার হইয়া উঠে। সে আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই, সীমা নাই; আনন্দের মাঝেও একটা অতৃপ্তি।

আর মধ্যাহ্নের এই নিস্তব্ধ নিঃসীম প্রান্তর—বোবা, বেদনাবিহ্বল পৃথিবীর একটা অংশ, অতিউজ্জ্বল সূর্য্যালোকে স্নাত, অতিপ্রখর কিরণ-অনলে দগ্ধীভূত, চারিদিকে ধূমকুণ্ডলী রচনা করিয়া বিস্ময়ের মত দিক্-সীমায় প্রসারিত হইয়া পড়িয়া আছে। রাত্রির স্বপ্নলেশ কোথাও নাই, বিহ্বল আনন্দের ঝঙ্কার উঠিতেছে না, চঞ্চল মনের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত স্তব্ধ। ওই বোবা ধরিত্রীর মতই করুণার্দ্র দৃষ্টি লইয়া বৃক্ষ, লতা, মানব ও পশুর পানে চাহিয়া আছে। যদিও তাহার চারিদিকে অব্যক্ত বেদনার নিবিড় ছায়া, তথাপি সে অতৃপ্তির মত অস্পষ্ট নহে। সে স্পর্শ কামনা করে না, শব্দ কামনা করে না, রূপ দেখিবার আঁখি পর্য্যন্ত নিমীলিত

করিয়া রাখিয়াছে। এই বেদনা-সুন্দর উজ্জ্বল ভাষাহারা মুহূর্ত্তগুলি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ।

মাঝে মাঝে স্টেশনের জনকোলাহলে এই সুন্দর স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া যায়, চিত্তে বিক্ষোভ জাগে। অফুরন্ত প্রান্তর মধ্যে অনন্ত গতি লইয়া ট্রেন ছুটিতে থাকুক, এই নিস্তব্ধতার একটি পরম রমণীয় রূপ সেই গতির আঘাতে ফুটিয়া উঠুক। জীবনগতিরই প্রচণ্ড একটা প্রতীক।

হয়ত একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। সেটুকু ভাঙ্গিতেই মধ্যাহ্নের মাঠ আর চোখে পড়িল না। সূর্য্য অনেকখানি পশ্চিমে হেলিয়াছেন। মুহ্যমান মাঠের চেহারা জরাতুর। পথে ও মাঠে লোক চলাচল সুরু হইয়াছে। উপরে চিলের চীৎকারও আর শোনা যায় না।

'চাই পুরি মিঠাই', 'গরম চা'—'পানি পাড়ে'।

লোকগুলা স্টেশন পাইয়া যেন বাঁচিয়াছে। কেহ গোগ্রাসে খাবার গিলিতেছে, কেহ চায়ের গরম পেয়ালাটা তাড়াতাড়ি নিঃশেষ করিবার জন্য চোখমুখ কুঞ্চিত করিয়া তুলিতেছে! জলের প্রত্যাশায় জানালা হইতে লোটা বাহির করিয়া কাহারও বা পানিপাড়ের নাম ধরিয়া সে কি বীভৎস চীৎকার। সময় নাই—সময় নাই। এখনই ঘণ্টা বাজাইয়া ট্রেন ছাড়িবে। পানের খিলিটা মুখে পুরিয়া চুণ চাহিবার অবসরটুকু নাই। বিড়ির ধোঁয়ায় ট্রেনের কামরা ত কলিকাতার শীতসন্ধ্যার মূর্ত্তি ধরিল!

ট্রেন ছাড়িল। বাকি পয়সার জন্য ভেণ্ডাররা কেহ ফুটবোর্ডে পা রাখিয়া কেহ বা প্ল্যাটফরমের উপর দিয়া ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে খানিক চলিল। তার পরেই গল্পে, কলরবে, ধোঁয়ায়, কাশিতে নির্ব্বাক মধ্যাহ্ন অকস্মাৎই মরিয়া গেল।

তপন এদিকে সরিয়া বসিল।

সুবোধ হাসিয়া বলিল, "দৃশ্য দেখায় কি অরুচি ধরে গেল?"

তপন কহিল, "হাঁ, যৌবন পেরিয়ে গেলে বার্দ্ধক্যকে সস্নেহে দেখবার মত দুর্ব্বল লালসা যেমন থাকে না।"

সুবোধ বলিল, "বার্দ্ধক্যের একটা স্নিগ্ধ রূপ আছে। আর একটু পরে ওই মাঠের ওপারে গাছের মাথায় রাঙা সূর্য্য যখন ডুবে যাবে, তখন দেখবার মত শোভা তুই অনেক পাবি। বহু কবি অস্ত-সূর্য্যের কিরণ নিয়ে কাব্য রচনা করেচেন।"

তপন বলিল, "তবু ও দৃশ্য দেখবার সাধ আমার হয় না। যে মধ্যাহ্নের সূর্য্যকে দেখবার মত করে দেখেচে, অস্ত-সূর্য্যকে ভাল লাগা তার উচিত নয়। ইতিহাস পড়ে মনে হতো আগ্রা দিল্লী একবার বেড়িয়ে আসি। আসমুদ্র হিমাচল একদা যাঁদের প্রতাপে কম্পান্বিত হয়েছিল—তাঁদের কীর্ত্তিকলাপের শেষ চিহ্ন দেখলেও কিছু ধারণা হতে পারে। এখন মনে হচ্চে, ইতিহাসের লেখায় যে ছবিটুকু আমার মনে জেগে রয়েচে, তাই যথেষ্ট। আগ্রা দিল্লীতে বেড়িয়ে সে-সব কঙ্কালস্তূপ দেখে মনের ছবিকে নাই বা অশ্রুপ্লাবিত করলুম।"

সুবোধ হাসিল।

তপন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "হাসলে যে? হোন্ তিনি বড় কবি—অস্ত-সূর্য্যকে নিয়ে যিনি বাগ্‌বিতণ্ডা করেন—তাঁর কাব্য পড়ার উৎসাহকে আমি দুর্ভাগ্য বলেই মনে করি।"

সুবোধ হাসিয়া বলিল, "মানুষের মনের গতিই এমন চঞ্চল। আজ ট্রেনের পথে যেতে যেতে যা দুর্ভাগ্য বলে মনে হচ্চে, কাল সন্ধ্যাবেলায়—ইজি চেয়ারে শুয়ে সেই জিনিষটি পড়বার জন্যই হয়ত মন ছট্ ফট্ করবে।"

তপন বাধা দিয়া বলিল, "কখনই নয়। সহজ সরলকে কলমের খোঁচায় যাঁরা দুর্ব্বোধ্য করে তোলেন—তাঁদের ওপর শ্রদ্ধা আমার এতটুকু নেই।"

স্ববোধ বলিল, "ভাল। তবু লেখা না পড়ে অনেক সময়েই কাব্য গড়তে আমরা ভালবাসি।"

তপন বলিল, "মানে?"

স্ববোধ হাসিয়া বলিল, "অথচ ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাইনে যে, এ কাব্য। এই দিনদুপুরে যে স্থন্দর কাব্য তৈরী হয়—এই মাত্র তুমিই তা বলেচ।"

তপনের মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। কাব্য সে কি পড়ে না? মেজ বৌদির কয়েক ছত্র কবিতায় মনটা ত অমনই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। কাব্য পড়িয়া ধাঁধা কাটে নাই। বার বার মনে হইয়াছে, কবি ঠিক লিখিয়াছেন। প্রথম বয়সে একদা তিনিও প্রেমে পড়িয়াছিলেন হয়ত। তাঁহারও কলেজ-জীবনে এমনই আকস্মিক শুভক্ষণের আবির্ভাব ও আলোছায়ায় অন্তর্দ্বন্দ্বের স্থচনা হয়ত হইয়াছিল। নতুবা হুবহু এ চিত্রটি ফুটাইবার দক্ষতা তাঁহার জন্মিল কোথা হইতে? তবে এ কথা ঠিক, কবিরা স্বপ্নের সঙ্গে রঙের খাদ মেশান বড় বেশি। কল্পনার গগন-বিস্তৃত পাখা জুড়িয়া দেন ও ধরণীতে স্বর্গকে নামাইয়া কৌতুক দেখেন। তরুণ চিত্ত তাহাতেই দোল খাইয়া পৃথিবী ও আকাশের রাত্রিদিনগুলিকে লুব্ধ চিত্তে বার বার নিরীক্ষণ করিতে ভালবাসে।

মোট কথা কাব্যলোকের ধাঁধা কাটাইয়া রসসমুদ্রে অবগাহন করিবার মত পিপাস্থ মন এখনও জাগে নাই। কাব্যের মধ্যে যতটুকু তাহার নিজের জীবন, ততটুকুই রমণীয়। বাকি কল্পনার রঙে, না আকাশ, না পৃথিবী কোনটারই ছবি সে খুঁজিয়া পায় না। কেবল একটা ব্যাকুলতা, দীর্ঘনিশ্বাস, জীবনের নিষ্ক্রিয় আলস্যকে আশ্রদ্ধায় ও নিরাপত্তিতে পোষণ করা।

তরুণ জীবন সে-আলস্যকে মানিয়া লইতে পারে নাই বলিয়া—পল্লী যাত্রার এই আয়োজন।

যাত্রাপথে রুক্ষ মধ্যাহ্ন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। আধমরা মাঠের উপর তাহার বেগবান্ নিঃশব্দ গতি—ট্রেনের শব্দায়মান গতির সঙ্গে করতালি দিয়া জীবনের যাত্রাকে জয়মাল্যে বিভূষিত করিবার ইঙ্গিত জানাইয়া এইমাত্র সরিয়া গেল। আবার অলস সায়াহ্নের আরাধনায় আরাম উপভোগ কল্পনা!

তপন রূঢ়ভাবেই অপরাহ্ণ-সৌন্দর্য্য ও সেই সঙ্গে কাব্যকে অস্বীকার করিল। সুবোধের কথার উত্তর দিল না। পাশের ভদ্রলোক খবরের কাগজখানা একপাশে রাখিয়া পুনরায় ঢুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তপন সেখানা তুলিয়া লইয়া মনোনিবেশ করিল।

কত স্টেশন চলিয়া গেল সে মুখ তুলিয়াও চাহিল না।

অবশেষে সুবোধ তাহার কাঁধ ঠেলিয়া কহিল, "ওঠ রে, আমরা পৌঁছে গেছি।"

কাগজ রাখিয়া তপন ট্রেন হইতে নামিল।

দিনের আলোর একবিন্দুও অবশিষ্ট নাই। আসন্ন অন্ধকারে ছোট স্টেশনটি সাগর পারের অচিন দেশের মতই দেখা দিয়াছে। দু'টি কেরোসিনের আলো মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। ভূতের মত লোকগুলা ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকি করিতেছে। আকাশকে ঢাকিয়া প্রকাণ্ড গাছের সারি প্ল্যাটফরমের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত। স্টেশনের ছোট ঘরে বসিয়া রেলেরই সিগ্‌ন্যালার খট্ খট্ করিয়া কাজ করিতেছেন। টেবিলের উপর একটা বিড়াল পরম আরামে ঘুমাইতেছে; লণ্ঠনের মলিন আলোয় তাহার নধর কান্তি ও নির্ব্বিঘ্ন নিদ্রা দেখিয়া মনে হয়,—গৃহস্থের আদরের বস্তু। ও-পাশের ঘরে খাতাপত্রের মধ্যে ডুবিয়া বুকিং ক্লার্ক হিসাব করিতেছেন। মাস্টার ট্রেন attend করিতে গিয়াছেন।

ঘণ্টা ও বাঁশীর সঙ্কেতে ট্রেন ছাড়িয়া গেল। সুবোধ ও তপন অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে স্টেশনের বাহিরে আসিল।

সেখানে এক বিষম ব্যাপার। হোটেলওয়ালারা উত্তম আহার ও বাসস্থানের লোভ দেখাইয়া যাত্রী টানিতেছে। নৌকার মাঝি বাবুদের হাত হইতে মোট কাড়িয়া লইয়া নদী পারের জন্য সাদর আহ্বান জানাইতেছে।

সুবোধ বলিল, "আমরা নৌকাতেই যাব। প্রায় এক ঘণ্টা যেতে লাগবে।"

মিনিট দুইয়ের মধ্যে নদীর ধারে আসিতেই সেখানকার স্নিগ্ধ বাতাসে তপনের সারা দেহ যেন জুড়াইয়া গেল।

অন্ধকার-মাখা নদীতে চকচকে জল ও নৌকায় নৌকায় কেরোসিনের কুপি।

খানিকটা কাদা ভাঙ্গিয়া দুইজনে নৌকায় আসিয়া বসিল। তপন হাত দিয়া কেরোসিনের কুপি নিবাইয়া নৌকার মাথার দিকে ছইয়ের উপর বসিল। নাতিপ্রশস্ত নদীর এ-পার ও-পার দেখা যায়। অন্ধকার আকাশে তারাগুলি উজ্জ্বল হইয়াছে। ছপ্‌ ছপ্‌ করিয়া দাঁড় পড়িতেছে। উঁচু পাড়ের উপর গঞ্জের হাট এই মাত্র শেষ হইয়া গেল। জিনিষ-পত্র কিনিয়া গল্প করিতে করিতে দলে দলে লোক বাড়ি চলিয়াছে। তাহাদের অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি সন্ধ্যার তরল অন্ধকার ভেদ করিয়া সুখের শুভবার্ত্তাটি কানে কানে পৌছাইয়া দিল। শান্ত স্তব্ধ পল্লীজীবনের কত না বৈচিত্র্য এই হাট করিবার কালে ক্রীত দ্রব্যের সঙ্গে কুটীর গুলিতে গিয়া পৌছায়! ভাল মাছটি নাড়িয়াচাড়িয়া বাড়ির ছেলে বুড়ায় দেখে, বার বার দর জিজ্ঞাসা করে। আনাজপাতিগুলি সযত্নে হাতে হাতে ফিরে। তারপর, সুদীর্ঘ পথের দীর্ঘতর যাতায়াত কাহিনী। কে ঠকিল, কেই বা জিতিল। বিবাহের সম্বন্ধ কাহার সহিত কাহারা

পাতাইল। অমুক মাসে নবান্নের সঙ্গে শাদিটাও হয়ত জাঁকজমক করিয়া হইবে। ধান চালের দর, পাটের রপ্তানী, খন্দ কুটা.........

নদীর এ-পারে ঢালু তীরভূমি; খানিকটা দূর গিয়া বনরেখা আরম্ভ হইয়াছে। তাহারই কোলে গ্রাম। অন্ধকারেও নদীর বালি চিক্ চিক্ করিতেছে। নৌকা নদীর মাঝখান দিয়া চলিল।

প্রথমটা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। ঝড়ের মত ট্রেন ছুটিয়া আসিয়াছে; সারাদেহ স্নায়ুগুলির সহিত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। এ সময়ে নৌকায় উঠিয়া বসিতেই দেহ অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িল। নৌকা চলে কি না চলে! মাঝে মাঝে টাল সামলাইয়া বসিতে হয়। মাঝিগুলা তেমন মজবুত নহে, জোরে জোরে দাঁড় টানিতেও পারে না! ঐ নদীতীরের ঝোপটা মিনিট দুই আগে দেখা গিয়াছে, এখনও দেখা যাইতেছে। তার পাশে কলাবাগানটা, নীচের জেলেডিঙ্গিগুলা, নাঃ—জলে নামিয়া দৌড়াইয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

তপন অস্থির হইয়া সুবোধকে বলিল, "ও-পারে নেমে হেঁটে যাওয়া যায় না?"

সুবোধ বলিল, "না। অন্ধকার পথ, অন্য ভয়ও আছে।"

"কিসের ভয়?"

সুবোধ বলিল, "শুনলে শিউরে উঠবি না ত? সাপ। এ সময়ে—"

তপন মুখ ফিরাইয়া জলের পানে চাহিল। জলের উপর কালো কালো ও-গুলা কি ভাসিয়া যাইতেছে?

সুবোধ তাহার দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া হাসিয়া কহিল, "কচুরি পানার দাম। বাংলার নদীগুলো ত ওতেই মজে হেজে গেল।"

এক এক জায়গায় দাম ঘন জঙ্গলের মত হইয়াছে; নৌকা ঘস্ ঘস্

শব্দে অনেকক্ষণ তার উপর দিয়া চলিল। দামগুলির পুষ্পস্তবক তপনের পায়ে ঠেকিতেই সে সভয়ে পা তুলিয়া লইল।

নদীর এ-পারে একখানি গ্রাম দেখা গেল। নদীর ধারে ছোট ছোট হোগলা-ছাওয়া কুঁড়ে, জাফ্‌রি-কাটা ছোট জানালা, ভিতরে কেরোসিনের কুপি বা লণ্ঠন জ্বলিতেছে। আলোর রেখা অল্প খানিকটা জল ছুঁইয়াছে। কুটীর মধ্যে দিনান্তের গল্পও জমিয়াছে বেশ।

দূর হইতে মেঠো বাঁশীর সঙ্গে গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছে ;—

"কে উদাসী—বন পিয়াসী—বাঁশের বাঁশী···"

নদী এই খানটায় একেবারে বাঁকিয়া গিয়াছে। ও ধারে গল্প, ক্লারিও-নেটের সুর ও কোলাহল। একদল ছেলে বসিয়া জটলা করিতেছে। বাঁক ঘুরিতেই সামনে আসিয়া পড়িল—বাঁধান ঘাটের সুবিস্তৃত সিঁড়ি। চাতালে বসিয়া পনেরো কুড়ি জন তরুণ। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফুটবল খেলা শেষ করিয়া হাত মুখ ধুইতে প্রতিদিন তাহারা নদীর ঘাটে আসিয়া জমে ; ঘণ্টাখানেক হাসিগল্পে কাটাইয়া হৈ হৈ করিয়া চলিয়া যায়।

জলমগ্ন সোপানপ্রান্তে নৌকা থামিতেই পাঁচ সাত জন আগাইয়া আসিল, "কে ? সুবোধ দা ?"

সুবোধ হাসি মুখে বলিল, "ভাল ত ? কালিকেশের খবর কি ?"

কালিকেশ কহিল, "বাবা সেরে উঠেছেন, কিন্তু দিদিমা হঠাৎ মারা গেলেন।"

সুবোধ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আর সব গাঁয়ের কে কেমন আছে ?"

কালিকেশ কহিল, "ভালই। অন্যবারের মত এবার অসুখ নেই। মোট আমি নেব, দাদা।" বলিয়া সুবোধের হাত হইতে পুঁটুলি কাড়িয়া লইয়া আগাইয়া চলিল।

সুবোধ বলিল, "পেছনে মেয়েছেলে আছে, চৌধুরীবাড়ির, মজুমদার-বাড়ির ; মোট বিস্তর ।"

কালিকেশ উপবিষ্ট যুবকদের পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "ওরা রয়েচে কি করতে ? ইনি ?"

"আমার বন্ধু ।"

কালিকেশ তপনের পানে চাহিয়া আপ্যায়িতের হাসি হাসিল। কহিল, "বিশ্রী পাড়াগাঁ ! কাঁচা রাস্তা, মোটর বা ঘোড়ার গাড়ি চলে না—আলোও নেই ; ভূতের মত অন্ধকারে পথ চলা !"

তপন বলিল, "এই ত বেশ ।"

কালিকেশ উৎসাহে মাথা নাড়িয়া বলিল, "বেশ নয় ? সত্যি বলতে কি আমার ত ভারি ভাল লাগে, মশায়। একবার কলকাতায় গিয়ে যে কদিন ছিলাম, মোটেই ঘুমুতে পারিনি। যেমন শব্দ, তেমনি ধূলো, তেমনি আলোর ঝাঁজ। কি করে যে মানুষ থাকে ।"

তপন হাসিয়া বলিল, "অন্ধকারে পথ চলতে ভয় লাগে না ? শুনেচি সাপের ভয়ও আছে ।"

কালিকেশ হাসিয়া বলিল, "সাপ ? ও-ত শব্দ শুনলেই সরে যায়। জানেন, আমরা ওদের যেমন ডরাই—ওরাও মানুষের সাড়া পেলেই সুরুৎ করে সরে পড়ে। প্রাণের ভয় আর কার নেই ।"

খানিক থামিয়া বলিল, "অন্ধকার ত আমার ভারি ভাল লাগে। ওই আকাশের মেঘ ঠেলে যেতে যেমন আমোদ, অন্ধকার চোখে, মুখে, গায়ে লাগলে তেমনি আরাম। পায়ে জুতো না রাখাই ভাল ; নরম মাটি, নরম ঘাস পায়ের তলায় এমন সুড়সুড়ি লাগায় ! ভাল লাগে না, সুবোধ দা ?"

সুবোধ বলিল, "আমাদের গাঁ-কে—আমাদের ত ভাল লাগবারই কথা ।"

পাশের কুঁড়ে হইতে কে হাঁকিল, "কে যায় ?"

সুবোধ বলিল, "আমি ঘোষেদের সুবোধ।"

"ওঃ, ভাল ত ?"

"ভাল। আপনি ?"

"ভাল।" অতঃপর—হুঁকার ভড় ভড় শব্দ উঠিতে লাগিল।

পথের দু'ধারে যেখানে কুঁড়ে কিংবা কোঠা পড়ে—সেইখান হইতে এই প্রশ্ন। পরিচয়ের পর—কুশল সংবাদের আদান প্রদান।

তপন বলিল, "আজ কি সারা গাঁয়ের খবর তোমার না নিলেই নয় ?"

সুবোধ বলিল, "কি করি, গাঁয়ের শেষে বাড়ি, খবর দিতে ও খবর নিতে নিতে পথ চলতে হয়।"

কালিকেশ দুঃখ করিয়া কহিল, "ওই মোড়টায় আমাদের বাড়ি। ঠিক অর্দ্ধেক পথ। যদি সুবোধ-দার বাড়ির কাছে বাড়ি হতো ত আরও কত লোকের খবর রোজ পেতাম। আপনার ভাল লাগচে না বুঝি ?"

তপন বলিল, "সবই অদ্ভুত ঠেকচে। আপনাদের গাঁ যেন একটা বড় সংসার। কিন্তু আশ্চর্য্য এই—আমাদের বাড়ির কে কেমন থাকে রোজ তার খবরই আমরা নিই না।"

কালিকেশ কহিল, "সেই জন্যই ত শহরে আমার মন বসে না। কোনটার সঙ্গে কোনটার যোগ নেই; ভারি বিশ্রী!"

মোড়ের মাথায় আসিয়াও কালিকেশ যাইতে চাহিল না। সুবোধ জোর করিয়া তার হাত হইতে মোট লইয়া কহিল, "না, আর অন্ধকারে যেতে হবে না, বাড়ি যা।"

কালিকেশ হাসিয়া বলিল, "অন্ধকার! জান সুবোধ-দা, দিদিমা যেদিন মারা যান—সেদিন যদি থাকতে। কালবোশেখীর ঝড় বিকেল থেকেই উঠলো—সন্ধ্যে নাগাত জল নামলো মুষলধারে। সে কি জল!

বর্ষাকাল বলে ভাল আছি। সেই সময় দিদিমা গেলেন মারা। জলের বেগ কমলেও অন্ধকার ঘুট্‌ঘুটে হয়ে উঠলো, টিপিটিপি বৃষ্টি! লণ্ঠন হাতে সারা গাঁ ঢুঁড়লাম, এক প্রাণীও বেরুলো না বাড়ি থেকে। কি করি, বাবা, আমি, কাকা আর ও-পাড়ার বুড়ো কবিরাজ ঠাকুর্দ্দা মিলে কোমর বাঁধলাম।"

তপন কহিল, "সে কি? এমন এক পরিবারের মত গাঁ—"

কালিকেশ কহিল, "গাঁয়ের সবাই ত এক জাত নয়, কাজেই জলঝড়ের রাতে বিপদ আপদ হলে মুস্কিলে পড়তে হয়।"

তপন বলিল, "ও-সব জাতের হাঙ্গামা কলকাতায় নেই।"

কালিকেশ এক মুহূর্ত্ত থামিয়া কহিল, "হয়ত কলকাতার গুণ,—আর আমাদের দুর্ব্বলতা। কিন্তু তপনবাবু, গুণকর্ম্মবিভাগটা—একেবারে উঠিয়ে দেওয়াও ঠিক কি?"

তপন কহিল, "তা না হতে পারে, কেননা, গুণ অনুসারে কর্ম্মের বিভাগ আপনিই ঘটে। তাই বলে উত্তরাধিকার সূত্রে—"

সুবোধ বলিল, "গুণ কর্ম্মের বিভাগ যে আপনি ঘটে না, আমি তার একজন ভাল সাক্ষী। আপিসের দরজায় ঢুকতে হলে দু'টি গুণ থাকা বিশেষ দরকার। বড় চাকরেদের সঙ্গে নিকট কুটুম্বিতা। দ্বিতীয়, তোষামোদ। তারপর বিদ্যে যদি থাকে ভাল, না থাকলেও কি যায় আসে!"

তিনজনেই হাসিয়া উঠিল।

তপন তর্কের জের টানিয়া কি বলিবার উপক্রম করিতেই কালিকেশ সহর্ষে বলিয়া উঠিল, "ঐযে ঝোপের মধ্য দিয়ে দাদুর ঘরের আলো দেখা যাচ্ছে।"

নূতন স্থানে নূতন পরিবারের সম্মুখীন হইবার সঙ্কোচটুকু তপনকে

নির্ব্বাক করিয়া দিল। কি কথা বলিয়া আলাপ জমাইবে? তাঁহাদের প্রণাম করিয়া প্রথমেই কুশল প্রশ্ন করিবে কি? সে বড় বিশ্রী। হয়ত শিষ্টাচারসম্মত, কিন্তু মনের কোণে এই কুশল প্রশ্নের অশোভনতা বার বারই পীড়া দিতে থাকিবে। এতদিন কোথায় ছিলে, বাপু? কার্ডে দু'ছত্র লিখিয়াও ত কুশল প্রশ্ন করিতে পার নাই! আজ দৃষ্টিপথের অতিথি হইয়া অন্তর তোমার ব্যাকুলতায় উদ্বেল হইয়া উঠিল! লোক-দেখানো এই প্রশ্নের সার্থকতাই বা কি? না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা ভাল। তাঁহারা যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহার উত্তর দিলেই চলিবে। কিন্তু বেশিদিন এই সঙ্কোচপূর্ণ আত্মীয়তার অধিকার লইয়া এখানে বাস করা চলিবে না। বড় জোর দিন দুই; তারপর, বিদায় সে লইবেই।

ছোট পুকুর পাড়ে লণ্ঠন হাতে একজন রমণী এই দিকেই মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

সুবোধ দূর হইতে ডাকিল, "মা?"

রমণী লণ্ঠন লইয়া অগ্রসর হইতে হইতে কহিলেন, "ওরে, ওইখানে একটু দাঁড়া। বড় অন্ধকার পথ, পরশু একটা লতা দেখা গিয়েছিল।"

তপন সুবোধকে জিজ্ঞাসা করিল, "লতা কি?"

কালিকেশ চুপি চুপি উত্তর দিল, "সাপকে রাত্রিকালে লতা বলে। ওঁদের ভয়—সাপ বললে—"

আলো নিকটে আসিয়া পড়িল। রমণী ভৎর্সনাপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "থাম বাপু, খুব বীর পুরুষ তুমি। আমার ছেলেকে আর ভয় দেখাতে হবে না।"

কালিকেশ হাসিয়া বলিল, "তোমার ছেলে যে কলকাতার, জেঠাইমা। কাজেই ওঁকে বুঝিয়ে না দিলে—"

সুবোধের মা তপনের পানে ফিরিয়া কহিলেন, "জান বাবা, আজ-

কালকার দুষ্টু ছেলেরা মাকে ভয় দেখাতেই ভালবাসে। তোরা ডাকাত নাকি রে! এই রাতবিরেতে বনজঙ্গলের পথে আলো না নিয়ে পায়ে হেঁটে আসচিস ?"

তপন তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল।

তিনি সস্নেহে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "থাক, বাবা, থাক। দীর্ঘজীবী হও, আমার মাথার যত চুল—তত পরমায়ু তোমার হোক।"

কালিকেশ হা হা করিয়া হাসিয়া কহিল, "তবু—তা হয় না কেন, জেঠাইমা ?"

সুবোধের মা স্নেহ-সকোপ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া কহিলেন, "আগে ছেলের বাপ হ' তখন বুঝবি কেন। হাঁ বাবা, তোমার বাড়ির সবাই ভাল আছেন ত ?"

তপন ঘাড় নাড়িল।

সুবোধের মা কহিলেন, "সুবোধ ফি চিঠিতেই তোমার কথা লেখে; সে-সব পড়ে চোখের দেখা দেখতে বড় ইচ্ছে হতো। দেখ কালি, আমি মনে মনে তপনকে যেমনটি ভেবেছিলাম, এখন দেখচি ঠিক তেমনিটিই। তেমনি ছোট, তেমনি সুন্দর।"

তপন লজ্জিত হইয়া অন্যদিকে চাহিল।

কালিকেশ কহিল, "তোমাদের মনটাকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়া উচিত, জেঠাইমা। সেখানে টেলিভিশন যন্ত্রের জন্য ওরা উঠে পড়ে লেগেচে। এমন মায়ের মন পেলে, শুধু কথা শুনে নয়, চিঠির লেখাতেও মানুষটাকে দেখতে পাবে। সে হবে একটা বিস্ময়কর আবিষ্কার।

সুবোধের মা বলিলেন, "তা কি সবাই পায়, বাছা। যারা মা, তারাই শুধু পায়। তোদের যন্ত্রতন্ত্র না নিয়েও তারা ঠিক দেখতে পায়।"

তপন মুখ না ফিরাইয়াই জবাব দিল, "তা হয়ত পায় না। আমাদের বাংলা দেশের মত মা পৃথিবীর কোন দেশেই বা আছে।"

সুবোধের মা বলিলেন, "তোমরা বাংলা দেশের ছেলে বলে তাই ভাবচ। পড়েছ ত গর্কির মাদার। বাংলার মা বলে মনে হয় না?"

তপন এই বর্ষীয়সীর মুখে গর্কির নাম শুনিয়া বড়ই বিস্ময় বোধ করিল। অন্ধকার পাড়া গাঁ—বনঝোপে কত কি নাম না-জানা কীট-পতঙ্গ বিচিত্র সুরে তান ধরিয়াছে; পচা পানাভরা এঁদো পুকুরের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে এক পল্লীরমণীর মুখে সুদূরতম এক মহাদেশের বার্ত্তা! বর্ষীয়সীর হাতের ম্লান আলোটিকে মনে হইল, বিদ্যুৎভরা উজ্জ্বল বাতি। ইচ্ছা হইল, আর একবার অবনত হইয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

দাওয়ার উপর মাদুর বিছানো ছিল। হ্যারিকেনটা পৈঠার উপর রাখিয়া সুবোধের মা বলিলেন, "কালি বোস, পালাসনে যেন! একটু জলটল খেয়ে যাবি।"

কালিকেশ বালতি হইতে জল লইয়া হাত মুখ ধুইল এবং গামছা দিয়া হাত মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "তপনবাবু, জামা টামা ছাড়ুন, হাত মুখ ধুয়ে নিন।"

তপন জামা খুলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। শহরের সভ্যতার জল-হাওয়ায় বাড়িয়াছে সে, খালি গায়ে—অপরিচিত স্থানে বিশেষ রকমের সঙ্কোচ বোধ হয়। এ-যেন একেবারেই বাড়ির মধ্যে—নিতান্ত পরিচিত স্থান। কালিকেশ নূতন লোক, সে কি মনে করিবে!

কালিকেশের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে জামা খুলিতেই হইল। সঙ্কুচিত ভাবে হাত পা ধুইয়া মুখ মুছিল ও ভিজা গামছাখানি গায়ে জড়াইয়া মাদুরের উপর বসিল।

বেশ ঝিরঝিরে বাতাস বহিতেছিল—সুবোধের মায়ের কথাগুলির মত সারা দেহকে সুস্নিগ্ধ করিয়া তুলে।

*   *   *

অনতিবিলম্বে সুবোধের মা ও আর একটি তরুণী জলখাবার লইয়া আসিলেন।

মাদুরের একপ্রান্তে রেকাবগুলি নামাইয়া সুবোধের মা তরুণীকে বলিলেন, "জলের গেলাসগুলো নিয়ে আয় ত, আভা। পানের ডিবেটাও, বুঝলি?"

আভা চলিয়া গেল।

সুবোধের মা চালের বাতা হইতে একখানি পাখা টানিয়া লইয়া বাতাস করিতে করিতে বলিলেন, "খাও বাবা, জল খাও।"

তপন কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, "এই ত বেশ বাতাস বইচে, আপনি আর কষ্ট করচেন কেন!"

কষ্ট!—সুবোধের মা হাসিলেন। সে তৃপ্তিময় হাসি দেখিয়া কষ্টের কথা তুলিতে যাওয়ার মত লজ্জাকর আর কি থাকিতে পারে? প্রকৃতি মানুষের বিমাতা, যখন ইচ্ছা হয়—মানুষকে আলো হাওয়া দেন, কিন্তু অপ্রয়োজনে যাঁহাদের স্নেহ-সেবা মানুষকে সুখে দুঃখে লালন করিবার জন্য সদাসর্ব্বদা ব্যগ্র, তাঁহারা মা। তাঁহাদের যত্নকে প্রশংসা দিয়া উচ্চে তুলিবার চেষ্টায় মানুষ কতটা যে খাটো হইয়া যায়!

সহজ সরল নদীধারার মত সস্নেহ মাতৃহৃদয়; রেকাবিতে আয়োজনও করিয়াছেন তেমনই সুন্দর। পেঁপে, আম, জাম, ঘরের নারিকেল-নাড়ু, পাটালী, ক্ষীর ও গরুর দুধের ছানা কাটিয়া রসগোল্লাও তৈয়ারী করিয়াছেন।

সুবোধ একবার রহস্য করিয়া বলিল, "ওদের লুচি, সন্দেশ, চা, ডিম এই সব না হলে—"

তপন বাধা দিয়া কহিল, "একটুও কষ্ট হয় না। এখানে এসে যদি চপ-কাটলেট খাবার বায়না ধরি ত এ দেশে জন্মানোই আমার উচিত হয় নি। যারা বন্ধু তারা অনেক সময় শত্রুর মত আচরণ করে, কিন্তু মায়েরা সব সময়েই মা।"

মা হাসিলেন, "কেমন জব্দ!"

কালিকেশ বাঁ-হাতে মাদুর চাপড়াইয়া কহিল, "ঠিক, ঠিক।"

আভা তিনটি কাচের গ্লাস মাদুরের উপর নামাইয়া মাকে মৃদুস্বরে বলিল, "সরবতের কথা ভুলে বসে আছ বুঝি?"

মা সবিস্ময়ে কহিলেন, "ওমা, তাইত! পোড়া মনও এমন, কোথায় প্রথমে সরবৎটুকু দেব, না বসে বসে গল্পই করচি।"

কালিকেশ কহিল, "তাতে কি? গল্প, সরবৎ, জলখাবার গ্রীষ্ম-কালের সন্ধ্যেবেলায় কোনটাই কম নয়। তপনবাবু কি বলেন?"

মা বলিলেন, "তপনবাবু কি রে? তোকেও শহুরে-সভ্যতায় পেয়ে বসলো কালি?"

আভা মুখে কাপড় চাপা দিয়া নিঃশব্দ-হাসি লুকাইয়া ফেলিল।

কালিকেশ লজ্জিত না হইয়া কহিল, "ওটা হচ্ছে অতিথির সম্মান, কি বল ভাই?" বলিয়া ভিতরের সঙ্কোচটাকে প্রবল হাসির মাঝেই নিঃশেষ করিয়া দিল।

তপন হাসিয়া উত্তর দিল, "তোমাদের ওই নদী পার হবার সময় শহরটাকে ওপারেই রেখে এসেচি যে, সুতরাং এ-পারের সহজ সম্বোধনই ভাল।"

এমনই করিয়া কিছুক্ষণ গল্প চলিবার পর মা ও আভা উঠিয়া

গেলেন। রাত্রির আহারের আয়োজন তাঁহাদেরই করিতে হইবে। কালিকেশও কিছুক্ষণ পরে উঠিল। যাইবার সময় তপনকে বার বার করিয়া অনুরোধ করিয়া গেল, প্রত্যুষে উঠিয়া সুবোধের সঙ্গে সে যেন ও-দিক পানে বেড়াইতে যায়।

সুবোধ বলিল, "আলোটা না-হয় নিয়ে যা, এইমাত্র মা বলছিলেন—"

কালিকেশ অন্ধকারে অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। সেইখান হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ও-সব আমরা মন্তর জানি, সুবোধ-দা। দিনেরবেলায় অসিত, আর্ত্তিমান, সুনীথকে স্মরণ করে রেখেচি।" বলিয়া শিস্ দিতে দিতে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

সুবোধ তপনকে বলিল, "কেমন লাগচে—পাড়াগাঁ?"

তপন হাসিয়া উত্তর দিল, "ঠিক তোমার মায়ের মত। নৌকো থেকে নেমে মাটিতে পা দিয়েই মনে হলো, আমার জন্যই বুঝি এর মাটি এমন নরম হয়ে রয়েচে।"

সুবোধ বলিল, "ট্রেনের বেগ মনে পড়চে না? নৌকোয় বসে ত বলছিলি হেঁটে যাওয়া যায় না?"

তপন বলিল, "এখন একখানা বই পেলে পড়তেও পারি।"

সুবোধ বলিল, "বটে! কাব্য, না ব্যাকরণ?"

তপন বলিল, "নভেল। অতি সামান্য তার বিষয়বস্তু; এই ঘর-করনার খুঁটিনাটি নিয়ে লেখা।"

সুবোধ বলিল, "অতিউচ্ছ্বাস বা অতিসারল্য দুই-ই কাব্যের বিষয়-বস্তু। দুয়েতেই প্রচুর বাগ্‌বিতণ্ডা চলে।"

তপন হাসিয়া বলিল, "যতই খোঁচা দাও, তর্কের খাতিরেও এই মাধুর্য্যকে নষ্ট করতে আমি রাজী নই।"

সুবোধ বলিল, "একলা বসে মাধুর্য্য উপভোগ করতে যদি অরাজী না হও ত—"

তপন কহিল, "স্বচ্ছন্দে, তুমি ঘুরে আসতে পার। কথার চেয়ে চুপ করে বসে থাকতেই আমার ভাল লাগচে। চারিদিকে নিঃশব্দ অন্ধকারে কত কথা, কত রহস্য জমা হয়ে রয়েচে যা শুধু চোখ দিয়ে আকর্ষণ করে মনের মাঝে ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে। গ্রীষ্মমধ্যাহ্নে নির্ম্মল নদীতে স্নান করার মতই তা তৃপ্তিদায়ক।"

সুবোধ হাসিয়া বলিল, "কবিত্ব জাগলে উপমাগুলোও কি ঠিক ঠিক বেরিয়ে আসে!"

সুবোধ চলিয়া গেলে তপন পাশ বালিশটায় মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল ও হাত দিয়া হ্যারিকেনের আলো স্তিমিত করিয়া দিল।

সুবোধের প্রাসাদ নাই। যদি থাকিত, এই বনের মাঝে সেই সুবৃহৎ পুরীর বিরাট স্তব্ধতা নিশ্চয়ই চারিপাশের বনজঙ্গলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া ভয়াবহ প্রেতপুরীর বিভীষিকা জাগাইয়া তুলিত। গোল-পাতায় ছাওয়া চাল—মৃদু বাতাসে খড়-খড় শব্দ উঠে—অদূরে ঝিঁঝিঁ-পোকার রাগিণী ঝঙ্কারের মতই রহস্যময়। শাখায় শাখায় আলিঙ্গন-আবদ্ধ দেবদারুর পিট্ পিট্ ও ঝাউয়ের শোঁ-শোঁ শব্দ। আকাশভরা ঠাসাঠাসি নক্ষত্র—চুণিপান্নার মতই উজ্জ্বল। গাঢ় নীল সে আকাশ, কলিকাতার মত ফিকে নহে। তারায় তারায় যে অনুজ্জ্বল জ্যোতি—মাঝের শূন্য-পথ পর্য্যন্ত তাহাতে স্বল্পালোকিত। তির্য্যক্ সেই জ্যোতির রেখা দেবদারুর পত্রগুচ্ছে পড়িয়া চিক্ চিক্ করিতেছে। ও-পাশে বড় তারাটার আলো—এক চোখ বন্ধ করিয়া চাহিলে—অপর চক্ষুর পল্লবে আসিয়া মায়ের চুমার মত—স্নিগ্ধ স্পর্শ বুলাইয়া দেয়।

দাওয়ার কোল ঘেঁষিয়া কত গাছ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া। হাত

দিয়া তাহাদের ছুঁইবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে অন্তর প্লাবিত হইয়া যায়। বন-জঙ্গলের কেমন একটা গন্ধ; ঈষৎ কটু—ঈষৎ তীব্র।

গলা অবধি বন ঠেলিয়া খানিক ছুটাছুটি করিয়া আসিতে ইচ্ছা হয়।

মনে পড়িল, মধ্যাহ্নের রৌদ্রঝলসিত প্রান্তর—ট্রেনের উদ্দাম গতি।

ছাই গতি! উল্লাস-কলরব যদি তুলিতেই হয় ত এই বনে। ছোট ছোট আসশ্যাওড়া, কালকাসুন্দা, ভাঁটের ঝোপ ঠেলিয়া, (নামগুলি সে পথে আসিতে আসিতে শুনিয়াছে) গোয়ালে-লতার বাঁধন ছিঁড়িয়া, ছোট ডোবা ডিঙ্গাইয়া, পায়ের তলায় নরম ঘাস দলিয়া, পুকুরপাড় দিয়া আম-অশ্বত্থের ছায়ায় ছায়ায় যতক্ষণ না ক্লান্তি আসে—এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা, সমস্ত দুপুর ও বৈকাল শুধু চীৎকার তুলিয়া ছুটিয়া বেড়ানো। অদূরে শস্যশূন্য বিদগ্ধ প্রান্তর—সেই চলার পানে চাহিয়া রহিবে, পত্রান্তরালে দীপ্ত-মধ্যাহ্নও উঁকি মারিবে। পুকুরের জলে হাঁস পাখা মেলিয়া উড়িবে; একটা গরুই হয়ত ছুটিয়া পলাইবে; (ট্রেণের পথে যেমন পলাইয়াছিল) কিংবা কয়েকটা কুকুর ডাকিয়া উঠিবে।

ওই পুকুরপাড়ে কোন্ পুরাকালের অকথিত কাহিনী; বন-ঝোপে অন্ধকার রাত্রিতে সে-কাহিনী নিঃশব্দে চলাফেরা করে। মানুষের গা ঘেঁষিয়া সে-কাহিনী উড়িয়া বেড়ায়। পাতায় পাতায় তাহাদের অসমাপ্ত জীবনের দীর্ঘনিশ্বাস, ঝাউয়ের শাখায় শাখায় বিলাপধ্বনি। সে-কাহিনী আকাশের তারায় উঠিয়া উজ্জ্বলতর হয়, মেঘে নামিয়া—মেঘকে করে গাঢ় নীল, অন্ধকারে ছড়াইয়া পড়িয়া মানুষের মনকে ভয়ার্ত্ত ও সৌন্দর্য্যলোলুপ করিয়া তুলে।

বাতাস বহিয়া শরীর স্নিগ্ধ করে, কাহিনীকে ভাষা দেয় না। অতীত বা বর্ত্তমানে মানুষ, মানুষ। পুনরাবৃত্তি সে ভালবাসে না! সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে যাহারা আকাশকে নীল দেখিয়া বনের সঙ্গীত এমনই তন্ময়

হইয়া শুনিত,—সহস্রবর্ষ পরের প্রগতিশীল নর নূতন দৃষ্টি লইয়া তেমনই অনির্ব্বচনীয়ত্ব প্রকৃতির মাঝে অনুভব করিয়া মুগ্ধ হয়। আরও সহস্রবর্ষ পরেও এমনি হইবে। অথচ সেই আদিযুগকে ice age, stone age বলিতে আজিকার মানুষের ঘৃণার অবধি নাই। কাহিনী কে-ই বা বলে, শোনেই বা কে?

অন্ধকারে কান পাতিয়া যে শোনে—সে তাহার ভাষা বুঝে; দৃষ্টি যাহার তীক্ষ্ণ—সে অতীত, ভবিষ্যতের রূপ—বর্ত্তমানের মধ্যে দেখিয়া মুগ্ধ হয়। বটের বীজে যেমন বটগাছই হয়, মানুষের মনে তেমনই আদিম যুগের পৃথিবী আদিম-মনের সৌন্দর্য্যকে বার বার নূতন রূপে প্রকাশ করে। আসলে পুরাতন পৃথিবীতে তরুণ মন সর্ব্বকালেই তরুণ এবং সে মনের স্বপ্ন—নিশীথ-সৌন্দর্য্য-বিহারী ভালবাসার বিলাস।

পুকুরপাড় হইতে 'হুম্' 'হুম্' শব্দে একটা পাখী ডাকিয়া উঠিল। গম্ভীর আওয়াজ, জলশুদ্ধ গুব্ গুব্ করিয়া উঠিল। ঝপ্ করিয়া জামগাছে কি একটা পাখী পড়িল। চালার উপর খড় খড় শব্দ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইঁদুর নাকি? ঘরের পিছন হইতে অনবরত শব্দ উঠিতেছে, কট্-কট্—কটাস্।

তপন উঠিয়া আলোটা বাড়াইয়া দিল।

রান্নাঘর হইতে 'ছ্যাক্' 'ছ্যাক্' শব্দ আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ভর্জ্জিত দ্রব্যের সুগন্ধ। ঘরের মধ্যে বসিয়া উঁহারা মৃদুস্বরে গল্প করিতেছেন, কখনও বা হাসিতেছেন। হাসিগল্পের সঙ্গে কড়াইয়ের উপর খুন্তির ঠুন্‌ঠুন্ আওয়াজ উঠিতেছে—চুড়ির আওয়াজের সঙ্গে সুরের সঙ্গতি রাখিয়া। ছেঁচার বেড়া দিয়া জ্বলন্ত উনানের আলো ঘরের আনাচ-কানাচে উঁকি মারিতেছে। মাঝে মাঝে 'ম্যাও' 'ম্যাও' করিয়া একটা বিড়াল ডাকিতেছে।

এখানে একলা পড়িয়া থাকার চেয়ে ও-ঘরের দুয়ারে পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া খানিক গল্প করিয়া আসিলে মন্দ কি ?

চিরদিনই বাড়ির ব্যবস্থা অন্যরূপ।

প্রকাণ্ড প্রাসাদের কোনদিকে রান্নাঘর সে খোঁজ রাখিবার প্রয়োজন হয় না। বাড়ির মেয়েদেরও ধোঁয়া, আগুন সহ্য করিয়া সেখানে গিয়া রান্না করিতে হয় না। দু'জন ঠাকুর আছে, তাহারাই সব করে।

লম্বা ভোজনকক্ষে সারি সারি আসন পাতিয়া জলের গ্লাস সাজাইয়া তাহারাই অন্নের থালা দিয়া যায়। মা আসিয়া কোন কোন দিন কাছে বসিয়া এটা ওটা ফরমাশ করেন। সব বন্দোবস্ত বাঁধা। বাটিখানেক দুধ, একটু ঘি, একটুকরা লেবু, রাত্রিতে লুচি ইত্যাদি।

আজ এইমাত্র জলখাবার খাওয়ার সঙ্গে যে মধুর স্নেহস্পর্শটি সে পাইয়াছে, তাহার অভিনবত্বে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম সুশীতল হইয়া উঠিল। বাড়িতে মা স্নেহ যে করেন না, এমন নহে। কিন্তু ঐশ্বর্য্যের-আওতায় খণ্ডিত সেই স্নেহকে একান্তভাবে উপভোগ করিবার সৌভাগ্য আজও অবধি ত তাহার ঘটে নাই! বিজলীবাতির উগ্র আলোয় সারা বাড়িটা দপদপ করিতে থাকে, স্তিমিত-জ্যোতি হ্যারিকেন জ্বালাইয়া পুত্রের প্রতীক্ষায় পুকুরপাড়ে ব্যাকুল মন লইয়া তাঁহাকে ত কোনদিন দাঁড়াইতে হয় নাই।

কেহ কোথা হইতে আসিলে মা প্রচুর জলখাবারের আয়োজন করেন। খাওয়াইতে বসিয়া বার বার খাবার-সম্বন্ধে ত্রুটি স্বীকার করিয়া অতিথিকে বিষম লজ্জা দেন। যে-ব্যবস্থার চেয়ে উৎকৃষ্টতর কিছু হইতে পারে না, তাহাই যদি অতি সামান্য বলিয়া ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব প্রচার করা যায় (এত দিন গর্ব্ব বলিয়া মনে না হইলেও, আজ সে মনে না করিয়া পারিল না) ত লজ্জায় মুখের কাছে হাত তুলিবার দুঃসাহস কোন অতিথিরই বা থাকে!

ভিতরের সঙ্গে বাহিরের জাঁকজমক ফুটাইয়া তুলিয়া একটা বিস্ময়ভরা সম্ভ্রম ও প্রশংসা লুটিয়া লইবার জন্য তাঁহাদের প্রাণপণ চেষ্টা!

দুই দাদা আহারে বসিয়া প্রতিদিনই বকাবকি করেন। ঠাকুর ভয়ে সম্মুখে আসিতে পারে না। মা বুঝাইতে গেলে তাঁহাকেও দু'কথা শুনিতে হয়। কয় সের মাছ কুটিয়া কয় টুকরা হইয়াছে, চাকর বামুন বাদ দিয়া বাড়ির ছেলেমেয়েদের পাতে একটুকরা করিয়া দিলে—দু'বেলা সকলে পাইবে কিনা, দুধ ঘন করিয়া জ্বাল দিলে কতটুকুই বা হয়—ইত্যাদি বাঁধা-ধরা নিয়মের কথা বুঝাইয়া গোলযোগের নিষ্পত্তি করেন। অপ্রসন্নমুখে আহার সারিয়া ছেলেরা উঠিয়া পড়ে।

যত্নের কথা উঠিলে বলেন, "কেউ তো ছেলেমানুষ নয়, নিজের নিজের বুঝে সুঝে চলুক না।"

দশবছর বয়স হইলেই ছেলেরা স্বতন্ত্র শোবার ঘর পায়। বই, আলমারি, খাট, বিছানা—দরকারী আসবাব পত্র। স্বাবলম্বনের এমন উজ্জ্বল শিক্ষা মানুষ হইবার পথে কি কম সহায়তা করে! মনের মধ্যে ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র একটি ইচ্ছা জাগিয়া উঠে। এটি আমার, ওটি অন্যের।

সকাল-বিকাল পড়া তৈয়ারী করিয়া—অন্য ছেলেদের সঙ্গে হুড়াহুড়ি সারিয়া মাষ্টারের কাছে পাঠ লইতে হয়। নিয়মের একচুল এদিক-ওদিক হইবার জো নাই।

রাত্রিতে একলা ছোট বিছানায় শুইয়া প্রথম প্রথম মন উস্‌খুস্‌ করিত। ছেলেবেলা হইতে আত্মীয়-স্বজনের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে শেখার মধ্যে প্রচুর মিষ্টত্ব থাকে। সুকোমল শিশুচিত্ত—রূপকথার কাহিনী শুনিয়া নানা প্রশ্নে বহির্জগতের পরিচয় লাভ করিতে অত্যন্ত উৎসুক হয়। শুধু রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে মুখোমুখী করিয়া কোমল মনকে দৃঢ় করিয়া গড়িলে উত্তর-জীবন হয়ত কর্ম্মঠ ও উন্নত হইয়া আদর্শ-চরিত্রে ইতিহাস-

সৃষ্টি করে; কিন্তু শুধু শহর লইয়া ত জীবন নহে। উজ্জ্বল বিজলী-বাতিরই ম্লান অংশ—এই লণ্ঠনের আলো। প্রশস্ত পিচ-বাঁধানো হর্ম্ম্যশ্রেণী-সুশোভিত রাজপথের শৈশব অবস্থা এই মাত্র বনরেখা-সজ্জিত বিসর্পিত অপরিসর কাঁচা পথের বুকে পা দিয়াই না স্মরণ হইল!

শিশু স্বাবলম্বী হউক, দূরদৃষ্টি লাভ করিয়া জীবন আদর্শে গড়ুক, ভাল কথা; কিন্তু, মমতার লেশ মুছিয়া ফেলিয়া নিমেষে মানুষ হইতে পাথর হইয়া দাঁড়াইবে, এই বা কোন কথা! চোখের কোণে উদ্বেল আনন্দের সঙ্গে উচ্ছ্বসিত অশ্রু জমা থাকুক, বুকের মাঝে নিঃশব্দ দ্রুত শব্দের তালে ব্যাকুল বেদনাটুকু সঞ্চিত করিয়া রাখিতে দাও এবং স্বাবলম্বী মন মাঝে মাঝে বাস্তব ছাড়িয়া স্বপ্নজগতে বিচরণ করিতে শিখুক।

ঐশ্বর্য্যের আবরণে অনেক কিছুই চাপা পড়িয়া থাকে। সহজ সরল কথা, দুষ্টামী, বন্ধনহীনতার আনন্দ, রূপকথার মোহ।

এমন কি মায়ের স্নেহ পর্য্যন্ত।

এমন মধুর প্রকাশ ত তপনের চোখে কোনদিন পড়ে নাই। স্নেহ-যত্ন এক, সতর্ক অনুশাসন অন্য। হয়ত, তাহারই মধ্যে দুর্ব্বল মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুল প্রকাশ। তবু, শহর যেমন পাড়া-গাঁ নহে, সেই মা-ও এই মা নহেন। ঐশ্বর্য্যের যবনিকাখানি তুলিয়া ধরিয়া সেই মাকে লণ্ঠন হাতে পুকুরধারে দাঁড় করাইয়া দিলে, তিনিও কি উতলা হইয়া 'লতার' ভয়ে ছুটিয়া আসিতেন না?

তপনের ভারি ইচ্ছা হইল, শহরের বিদ্যুৎঝলসিত প্রাসাদ-কক্ষ হইতে আভরণহীনা করিয়া সেই মাকে টানিয়া আনিয়া এই নিরাবরণ প্রকৃতির মাঝে অন্ধকার অঙ্গনতলে দাঁড় করাইয়া একবার দেখে, কিংবা দাওয়ায় এই মাদুরের প্রান্তে বসাইয়া তাঁহারই কোমল অঙ্কে মাথা রাখিয়া বলে, তুমি, তুমিই আমার মা। এই অন্ধকার আকাশ ও বনের

গভীর নিস্তব্ধতার মাঝে বসিয়া গল্প করিয়ো না, শাসন করিয়ো না, জীবন-সম্বন্ধে কোনরূপ নির্দ্দেশও না; শুধু গাঢ় ঘন স্পর্শ চুলের মধ্য দিয়া শ্রান্ত মাথায় ঢালিয়া চোখের তন্দ্রাকে ঘনীভূত করিয়া বুঝিতে দাও, তুমি, তুমিই আমার মা।

* * *

মা যেন ছেলের কামনা পূর্ণ করিতে সেইমাত্র শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত দিয়া ডাকিতেছিলেন, "ওঠ, ওঠ।"

তপন উঠিয়া বসিল।

সুবোধের মা বলিলেন, "সুবোধটা ত আচ্ছা! তোমায় এখানে একলা বসিয়ে রেখে দিব্যি রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে বসে গল্প করচে! আমায় বললে তুমি ঘুমিয়েচ।"

তপন চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল, "বেশ ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুম এসেছিল। বোধহয় অনেকক্ষণ ঘুমিয়েচি।"

মা বলিলেন, "চোখে মুখে জল দিয়ে নাও। খাবার হয়েচে, খাবে চল।" পরে বলিলেন, "ভাতই রাঁধলাম। একে গ্রীষ্মকাল, তায় তেতে-পুড়ে আসচ। সুবোধ বলে, ওরা রাত্রিতে ভাত খায় না; এই নিয়ে তার সঙ্গে খানিকটা ঝগড়াই হয়ে গেল। ছেলের শুকনো মুখ দেখে মা কি খাবার ব্যবস্থায় ভুল করে! মায়ের ব্যবস্থাতেই যে ওরা এত বড়টা হয়েচে—সে-কথা মাঝে মাঝে ভুলে যায়।"

তপন বলিল, "সুবোধ-দা কিন্তু তার মাকে চিনতে ভুল করেনি কোনদিন।"

মা বলিলেন, "না, ও আমার তেমন ছেলেই নয়। আজ রাত্রিতেই মজা দেখো। আমার কোলের কাছে না শুলে বাড়ি এসে ত ঘুমুতেই পারে না। এই নিয়ে আভার সঙ্গে কত যে খুনসুটি।"

তপন কহিল, "আজ ত আর একটি ছেলে বেশি, তিনটে পাশ কোত্থেকে জোগাড় করবে, মা ?"

মা হাসিয়া বলিলেন, "তুমিও দেখচি পাগল ছেলে।"

তপন বলিল, "যাই বলুন, আজ আর ঘুমুচ্চি না—সারারাত ধরে গল্প শুনবো।"

"তা শুনো, এখন খাবে এস।"

অদ্ভুত রান্নাঘর, অদ্ভুত তাহার দাওয়া। জিওল গাছের খুঁটি—পল্লব-বাহু মেলিয়াছে। সেই পল্লববিস্তারের মধ্যে শালিখ পাখী নীড় রচনা করিয়াছে। লণ্ঠনের আলো পাইয়া পাখীটা বারকয়েক ডাকিয়া উঠিল। ডেড়কোর উপর রেড়ির তেলের প্রদীপ ; আধ আলো, আধ অন্ধকার।

ঘরের পিছনে শব্দ উঠিল,—কট্—কট্—কটাস।

মা বলিলেন, "বাতাসে বাঁশঝাড় নুয়ে পড়চে—তারই শব্দ। হুতোমের ডাক শুনেচ, তপন ?"

একগ্রাস ভাত মুখে পুরিয়া তপন উত্তর দিল, "হুঁ।"

মা বলিলেন, "জামগাছে বাদুড় পড়া দেখে সুবোধ বলছিল, তোমার ছেলে হয়ত ঘুম ভেঙ্গে আঁতকে উঠবে। আমি বললাম, ষাট্! বালাই! কলকাতার ছেলে হলেও কি বাদুড় দেখেনি কখনও ?"

সুবোধ কৌতুকভরা স্বরে প্রশ্ন করিল, "দেখেচ—তপন ?"

তপন সলজ্জে ঘাড় নাড়িল।

সুবোধ বলিল, "জান মা, ওরাই বলে ধানগাছের তক্তায় দোর জানালা হয়।"

মা বলিলেল, "নে বাপু রঙ্গ রাখ। ওরা ঘাস খায় কিনা।"

সুবোধ হাসিতে হাসিতে বলিল, "ঘাস না খাক, ওর বিচি যে ওরা খায় না—একথা হলপ করে বলতে পারি।"

আভা হাসিতে হাসিতে মুখে আঁচল চাপা দিল। মা-ও হাসিলেন।

তপনের গলায় 'বিষম' লাগিল।

মা 'ষাট' 'ষাট' করিয়া মাথায় বারতিনেক ফুঁ দিয়া কহিলেন, "একটু জল খাও ত বাবা, 'বিষম' ছেড়ে যাবে।"

তপন সামলাইয়া লইয়া বলিল, "টেলিফোন নিয়ে ওঁর যা কাণ্ড একদিন। কলটা যত ক্রিং ক্রিং করে ডাকে, সুবোধ-দা ততই তার মাথা চাপড়ে বলে, **wait, wait.**"

সুবোধ বলিল, "তার ব্যবহার জানতাম না বলেই—"

আভা হাসিতে হাসিতে বলিল, "দাদা, এতদিন মিছেই কলেজে পড়ে পাস করেচ!"

সুবোধ বলিল, "সে কি আজকের কথা রে? তখন সবে কলকাতায় গিয়েচি। গল্পটা ওদের কাছে করেছিলাম বলে—যখন-তখন আমাকে ওই নিয়ে জ্বালায়।"

তপন বলিল, "জ্বালাবে না? নৈলে ধানগাছের তক্তা না বানিয়ে তুমি ছাড়তে কিনা!"

সকলেই হাসিয়া উঠিল।

হাসি-গল্পের মধ্য দিয়াই আহার শেষ হইল।

পূব-দক্ষিণ খোলা জানালার ধারে আড়াআড়ি করিয়া তক্তাপোষ পাতা। গোলপাতায় ছাওয়া ঘর, হাওয়ায় চালের উপর খড় খড় শব্দ উঠিতেছে। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র বেশি কিছু নাই। মাটির মেঝে পরিপাটী করিয়া নিকানো; কড়ির আলনায় লেপ তোষক প্রভৃতি শীতকালের শয্যা-উপকরণ গোছানো রহিয়াছে; তাহার নীচে কাঠের একটা বড় সিন্দুক। সিন্দুকের মাথায় কাঠের ছোট হাতবাক্স। পিতলের পিলসুজে তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছে; ঘরটা আবছা-অন্ধকারে স্নিগ্ধ হইয়া

আছে। সিন্দুকের ও-পাশে ছোট জলচৌকির উপর কয়েকখানা বাসন ঝকঝকে করিয়া মাজা, ক্ষীণ আলোকে চিক্ চিক্ করিতেছে। তার পাশেই পানের ডাবর। তক্তাপোষের দুইধারে কাঠের দেওয়াল-আলনা। কাপড়জামাগুলি সুবিন্যস্ত করিয়া গোছানো। শয্যায় শুইয়া গল্প শুনিতে সত্যই আরাম বোধ হয়।

কিন্তু মা যখন এ-ঘরে আসিলেন, তখন দুইজনেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মশারি খাটানো হয় নাই, মাঝে খানিকটা জায়গা খালি পড়িয়া আছে। পাগল ছেলে! ঈষৎ হাসিয়া মা হাতপাখা তুলিয়া লইয়া খুব খানিকটা বাতাস দিয়া ধীরে ধীরে মশারি ফেলিয়া দিলেন ও বিছানার চারিপাশে ধারগুলি গুঁজিয়া আলোটাকে স্তিমিত করিয়া দিয়া সন্তর্পণে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

দুরন্ত ছেলেরা ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া মাতৃসোহাগের স্বপ্ন দেখুক।

প্রত্যুষের শীতল বাতাসে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শূন্য শয্যা, সুবোধ নাই। ছোট জানালা দিয়া অপরিচিত দেশের ঝিরঝিরে হাওয়া ও কোমল আলো আসিতেছে। চোখ বুজিয়া খানিক পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না। কলিকাতায় করিত। বাতায়ন-বাহিরে অন্তর্হিত উষার পেলব পদ-চিহ্ন। ঝোপ-জঙ্গলে এখনও ঘোর ঘোর লাগিয়া আছে। আম-কাঁঠালের বাগানের ফাঁকে ফাঁকে সুদূর বিস্তৃত মাঠের বুকে আলোর বন্যা। পূবদিকের আকাশ লাল টক্‌টকে ; সূর্য্য উঠিতে আর বিলম্ব নাই।

সহসা উঠানের উপর দৃষ্টি পড়িল। সাদা কাপড়ে গাছকোমর বাঁধিয়া উঠানের উপর বসিয়া সুবোধের মা গোবরজলভরা হাঁড়িটায় ন্যাতা ডুবাইয়া উঠান নিকাইতেছেন। কলিকাতার বাড়িতে এ-সময়ে একটা হৈ-চৈ উঠে। কলের জলের ছড়্ ছড়্ আওয়াজ, বালতি সরানোর শব্দ,

ঝি-চাকরের চীৎকার, সিমেণ্টের মেঝের উপর রূঢ় সম্মার্জ্জনীর কর্কশ আঘাত, ধপ ধপ করিয়া কাপড় কাচা, কচি ছেলেদের কান্না……চোখ কান বন্ধ করিয়া খানিক ঘুমাইতে ইচ্ছা করে। সে-সমস্ত থামিলে তবে তপন উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া চা খাইয়া পড়িতে বসে।

সুবোধের মা হাঁড়ি ন্যাতা লইয়া অতি নিঃশব্দে সমস্ত উঠান ও ঘরের দাওয়া নিকাইয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উঠিতেই—আম-নারিকেল গাছের ফাঁক দিয়া কোমল কিরণ আসিয়া সেই গোময়লিপ্ত উঠানের শোভা শতগুণ বাড়াইয়া দিল। পাড়াগাঁয়ের প্রভাত প্রতি গৃহস্থের ভবনে প্রতি-দিনই হয়ত এমন সুচারু অভ্যর্থনা পাইয়া থাকে।

সুবোধ গেল কোথায় ?

বিছানা হইতে নামিতেছে এমন সময় আভা ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "চা খাবেন কি ?"

তপন মৃদু আপত্তি করিল, "না, না, এ-সময়টা আর স্টোভ জ্বেলে কাজ নেই।"

আভা হাসিয়া বলিল, "আমরা স্টোভ জ্বেলে চা তৈরী করি বুঝি ? দেখুন, নারকোল পাতার রাশ পড়ে আছে। ঝাঁটার জন্য কাঠিগুলো চেঁচে নিয়ে পাতাগুলো ঝুড়ি বোঝাই করে রেখে দিই। দুধ জ্বাল, চা তৈরী—সব ওতে হয়।"

তপন জিজ্ঞাসা করিল, "সুবোধ কোথায় ?"

আভা বলিল, "বোধহয় বেরিয়েছে। বাড়ি এলেই দাদা ভোর-বেলাটায় হয় মাঠে—নয় নদীর ধারে কাটিয়ে দেয়। আজ আপনাকে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। হাতমুখ ধোবেন ? চলুন না পুকুর দেখিয়ে দিচ্ছি। না, জল এনে দেব ?"

—"না, না, পুকুরই ভাল।"

—"দাঁতন করবেন, না—মাজন দেব ?"

—"মাজনই ভাল।"

আভা পথ দেখাইয়া চলিল।

পুকুর ছোট। অন্য দেশ হইলে ডোবাই বলিত। জল বড় জোর হাঁটুভোর হইবে; গ্রীষ্মের উত্তাপে সে-টুকুও শুকাইতে আর বিলম্ব নাই। এদিকের ঘাটটি শান বাঁধানো।

গাড়ু, গামছা, মাজন চাতালের উপর গুছাইয়া রাখিয়া আভা সরিয়া গেল।

পাকা রাস্তা নাই, মিউনিসিপ্যালিটির কোন বালাই নাই।

প্রাতঃকৃত্য সুসম্পন্ন করিতে বাধ-বাধ ঠেকিবার কথা, কিন্তু উপায় কি ? কলিকাতার সুখ-সুবিধার আশা সুদূর পল্লীতে বসিয়া করিলে চলিবে কেন ? খেজুর কাঠের গুঁড়ি পড়িয়াছিল। গ্রামবাসীরা বনের মধ্যে এ ব্যবস্থাটা ভাল রকমই করিয়াছে বলিতে হইবে।

হাত মুখ ধোওয়া শেষ হইতেই আভা আসিল।

পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে কিসের একটা ঝোপ দেখাইয়া তপন বলিল, "ওটা কি ? বেশ পাতাগুলি, হাত দিতেই কাঁটা ফুটে গেল।"

আভা উত্তর দিল, "ও যে বেতগাছ, কাঁটা ত ফুটবেই।"

তপন জিজ্ঞাসা করিল, "বেত গাছ ? ওরই কি ছড়ি হয় ?"

"হাঁ, হয়ই ত। আবার ওই কচি বেতের ডগার সুক্তো এমন চমৎকার হয়!"

সুক্তো! এত বয়স হইয়াছে রসনা-পরিতৃপ্তির জন্য যে বিবিধ উপকরণ তৈয়ারী হয়, তপন তাহার কোনটাই বা জানে ? রেষ্টুরেণ্টের

কল্যাণে চপ, স্যাণ্ডউইচ, কাটলেট, ডেভিল, পুডিং, কোর্ম্মা, কারি অজানা নহে ; বাড়িতেও ভাজা, ডালনা, ঝোল নিত্যকার বন্দোবস্ত মত পাওয়া যায় ; কিন্তু স্থক্তো ?

কাল রাত্রিতে কয়েকটা অদ্ভুত তরকারি সে খাইয়াছে বটে, ভালও লাগিয়াছিল, কিন্তু কোনটা কি জিজ্ঞাসা করিতে বাধ-বাধ ঠেকিয়াছিল। যে সুবোধ ! ধানগাছের তক্তা লইয়া যখন-তখন পরিহাস করে।

স্থক্তো থাক, একগাছি ভাল বেত ছড়ির জন্য সে সংগ্রহ করিবে।

চা তৈয়ারী হইয়া গিয়াছিল। সুন্দর চা। গরুর টাটকা দুধে তৈয়ারী, রংটা চাঁপাফুলের মত হইয়াছে। সুবোধ খুব বেড়াইতেছে। এখনও ফিরিল না যে !

—"চায়ের সঙ্গে এ-সব কি আবার ?"

আভা হাসিয়া বলিল, "তা হোক, খেতে পারবেন। ও-বাড়ির রাঙা-দাদা পরশু দার্জ্জিলিং থেকে এসেছেন। কিছু কপি কড়াইশুঁটি পাঠিয়ে দিলেন। মা বললেন, ভালই হোল—ওঁদের জন্যে কচুরি শিঙ্গাড়া হবে'খন।"

তপন কচুরি মুখে দিয়া বলিল, "এত সকালে এ-সব করলে কখন ?"

—"কেন, সেই কোন ভোরে উঠে নেয়ে নিয়ে সব গুছিয়ে রেখেছিলাম যে। চা ভাল হয়নি বুঝি ?"

"চমৎকার হয়েচে। পাড়াগাঁয়ে এমন ভাল চা হয়—এ-ধারণা আমার ছিল না।"

আভা মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমরাই কি ভাল জানতাম ? দাদাই তো শিখিয়ে দিয়েচে।"

তপন কহিল, "কিন্তু সে গেল কোথায় ?"

অদূরে কাহার চীৎকার শোনা গেল।

আভা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কালি-দা আসচে। এখনই সব লণ্ডভণ্ড করে দেবে,—যে অস্থির!"

তপন হাসিতে হাসিতে কহিল, "বেচারা এক কাপ চা-ও পাবে না?"

আভা মুখ গম্ভীর করিয়া উত্তর দিল, "হুঁ, চা খায় কিনা! উল্টে এমন লেকচার ঝাড়ে। কালি-দা দু'চক্ষে শহর দেখতে পারে না।"

কালিকেশ উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "সুবোধ-দা কোথায়, জেঠাইমা? এখনও ঘুমুচ্চে বুঝি?"

আভা তাড়াতাড়ি চায়ের সরঞ্জাম গুছাইয়া অন্য দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া গেল।

কালিকেশ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "একি, তুমি একলা যে?"

তপন বলিল, "আসামী বহুক্ষণ পলাতক।"

কালিকেশ বলিল, "কাল রাত্রিতে যা বলে গিয়েছিলাম—ভুলে গেছ বুঝি? বসে—বসে—বসে কতক্ষণ কাটালাম, তোমরা এলে না! অগত্যা আমাকেই বেরুতে হলো।"

তপন বলিল, "কি একটা মজার প্ল্যান তোমার মাথায় এসেছিল না?"

কালিকেশ বিছানায় বসিয়া দ্রুতকণ্ঠে বলিল, "সব মাটি, সব মাটি! ভেবেছিলাম সূর্য্য ওঠবার আগে তোমরা যাবে, চাঁড়ালদের পোড়ো-ভিটের ওপর দাঁড়িয়ে তোমায় দেখাবো।"

তপন বলিল, "তবু বল-ই না শুনি, কি মজা?"

কালিকেশ মুখে অবজ্ঞাব্যঞ্জকধ্বনি করিয়া কহিল, "শোনা, আর দেখা! পোড়ো-ভিটের ওধারে জমিটা ঢালু হয়ে নেমে রায়দীঘির কোলে গিয়ে শেষ হয়েচে। মস্ত পুকুর, যেন নদীর টুকরো। তেমনি পুরনো, কালো মিশমিশে জল। পানফল কলমির দামে চারপাশের জলটুকু দেখবার জো নেই, কেবল মাঝখানটায় তকৃতকে জল। এমন

আশ্চর্য্য—ওই দশ বার হাত জলের মধ্যে একটুকরো দামও গজায়নি কোনদিন। পুকুরের উত্তর দক্ষিণ কোণে ঘন বেত, আসশ্যাওড়া ও চিরচিরের বন, কিন্তু পূবের মাঠ একদম খোলা। যখন প্রথম সোনার থালার মত সূর্য্য ওঠে, মাঝখানের জলটুকুতে কে যেন একখানা লাল থালা বসিয়ে দেয়। এমন সুন্দর—”, মুগ্ধ কালিকেশ কথা শেষ করিতে পারিল না।

তপন জিজ্ঞাসা করিল, “চা খাবে এক কাপ?”

কালিকেশ কি বলিতে গিয়া বলিল না, মুখখানা নামাইয়া সংক্ষিপ্ত কোমল স্বরেই উত্তর দিল, “না।”

তপনের ইচ্ছা হইল, চায়ের সম্বন্ধে তর্ক তুলিয়া কালিকেশের সঙ্গে খানিক গল্প করে। কহিল, “কেন, শরীরটা বেশ ঝরঝরে হয়ে যাবে।”

কালিকেশ হাসিয়া বলিল, “তা হয় বটে। সঙ্গে সঙ্গে ইহকাল, পরকাল।”

তপন হাসি চাপিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, “কেন, চা খাওয়া পাপ নাকি?”

কালিকেশের চক্ষু ক্ষণেকের তরে জ্বলিয়া উঠিয়া নিবিয়া গেল। ধীরস্বরে বলিল, “হয়ত পুণ্য। কিন্তু পুণ্য অর্জ্জনের শক্তি সকলের ত সমান নয়!”

তপন বলিল, “অক্ষমতার কারণ?”

কালিকেশ আর আত্মদমন করিতে পারিল না। ঈষৎ ঝাঁজালো স্বরেই বলিল, “কারণ আমরা পাড়াগাঁর লোক। সভ্যতা বুঝি না, উন্নতি বুঝি না। চায়ের পয়সায় কত দেশ ওপরে উঠে গেল, জাভার চিনিতে বাংলার কারখানা ভেঙ্গেচুরে কোথায় ভাসিয়ে দিলে—চোখ বুজে চায়ে চুমুক দিতে দিতে এ-সব কথা হয়ত কোনদিন ভাবতেও পারব না! তবু তপনবাবু, যে আগুন অন্ধকারকে উজ্জ্বল করে, সে

আগুনের তলায় কত কাঠ কয়লা যে পুড়ে ছাই হয়ে যায় এ-খবরটা রাখতে আমরা ভুলে যাই কেন? তাই ত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সব ওই চায়ের সঙ্গে ঝরঝরে হয়ে আসচে।”

কালিকেশ রাগ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

রহস্য করিতে গিয়া একি দুর্ব্বিপাক! তপন অপ্রতিভ হইয়া ভাবিতে লাগিল কালিকেশকে ডাকিবে কিনা? এমন সময় হাসিতে হাসিতে সে নিজেই ফিরিয়া আসিল।

ঘরে ঢুকিয়াই তপনের হাতে প্রবলভাবে একটা ঝাঁকুনি দিয়া বলিল, “মাপ কর ভাই। আমার একটা বদ অভ্যাস, নিজের মতটাকেই সবচেয়ে বড় মনে করি। তর্কের স্থলে ত বটেই। কৈ রে, আভা মুখপুড়ি—চায়ের আনুষঙ্গিকগুলো রাখলি কোথায়?”

রান্নাঘর হইতে উত্তর আসিল, “যাই।”

শিঙ্গারা কচুরি খাওয়া শেষ হইলে কালিকেশ বলিল, “বিশ্রী রোদ উঠলো, বেড়াতে যাবে নাকি?”

তপন বলিল, “তা হোক, বাগানের মধ্যে গাছের ছায়ায় ছায়ায়—”

কালিকেশ অকস্মাৎ উৎফুল্ল হইয়া বলিল, “তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। চল ডাব পাড়িগে।”

তপন বলিল, “গরম চায়ের পর ডাব!”

কালিকেশ সে কথায় কান না দিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল, “আভা, ওরে আভা—একখানা দা নিয়ে আয় ত। শীগ্‌গির।”

দা আসিল। কালিকেশ তপনকে লইয়া বাগানে প্রবেশ করিল।

* * *

ডাব খাওয়া শেষ করিয়া ফিরিতেই তপন দেখিল, উঠানের উপর কতকগুলি ছেলে জড়ো হইয়া জটলা করিতেছে। তাহাদের মাঝখানে

দাঁড়াইয়া হাত মুখ নাড়িয়া সুবোধ কি বুঝাইতেছে। কালিকেশ চীৎকার করিয়া ডাকিল, "সুবোধ-দা, মাছ বুঝি? খুব বড়? ক'সের হলো?"

সুবোধ কালিকেশকে ডাকিল, "এদিকে আয় ত রে,—আভা কুটতে পারচেনা, যে ভারি।"

কালিকেশ দুই লম্ফে ভিড়ের সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিল, "আভা পারে শুধু রাঁধতে আর ঘর ঝাঁট দিতে। ওঠ, আর কারদানি করতে হবে না।"

আভা উঠিয়া দাঁড়াইল। অতিপরিশ্রমে তাহার সারা মুখ-খানিতে কে যেন সিঁদূর গুলিয়া দিয়াছে, টস্ টস্ করিয়া ঘাম পড়িতেছে। অল্প হাঁপাইতেছিল বলিয়া কালিকেশের কথার কোন উত্তর দিল না।

কালিকেশ বঁটির উপর বসিয়া কৌশলী জেলের মত কান্‌কো ধরিয়া মাছটার মাথা কাটিয়া ফেলিল এবং বড় বড় কয়েকটা টুকরা করিয়া সর্ব্বশেষে আঁশ ছাড়াইতে লাগিল। মাছের তেল হইতে পিত্তটাকে আলাদা করিয়া একপাশে রাখিয়া দিল ও বড় পটকা লইয়া ছেলেদের দিকে ছুড়িয়া দিল। ছেলেরা আনন্দে কলরব করিয়া উঠিল।

মা দাওয়া হইতে বলিলেন, "কালি, বাড়িতে বলে আয়—আজ এই-খানেই খাবি। সুবোধ, ছেলেদের হাতে দু'খানা করে মাছ দিতে বল আভাকে।"

মাছকোটা শেষ করিয়া কালিকেশ বলিল, "একটু সরষের তেল দাও ত জেঠাইমা। অমনি স্নানটাও সেরে আসি।"

সুবোধ বলিল, "বেশি করেই তেল দাও, মা। আমরাও নেয়ে নিই।"

মা কাঁচের বাটিতে তেল ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন, "তপন কি পুকুরে নাইতে পারবে? নতুন জায়গার নতুন জল, সর্দ্দিটর্দ্দি লাগতে পারে।"

সুবোধ বলিল, "কেন, বেশত পুকুর। না হয় কবিরাজদের বড় পুকুরে নিয়ে যাই।"

মা বলিলেন, "তার চেয়ে—বামুন পাড়ায় নিয়ে যা ; টিউবওয়েলের জল ভাল, নেয়েও তৃপ্তি পাবে।"

আভা সাবানের বাক্স ও ধুঁধুঁলের জালি নামাইয়া দিয়া বলিল, "নাও, কালি-দা।"

কালিকেশ তপনের অলক্ষ্যে ভ্রূকুটি করিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিতে লাগিল। যেন সে-কথা শুনিতেই পায় নাই।

আভা নিঃশব্দে হাসিয়া সাবানের বাক্সটা সুবোধের হাতেই তুলিয়া দিল।

টিউবওয়েলের জল ভারি ঠাণ্ডা, বরফ দেওয়া যেন। কোথায় লাগে কলিকাতার কলের গরম জল। গায়ে ঢালিলেও মনে হয় না যে, কোন কিছুর স্পর্শ পাইতেছি। এই জল স্পর্শ করিয়া মনে হয়, সারা গ্রীষ্মের দুপুরটা ইহারই মধ্যে কাটাইয়া দিই।

কলের ও-পাশে গাছতলায় দু'টি মেয়েকে সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইতে দেখিয়া কালিকেশ বলিল, "আর নয়, ওঠ।"

পথেই একটা গাবগাছ। পাড়ার কয়েকটি ছেলে পরম উৎসাহে গাব পাড়িতেছে। কালিকেশ জানাইল, পাকা ফলগুলি খাইতে অতি চমৎকার। ছেলেবেলায় তাহারা গাবতলা ছাড়িয়া একদণ্ডও এ-দিক ও-দিক যাইত না।

ও-দিকের গাছতলায় ছেলেরা হুড়াহুড়ি করিয়া কি কুড়াইতেছে। ছোট ছোট ফুল—গাছে থলো থলো ঝুলিতেছে। খাড়া গাছ, ডাল পালা কম। উঠিবার অসুবিধা বলিয়াই কি ছেলেরা উঠিতে পারে নাই ?

তপন আঙুল দিয়া গাছ দেখাইয়া কহিল, "কি আশ্চর্য্য সুবোধ-দা, ও-গাছটায় এখনও ফল ধরেনি।"

কালিকেশ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "ওটা যে হরতুকী গাছ। পাতা আলাদা, ফলও আলাদা।"

তপন অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "আমি অত লক্ষ্য করে দেখিনি।"

কালিকেশ দৌড়াইয়া গিয়া একটা হরীতকী কুড়াইয়া আনিয়া তপনের হাতে দিয়া বলিল, "এই দেখ।"

তপন বিস্ময়ের স্বরে কহিল, "এ যে ঠিক হরতুকী! বা—রে!"

কালিকেশ কহিল, "ও-বেলা পাকা গাব খাওয়াব'খন,—তাহলে আর ফল চিনতে দেরি হবে না।"

তপন বলিল, "তোমরা দেখচি পাকা বোটানিষ্ট।"

সুবোধ বলিল, "আমরা পাড়াগাঁর ছেলে মাত্রেই বোটানিতে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট। আমাদের বাগান চেখে বেড়াতে হয় না।"

তপন বলিল, "তাত দেখচিই।"

বেলা চারটা বাজিতে না-বাজিতে কালিকেশ চঞ্চল হইয়া উঠিল, "ওহো, আজ যে কপালীপাড়ার সঙ্গে স্কুলের ম্যাচ আছে। আমাকেই গ্রাউণ্ড ম্যানেজ করতে হবে। যাবে সুবোধ-দা?"

সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল, "কটায় আরম্ভ হবে?"

কালিকেশ বলিল, "টাইম দেওয়া আছে স-পাঁচটা, কিন্তু সবাই এসে জুটতে সাড়ে পাঁচটা হবে। তপনকে নিয়ে যেয়ো কিন্তু।"

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া কহিল, "এ তোমাদের কলকাতার I. F. A. এর ক্যালক্যাটা-মোহনবাগানের চ্যারিটি ম্যাচ নয়। তা বলে তার চেয়ে কম interesting নয়।"

তপন কৌতুকভরে বলিল, "playerদের চায়ের ব্যবস্থা থাকে ত?"

কালিকেশ হাসিয়া বলিল, "দেশী মতে লেবু-নুন।"

তপন বলিল, "খেলাটা যখন এ-দেশের নয়, তখন টিফিনটা দেশী মতে না করলেই বা ক্ষতি কি ?"

সুবোধ বলিল, "যদিও দেশী খেলা অনেক রয়েচে। না, না, তর্ক তুলো না, কালি, তুই যা।"

কালিকেশ যাইতে যাইতে বলিল, "এ-তর্কের জের সন্ধ্যে বেলায় টানবো।"

কালিকেশ চলিয়া গেলে সুবোধ বলিল, "পাগল ! ওর অদ্ভুত ধারণার কথা যত শুনবে, ততই তুমি অবাক্ হবে। ও-হচ্ছে সেই দলের লোক যারা শহরের সব কিছুই মন্দ চোখে দেখে, পাড়াগাঁর দোষ যাদের চোখে পড়ে না। কালই শুনেচ ত, ওর দিদিমা মারা-যাওয়ার রাত্রিতে জল ঝড় বলে—এক প্রাণী দাহ করতে যায় নি, তত্রাচ তাদের ওপর ওর একটুও অভিযোগ নেই।"

তপন বলিল, "এ রকম অন্ধভক্তিরও একটা সার্থকতা আছে।"

সুবোধ বলিল, "ভক্তি হিসেবে হয়ত সার্থক, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে সে ভক্তির মূল্য অকিঞ্চিৎকর। অতিভক্তি আর কিছুর লক্ষণ না হোক,—অনেক সময় বিপত্তি ঘটায়।"

তপন বলিল, "তবু তার forceকে তুমি অস্বীকার করতে পার না। চুলচেরা বিচার করে কাজে নামতে গেলে শেষ অবধি হয়ত কাজ করাই ঘটে ওঠে না, কিন্তু খানিকটা আবেগ যদি তার সঙ্গে থাকে ত দুরূহ কাজও সহজ হয়ে আসে।"

সুবোধ বলিল, "লেখাপড়ায় কালিকেশ ব্রিলিয়ান্ট। সব কাজেই ওর দক্ষতা অসাধারণ। যখন মাতে, পরিপূর্ণভাবে দেহ মন প্রাণ ঢেলে দেয়। মাছকোটা রান্না থেকে স্কলারশিপ্ নিয়ে পাস করা ওর পক্ষে সমান সহজ।"

তপন বলিল, "চল ওঠাই যাক; কালিকেশের নিমন্ত্রণ রাখা দরকার। পাড়াগাঁর খেলা দেখার অভিজ্ঞতাও হবে।"

আভা ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চায়ের জল চড়াবো?"

তপন বলিল, "না। অন্তত যে কদিন এখানো থাকবো—ও পাট আর নয়।"

আভা হাসিল, "কালি-দার হাওয়া গায়ে লাগল বুঝি আপনার?"

তপন বলিল, "সত্যিই তোমার কালি-দার ওপর একটা শ্রদ্ধা জেগেচে। সেইটুকু নিয়েই এখান থেকে যাব মনে করেচি।"

সুবোধ রহস্য করিয়া বলিল, "ব্যাপারটাকে ড্রামাটিক করে তুললে যে!"

তপন হাসিয়া উত্তর দিল, "যেহেতু মানুষের জীবনের অসামান্য ঘটনা নিয়েই ড্রামার সৃষ্টি।"

খেলা আরম্ভ হইতে আধঘণ্টা বিলম্ব ছিল। প্রকাণ্ড মাঠ—লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। বন-জঙ্গলে ঢাকা গ্রামখানির জনসংখ্যা বুঝিয়া লইতে কষ্টবোধ হয় না। সেন্‌সাস্ রিপোর্টাররা এ স্থলে থাকিলে তাঁহাদের কাজটা অনেক লঘু হইতে সন্দেহ নাই!

কিন্তু কোন রিপোর্টারই ছিল না।

কেহ ছাতা পাতিয়া, কেহ গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া বসিবার আসন করিয়া লইয়াছে। আসনে বসিয়া বিড়ি টানিতে টানিতে সঙ্গীর সঙ্গে ভবিষ্যৎ-খেলার অদ্ভুত আলোচনা করিতেছে। সব নাম না জানিলেও বলা চাই। পেনালটিকে বলিতেছে পেলানটি; foulএর কি একটা দুর্ব্বোধ্য উচ্চারণ করিতেছে, শুনিলেই হাসি চাপিয়া রাখা দুষ্কর। গেলবার কোন দলের কোন লোকটি কিরূপ ডিগ্‌বাজী খাইয়া ঠ্যাং ভাঙ্গিয়াছিল, কাহারা মারামারি করিয়া মাঠের বাহিরে গিয়াও 'রোক্' করিতে ছাড়ে নাই ইত্যাদি সংবাদও তপন তাহাদের মুখে শুনিতে পাইল।

কালিকেশ ভারি ব্যস্ত। দুই পক্ষকে যথাস্থানে দাঁড় করাইয়া খেলা আরম্ভ করিবার জন্য হুইস্‌ল দিল।

টস্‌ করিয়া খেলা আরম্ভ হইল।

চারিদিকে কি চীৎকারধ্বনি। কোথায় লাগে কলিকাতার বড় ম্যাচ। Buck up, cheer up প্রভৃতি বুলিগুলি আয়ত্ব হইয়াছে, গোলের বেলাতেও সমুচ্চধ্বনি উঠিতেছে; সারা মাঠ কাঁপাইয়া সে চীৎকারধ্বনি গ্রামের ভিতর তীরবেগে প্রবেশ করিতেছে। যদি কেহ কোন বল miss করিল ত সে কি অভদ্র গালাগালির হুঙ্কার। খেলোয়াড়ের জান শক্ত না হইলে এইসব কটু গালাগালি সহ্য করিয়াও বলের পিছনে দৌড়াইবার ধৈর্য্য ও সামর্থ্য থাকিত না।

কালিকেশ শহরকে অগ্রাহ্য করিলে কি হইবে? কালস্রোতকে হাত দিয়া ঠেলিবার শক্তি মানুষের নাই। পাড়াগাঁ শহরের অভিমুখে প্রবলবেগে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে; একদিন না একদিন নাগাল পাইবেই।

বেচারা কালিকেশ!

* * *

খেলা শেষ হইল, সূর্য্যও ডুবিয়া গেল।

সুবোধ বলিল, "চল বাড়ি ফেরা যাক। কালিকেশের অপেক্ষা করতে গেলে আরও ঘণ্টাখানেক দেরি হবে।"

গ্রামের মধ্যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। বড় তেঁতুলগাছ তলাটায় ও গুল্মঘেরা আম-কাঁঠালের বাগানে—সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যপথে বর্ষাসন্ধ্যার অপ্রসন্নতা। পথ চলিতে মনে হয়, নির্জ্জন সমাধিস্তূপের উপর দিয়া চলিয়াছি। চারি-পাশের বিরাট গাম্ভীর্য্য ও আবছা অন্ধকারে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে। দুর্ভেদ্য অন্ধকারে চরাচর লুপ্ত হইয়া গেলে সে দৃশ্য—তত কটু লাগে না, কিন্তু এই আবছা স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার, ঝিঁঝিঁপোকার ডাক, উইচিংড়ার

একটানা শব্দ, শুকনো পাতার উপর ইঁদুর বা কাঠবিড়াল চলিবার খড়খড়ানি—সব মিলিয়া প্রাণে নিরানন্দের সৃষ্টি করে।

কুটীরগুলিতে সন্ধ্যার ম্লান প্রদীপ জ্বলিতে সুরু হইয়াছে, শঙ্খধ্বনিও সন্ধ্যাবন্দনা গাহিয়া উঠিল। সন্ধ্যা আসিলেন। গ্রাম্যপথ ধূলায় ভরাইয়া গরু বহুক্ষণ গৃহে ফিরিয়াছে। তাহাদের খুরের ধূলা অবিস্পষ্ট সন্ধ্যার আঁচলখানি ধূসর রঙে রাঙাইয়াছে। গোয়াল হইতে সাঁজালের ধোঁয়া উঠিয়া উপরের আকাশকে পাণ্ডুর করিয়াছে।

সুবোধের বাড়িতে সেইমাত্র সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিয়াছে। দুয়ারের চৌকাঠে গঙ্গাজল ছিটাইয়া গোয়ালের গরুগুলিকে জাব্‌না মাখিয়া দিয়া আভা বাখারির আগড়টা বন্ধ করিয়া দিল।

ও-দিকে পরিষ্কার তুলসীতলায় মাটির প্রদীপটি রাখিয়া মা গলবস্ত্রে প্রণাম করিতেছেন। প্রদীপের আলোয় মুখের যে-টুকু দেখা যায়, সে-টুকু নিষ্ঠা ও ভক্তিতে কমনীয়; প্রণাম ও প্রার্থনার গাঢ় অভিনিবেশে ধ্যানমগ্ন।

কি চাহিতেছেন তিনি? প্রতিদিনকার কর্ম্ম অন্তে ক্ষুদ্র সংসারের উন্নতিশ্রী, পুত্রকন্যার শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ। আসন্ন রাত্রির অঙ্কে সুকোমল নিদ্রায় তাহাদের জন্য একটি করিয়া মধুর স্বপ্ন।

হায়রে রাজধানীর সন্ধ্যা! গ্যাসের তাড়া খাইয়া যদি বা গৃহকোণে ভীরুর মত আশ্রয় লইতে যাও, বিজলীবাতির তীক্ষ্ণশরে পঞ্চত্ব পাইতে তোমার একটুও বিলম্ব হয় না। পথে ধূলা কোথায়? বৈকালে পাইপে জল ঢালিয়া পিচের পথ ভিজাইয়া দেয়। গৃহে গৃহে মঙ্গলশঙ্খ যদি বা বাজে—মোটরের হর্ণে, ফেরিওয়ালার চীৎকারে, মাঠপ্রত্যাগত ছেলেদের কলরবে ও কলঘরে কাপড়কাচার শব্দে সে ক্ষীণধ্বনি কোথায় ডুবিয়া যায়। ফুটবলখেলা দেখার আলোচনায় এমন ভাবে মাতিয়া থাকে যে

গ্রীষ্মের শীতল সন্ধ্যার রঙ—আকাশের প্রদোষান্ধকারে দেখিবার সৌভাগ্য কাহারও হয় না।

সভ্যতা, প্রকৃতিকে জয় করিয়া হনন করিতেছে।

মুগ্ধ তপন মনে মনে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া উঠানের উপরে নিশ্চল হইয়া সন্ধ্যার শুভ-আবির্ভাব দেখিতে লাগিল।

মা প্রণাম সারিয়া তুলসীতলার মাটি লইয়া তপন ও সুবোধের মাথায় ছোঁয়াইয়া বলিলেন, "বোস।"

সেই দাওয়ায়—সেই মাদুর। আভা অনতিবিলম্বে সেই হ্যারিকেনটা জ্বালিয়া পৈঁঠার উপর রাখিয়া দিল। দাওয়া ছুঁইয়া বুনো গাছগুলি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া, উপরে উজ্জ্বল নক্ষত্রদ্যুতি দেবদারুপত্র স্পর্শ করিয়া পুকুরজলে চিক্ চিক্ করিতেছে। গাছের শাখা দোলাইয়া বাতাসও এতক্ষণে দেখা দিল। কোলাহল নাই, আড়ম্বর নাই, চাঞ্চল্য নাই, ত্বরা নাই। শান্ত নিরীহ পল্লীর উপর আশীর্ব্বাদের স্নিগ্ধধারাটি নিঃশব্দে আকাশসীমা হইতে ধরণীপ্রান্ত পর্য্যন্ত কোমল করিয়া তুলিয়াছে।

পুরা একটি দিন পাড়াগাঁয়ে কাটিয়া গেল।

* * *

শান্ত সন্ধ্যায় বোটানিক্যাল গার্ডেনের দুঃস্মৃতি ডুবিয়াছে। ধন-ঐশ্বর্য্যের বিপুলতা ও আড়ম্বরপ্রিয়তাকে মনে হইতেছে, কাহিনী। সত্যরূপ যদি কোথাও থাকে ত এই পল্লীপ্রান্তরে,—তৃণ-লতায়, ঝোপে-জঙ্গলে, নদীতীরে, প্রভাতগোধূলিমাখা সঙ্কীর্ণ মেঠোপথে। প্রকৃত রূপ আকাশে, তারায়, চন্দ্রে ও সূর্য্যে, নিঃশব্দ মৌন অন্ধকারে, প্রখর মধ্যাহ্নে ও অতলস্পর্শ রাত্রির রহস্যলীলায়।

যান্ত্রিক শহরের যন্ত্রধ্বনিময় অবয়বে এ-সব ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য খুঁজিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র !

পর পর কয়েকটি দিন এমনই ভাবে কাটিয়া গেল। যাঁহারা বৈচিত্র্য খুঁজিতে ও সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পল্লীতে পদার্পণ করেন, পল্লীজননী তাঁহাদের সে বাসনা পরিপূর্ণ ভাবেই পূরণ করেন। বিশেষ করিয়া সেই কুটীরে যদি ভাইয়ের মত বন্ধুর সঙ্গ, মা ও ভগ্নীর স্নেহমমতা অপর্য্যাপ্ত ধারাতে জীবনকে অভিষিক্ত করে।

বর্ষাধারার সঙ্গে খানা ডোবা ভরিয়া উঠে। ভাদ্রের রৌদ্র যখন সেই ডোবার পাতা-পচা জল হইতে ঘন বাষ্প নিঃসারণ করে, জলের ধারে মশককুল নির্ব্বিঘ্ন-সংসার পাতে এবং গৃহে গৃহে ম্যালেরিয়া দেখা দেয়—তখনকার মর্ম্মন্তুদ চিত্র অঙ্কিত করিয়া শহরবাসীর আতঙ্ক সৃষ্টি করিবার কি প্রয়োজন ? কৃষককুলের নিদারুণ দুঃখ-জ্বালার ইতিহাস শুনিয়া চক্ষু অশ্রুসিক্ত করিয়াই বা লাভ কি ? অর্থের অপ্রতুলতায় যাহারা মাসের মধ্যে দশটা দিন অনশনে বা অর্দ্ধাশনে কাটায় তাহাদের কাহিনীও থাক।

সেদিন মধ্যাহ্নে আমবাগানের মধ্যে মজলিস বসিয়াছিল। বড় আমগাছতলায় খেজুরচাটাই বিছাইয়া তপন ও সুবোধ আম ছাড়াইতেছিল। আভা ছোট জলের বালতিটাতে আমগুলি ধুইয়া প্লেটে সাজাইয়া রাখিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে গল্প ও আহার দুই চলিতেছিল। এমন সময় হৈ হৈ করিয়া কালিকেশ আসিল। প্রথমটা আমের টুকরাগুলি হুড়াহুড়ি করিয়া মুখে পুরিল, পরে আভার পানে চাহিয়া কহিল, "কোন গাছের আম রে ? কে পাড়লে ?"

আভা বলিল "পাড়বে আবার কে, টুপটাপ করে আপনিই পড়চে।"

কালিকেশ হাসিয়া বলিল, "দূর! পড়া-আম কখনও ভাল লাগে? ওই বোম্বাই গাছটায় উঠে কোঁচড় ভর্ত্তি করে আনচি দাঁড়া।" বলিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল।

আভা পিছনে পিছনে নিষেধ করিতে করিতে গেল, "উঠো না, উঠো না বলচি ও গাছে।"

কালিকেশ বিস্মিতস্বরে বলিল, "কেন রে?"

আভা বলিল, "যা লাল পিঁপড়ের ঝাঁক আছে, ছ্যাঁকা ছ্যাঁকা করে ধরবে। ওই দেখছ না—গোল গোল পাতায় ঘেরা ওদের ঘর।"

কালিকেশ বলিল, "বটে! তা এতদিন বলিস নি কেন মুখপুড়ি! লাল পিঁপড়ের ডিমে যে খাসা মাছের টোপ হয়। মাছ ধরতে জান, তপন?"

তপন হাসিল। পাড়াগাঁর কোন কাজটাই বা সে জানে?

কালিকেশ বলিল, "আচ্ছা কবিরাজদের পুকুরে নিয়ে যাব কাল।" বলিতে বলিতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গাছে গিয়া উঠিল। সারি সারি লাল পিঁপড়া। লগা ছাড়া গাছে উঠিয়া আম পাড়ে কাহার সাধ্য? কিন্তু কালিকেশ বাধা গ্রাহ্যও করিল না; নিঃশব্দে উঠিতে লাগিল। মুশকিল হইল আম পাড়িবার সময়। শাখা নড়ার শব্দে ক্রুদ্ধ পিঁপড়ার দল সারি বাঁধিয়া দ্রুতবেগে কালিকেশকে আক্রমণ করিল। প্রথমটা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সে আম পাড়িতে লাগিল। পিঁপড়ার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেলে আম একটিও পাড়া হইবে না, লাভে হইতে তাহাকে ক্ষতবিক্ষত হইয়া অবতরণ করিতেই হইবে। রক্তবীজের বংশ মারিয়া শেষ করা অসম্ভব। কোঁচড় ভর্ত্তি হইলে কালিকেশ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া সুবৃহৎ এক আমের শাখা ভাঙ্গিয়া লইল এবং প্রবলবেগে চারিধারে আঘাত করিয়া লাল পিঁপড়া বধ করিতে লাগিল।

আভা ভীত হইয়া কহিল, "কর কি, কর কি, শীগ্‌গির নাম।"

কে নামিবে? নিষ্ঠুর আমোদ কালিকেশকে তখন পাইয়া বসিয়াছে। অবিশ্রান্ত শাখা সঞ্চালনে পিঁপড়াবাহিনী আজ সে ধ্বংস করিবেই। কিন্তু ক্ষুদ্র শত্রুরা মার খাইয়া একটুও দমিল না। শ্রেণীবদ্ধভাবে কালিকেশকে আক্রমণ করিল। আঘাতে আঘাতে প্রথম শাখা নিষ্পত্র হইয়াছিল, দ্বিতীয় শাখা ভাঙ্গিবার মুহূর্ত্তে কালিকেশের সারাদেহ লাল রঙে ভরিয়া গেল। শাখা ভাঙ্গা হইল না। কালিকেশ দ্রুত অবতরণ করিতে লাগিল। কোঁচড়-গ্রন্থি খুলিয়া আমগুলি মাটিতে পড়িয়া গেল ও বহু উচ্চ হইতে কালিকেশ লাফাইয়া পড়িল। আভা তখন হাসিতে হাসিতে দম বন্ধ হইবার জো। কেমন জব্দ! যেমন কথা না শুনিয়া গাছে উঠিয়াছিলে!

গা হাত মুখ ঝাড়িয়া কালিকেশ সহসা আভার সম্মুখীন হইয়া ধাঁ করিয়া তাহার গালে একটি চড় মারিয়া কহিল, "বাঁদরী মেয়ে, আর হাসবি?"

ক্রোধে আভার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। ও-ধারে তপনের সঙ্গে দাদা বসিয়া আছেন, তাঁহারাই বা কি মনে করিবেন?

সে-ও ক্রোধে মুখ ভেঙাইয়া বলিল, "বেশ করবো, হাসবো। ভারি বীরপুরুষ। পিঁপড়ে মারতে পারলেন না—যত মদ্দানী আমার ওপর।"

কালিকেশ আরও চটিয়া আভার চুলের মুঠি ধরিয়া প্রবলবেগে নাড়িয়া দিতেই আভা যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল।

ও-দিক হইতে সুবোধ হাঁক দিল, "কি রে?"

কালিকেশের ক্রোধে কে যেন জল ঢালিয়া দিল। কিন্তু আভাকে সান্ত্বনা দিবার পরিবর্ত্তে চোখ রাঙাইয়া শাসন করিল, "বুড়ো মেয়ের কান্না দেখ! ফের প্যান্‌প্যান্ করলে দেব এমন এক ঘুঁষি, দাঁতপাটি উড়ে যাবে। আমি যাচ্ছি, কিন্তু খবরদার, ফিরে এসে যদি শুনি—", বলিয়া অসমাপ্ত কথার সঙ্গে সঙ্গে বেড়া ডিঙাইয়া ও-পিঠে গিয়া পড়িল।

সুবোধ নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কালি অমন করে পালালো কেন? তুই বা কাঁদচিস কেন?"

আভা পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "ওই আমের বোঝা ওপর থেকে আমার পিঠে ফেলে দিলে, লাগে না বুঝি?"

সুবোধ বলিল, "কালির কি হলো?"

আভা হাসিয়া বলিল, "দেখচ না লাল পিঁপড়ের ঝাঁক, এমন কামড়েছে যে, লজ্জায় পালাতে পথ পেলে না। বেশ হয়েচে!" বলিয়া পরম উৎসাহে আম কুড়াইতে লাগিল।

সুবোধ হাসিয়া বলিল, "এমন পাগলও দেখিনি!"

আম কুড়ানো শেষ হইলে তিনজনে চাটাই-বিছানো গাছতলায় বসিয়া পূর্ব্ববৎ হাসি-গল্পে আমের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল।

কালিকেশ আর আসিল না।

হাসি-গল্প করিতে করিতে আভার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। কি ছেলে-মানুষ এই কালিকেশ! এখনও যেন তাহারা ছেলেবেলাকার সেই খোকা-খুকী আছে? গায়ে হাত তুলিতে এতটুকু লজ্জা বোধ হইল না। আনায়াসে সে আভাকে চড় মারিয়া বসিল! চোখ ফাটিয়া জল আসিয়াছিল। আভা যাই বুদ্ধিমতী, তাই অপ্রস্তুত না হইয়া হাসি দিয়া সব ঢাকিয়া লইয়া পিছন ফিরিয়া আম কুড়াইতে বসিয়াছিল। এত বড় অপমান আর কেহ তাহাকে করে নাই। দাঁড়াও, এমন জব্দ করিব!

জব্দ করিবার পন্থাটা মনে উঠিতেই আভার মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ঠিক হইয়াছে। চরকা সুতা একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া খদ্দরের কাপড়গুলি ট্রাঙ্কে ভরিয়া রাখিবে এবং বছর দুই পূর্ব্বের ছেঁড়া বিলাতী

শাড়িখানা পরিয়া কালিকেশের সম্মুখ দিয়া বিজয়িনীর মত চলিয়া যাইবে। ভাবিতে ভাবিতে আভা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া বাগান হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল এবং বেশ পরিবর্ত্তনে মনোনিবেশ করিল।

এদিকে বহুক্ষণ বেড়ার আসে-পাশে ঘুরিয়া কালিকেশ ভিতরে ঢুকিবার সাহস পাইল না। আভার দোষ কি? সে ত বারণ করিয়াছিল। পৌরুষ-গর্ব্বে সে-বাধা অগ্রাহ্য করিয়া কালিকেশ গাছে উঠিয়াছিল। তাহার ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। আভা হাসিয়াছিল। তাহাতে ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া কালিকেশ তাহাকে প্রহার করিয়াছে। অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে। বর্ব্বরতার চরম। কালিকেশের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, ধর, আভাই যদি কোন একটা দুঃসাহসিক কাজ করিত, সে কাজের অসাফল্যে সে কি হাসিত না? নিজের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে কে না ভালবাসে।

কালিকেশ যতই ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার অপরাধের বোঝা ভারি হইয়া অন্তরকে পীড়া দিতে লাগিল। এমনধারা একটা গোঁয়ার্ত্তুমি করা কোনমতেই উচিত হয় নাই। আভা যদি সুবোধকে সে সব কথা বলিয়া দিত ত সুবোধের কাছে সে কি মুখ দেখাইতে পারিত? কিন্তু আভা লাঞ্ছনার কথা বলে নাই, হাসিমুখে সব ঢাকিয়া লইয়াছে। বুদ্ধিমতী বটে! মনে মনে কালিকেশ অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। বেড়ার পাশ হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল, বিছানো চাটাইয়ের উপর বসিয়া হাসি-গল্পে উহারা দুপুরের অবসর-মুহূর্ত্ত জমাট করিয়া তুলিয়াছে। ওই চাটাইয়ের একপাশে তাহার যদি এতটুকু স্থান থাকিত! কিন্তু যাইবার পথ নিজের হাতেই সে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। যতক্ষণ অপরাধের স্পষ্ট একটা বুঝাপড়া না হইতেছে, ততক্ষণ ওখানে গিয়া মুখ তুলিয়া কথা কহিবার সামর্থ্যই বা তাহার কোথায়? মার্জ্জনা? দূর ছাই! একটা ছোট মেয়ের

কাছে গিয়া অপরাধীর মত মুখ নীচু করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিতে হইবে, 'না বুঝিয়া যাহা করিয়াছি, ভুলিয়া যাও। নিজগুণে ক্ষমা করিয়া—'

কালিকেশ নিঃশব্দে হাসিল। মনে মনে দিব্য নাটক গড়িতেছে—সে! অপরাধ বা ক্ষমা কোন কথাই মুখে আনিবে না, অত্যন্ত কোমল ব্যবহারে আভাকে সান্ত্বনা দিয়া সহজ-আলাপের সূত্রটি টানিয়া বাহির করিবে।

কি মুশকিল! যত গোল বাধিয়াছে আভা মুখপুড়ী ধাঁ করিয়া বাড়িয়া উঠিয়া। এই ত বছর দুই পূর্ব্বেও পেয়ারা গাছের স্বত্ব লইয়া এমন মারামারি হইয়া গিয়াছিল, যাহার চিহ্ন আভার হাঁটুতে এখনও খুঁজিলে পাওয়া যাইবে। পনেরো দিন সে শয্যাগত ছিল, জ্বরও হইয়াছিল। কালিকেশ—কৈ, অনুতপ্ত হইয়া একবারও শয্যালীনা আভাকে দেখিতে যায় নাই কিংবা দু'টা মিষ্টকথা শোনাইবার প্রয়োজনও বোধ করে নাই! বয়স বাড়িয়া সেই আভা মহিলা হইয়াছে! সেই আভার গায়ে হাত তুলিয়া কালিকেশকে আকাশ-পাতাল ভাবিতে হইতেছে!

ঐ যে আভা উঠিয়া বাড়ির মধ্যে গেল না? এই অবসর। নিভৃতে দেখা করিয়া দু'টা সান্ত্বনার বাক্য বলিলে কিছু আপমান বা লজ্জা নাই। আভার মুখ দেখিয়া মনে হয়, আজিকার দুঃখ উহার বড়ই বাজিয়াছে। এতক্ষণ হাসি-গল্পের মধ্য দিয়াও সেই থমথমে ভাবটা কাটে নাই।

পা টিপিয়া টিপিয়া কালিকেশ দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল।

জেঠাইমা বাড়ি নাই, পাশের বাড়িতে চাল তৈয়ারী করিতে গিয়াছেন। ঢেঁকির শব্দ ও চাটুয্যেদের মেজ বৌয়ের চুড়ির আওয়াজ পাওয়া যাইতেছে। কুলায় করিয়া ধান কুঁড়া ঝাড়িয়া মিহি চালগুলি পাশের ধামায় রাখিতেছেন ও কাজের অবসরে পাড়ার এ-বাড়ির ও-বাড়ির খবর লইতেছেন। জেঠাইমা পরনিন্দা পরচর্চ্চা কোনদিন ভালবাসেন না। তাই তাঁহার মৃদুকণ্ঠ কোন-দিন উচ্চগ্রামে উঠে না; নীরবে কাজ্ করিতেই তিনি ভালবাসেন।

আভাও জেঠাইমার ধাত পাইয়াছে। ভারি শান্ত লক্ষ্মী মেয়ে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেবেলাকার উদ্দাম চাঞ্চল্য ক্রমশঃ পরিমিত গাম্ভীর্য্যের রূপে…আয়ত চক্ষু ও প্রফুল্ল মুখের উপর নিপুণ শিল্পীর রেখা-সৌন্দর্য্যকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছে। অধরের হাসিটি পর্য্যন্ত মহিমাব্যঞ্জক।

আভা দুয়ার খুলিয়া বাহির হইতেই কালিকেশকে দেখিয়া চমকিত হইল ও নিজের বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া চলিতে গেল।

কালিকেশ যে-কথা বলিবে না বলিয়া ক্ষণপূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সেই কথাটাই সহসা বলিয়া ফেলিল, "আভা, আমি বুঝতে পারিনি—হঠাৎ রাগ চড়ে গেল—"

আভা মুখ ফিরাইয়া মৃদু হাসিল; বিদ্রূপ-মণ্ডিত অবজ্ঞার হাসি। শাড়ির আঁচলটা একবার দোলাইয়া পুনরায় চলিবার উপক্রম করিল।

কালিকেশ হতবুদ্ধির মত খানিকক্ষণ সেদিকে চাহিয়া বলিল, "একটা কথাও বলবিনে? আমি স্বীকার করচি—"

আভা মনে মনে অত্যন্ত খুশী হইয়া মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল, "যা অন্যায় বলে জান, তা কর কেন?"

কালিকেশ নরম সুরে বলিল, "রাগ, না চণ্ডাল। বিশেষ করে তুই যদি অত না হাসতিস্!"

আভা বলিল, "যত দোষ আমার হাসির! বাঃ, রে!" বলিয়া কালিকেশকে বিঁধিবার জন্য বলিল, "লোকের মনের ওপর জোর খাটাতে চাও, এ বড় অদ্ভুত খেয়াল তোমার। জান, সবাই তোমার তাঁবেদার নয়?"

কালিকেশ নরম সুরেই বলিল, "অত বলচিস কেন, আভা? সত্যি বলচি, তোকে মেরে অবধি আমার মনটা ভারি খচ্ খচ্ করচে। কেবলই

মনে হচ্চে বড় অন্যায় করেচি। কিন্তু কিসের যে অন্যায় ঠিক বুঝতে পারচি নে।”

আভা বিদ্রূপ করিয়া বলিল, “সে জ্ঞান তোমার এত শীঘ্র হবে এ ধারণা আমারও নেই।”

কালিকেশ কাতর দৃষ্টিতে আভার পানে চাহিল।

আভা সে দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া মুখ নামাইয়া লইল। মনে মনে সে যে আনন্দ পাইল তাহার তুলনা পৃথিবীর কোন বস্তু দিয়া পরিমাপ করা চলে না। অনতিস্ফুট যৌবনে এই পরমাশ্চর্য্য আনন্দ-অঙ্কুর বসন্তক্ষণে একদা মুকুল-পুষ্পে বিকশিত হইয়া উঠে। নির্ভরভরা আরাম, আয়নায় কলঙ্কলেশশূন্য মুখ দেখিবার মতই—কৌতুকপূর্ণ। বিশেষ করিয়া অত্যাচারীর চোখে যদি বেদনার মেদুর ছায়া ঘনাইয়া উঠে!

সেই মুহূর্ত্তে আভা সব অভিযোগ ভুলিয়া গেল। সব দ্বন্দ্ব তাহার ঘুচিল। প্রসন্ন-হাস্যে মুখ উজ্জ্বল করিয়া সে কালিকেশের সন্নিকটবর্ত্তিনী হইল। কালিকেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। যাক, আভার মনে আর এতটুকু কষ্ট নাই। পরিপূর্ণ প্রসন্ন-দৃষ্টিতে আভার পানে চাহিয়া কি বলিতে গিয়াই পুনরায় তাহার মুখে মেঘ ঘনাইয়া উঠিল। হাত তুলিয়া সে পরুষকণ্ঠে কহিল, “ও কি?”

আভা স্তব্ধ হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। সূক্ষ্ম বিলাতী বস্ত্রে দেহ ঢাকিবার দুর্নিবার লজ্জায় সে যেন মাটিতে মিশাইয়া যাইতে চাহিল। এতক্ষণ অভিমানে অন্ধ হইয়া কালিকেশকে বিঁধিতে সে এই আয়োজন করিয়াছিল, কিন্তু নিজের পানে চাহিতেই ঘৃণায় তাহার সারাদেহ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। ছি—ছি! সে করিয়াছে কি? এই কাজ শুধু কি কালিকেশেরই অপ্রিয়? অশুচিজ্ঞানে যাহা সে এতদিন স্পর্শ পর্য্যন্ত করে

নাই, আজ অন্যকে পীড়া দিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে নিজেকে সে এত নীচেয় নামাইয়া আনিয়াছে!

কালিকেশ নতমুখী আভাকে নিরুত্তর দেখিয়া তীব্রস্বরেই কহিল, "ভুল বুঝে তোমার কাছে ছুটে এসেছিলাম, আভা! ও শাস্তি তোমার পক্ষে সামান্যই।"

আশ্চর্য্য মানুষের মন। জোর করিয়া বাঁকাইতে গেলে সেই মুহূর্ত্তে সে অনমনীয় হইয়া উঠে। কালিকেশের রূঢ় স্বরে আভার লজ্জার আবরণ খণ্ডখণ্ড হইয়া ছিঁড়িয়া গেল। মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বের বিলীয়মান অভিমান—ধূম-বহ্নি লইয়া অন্তরে জ্বলিয়া উঠিল। সবেগে মুখ তুলিয়া সে কহিল, "কেন ছুটে এসেছিলে? কে বলেছিল আসতে?"

কালিকেশ ক্রোধে চক্ষু লাল করিয়া কহিল, "আমার অন্তরের মধ্যে যে মানুষ আছে—সেই বলেছিল আসতে। কিন্তু ভুল করেছিল সে। মানুষ মানুষের কাছেই ক্ষমা চাইতে পারে, অমানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়ার প্রায়শ্চিত্ত তুষানলেও হয় না।"

ক্রোধে আভার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। ক্ষোভে তাহার চোখ ফাটিয়া জলধারা গড়াইবার উপক্রম করিতেই মুখ ফিরাইয়া সে কহিল, "তুমি, তুমি, এতবড় সাহস তোমার—আমায় যা তা বলচ?"

কালিকেশ চীৎকার করিয়াই কহিল, "একশোবার বলবো, হাজারবার বলবো, লক্ষবার বলবো। তোমার মধ্যে এতটুকু মানুষের কণা নাই। তুমি এত নীচ যে—সে কথা বলতেও আমার ঘৃণা বোধ হয়!"

আভাও ধৈর্য্য হারাইয়া কহিল, "তার চেয়েও তুমি নীচ। আমার গায়ে হাত তুলতে তোমার লজ্জা করে নি!"

কালিকেশ জ্বলন্ত চক্ষু আভার পানে ন্যস্ত করিয়া গম্ভীর নির্ঘোষে কহিল, "জান, তোমার শাস্তি খুবই সামান্য হয়েছে?"

আভাও জ্ঞান হারাইয়া এক পা অগ্রসর হইয়া কহিল, "যে-টুকু বাকি আছে—দিয়ে যাও। যদি না দাও ত বুঝবো, তুমি শুধু নীচ নও, কাপুরুষ।"

আভার নির্ভীক কণ্ঠস্বর ও দাঁড়াইবার ঋজু ভঙ্গি দেখিয়া কালিকেশ ঘৃণায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে চারিদিকে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চালের বাতায় গোঁজা বেতের ছড়ি টানিয়া লইয়া দৃঢ়স্বরে সে কহিল, "ইচ্ছা করলে তা-ও পারি। কিন্তু তোমার গায়ে বেত ছোঁয়াতেও আমার লজ্জা!"

আভা পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কালিকেশ ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "বরং আমি নীচ, কাপুরুষ বা তোমার অভিধান উজোড় করে যা-কিছু কুৎসিত সম্বোধন আছে সব মাথা পেতে নিতে রাজী আছি, তবু তোমাকে শাস্তি দেওয়ার দুর্ভাগ্য যেন আমার কখনও না হয়।" বলিয়া সবেগে বেতগাছি দাওয়ার উপর ফেলিয়া কালিকেশ দৃঢ় অচঞ্চল পদেই নামিয়া গেল।

আভা আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না। সেইখানে লুটাইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

* * *

তপন সেই সময় কি প্রয়োজনে বাড়ির মধ্যে আসিতেই আভার চাপা-কান্নার শব্দে থমকিয়া দাঁড়াইল। দাওয়ার উপর পড়িয়া আভা মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে। ক্রন্দনের উচ্চ স্বর নাই, কিন্তু অসহ্য বেদনায় সারা-দেহ ফুলিয়া কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। এইমাত্র সে হাসিয়া আম ছাড়াইয়া দিতে দিতে গল্প করিতেছিল, ইহারই মধ্যে এমন কি হইল?

সান্ত্বনা দেওয়া উচিত, না নিঃশব্দে ফিরিয়া যাইবে? কি সান্ত্বনাই

বা দিবে? না জানে সে রোদনের ইতিহাস, না বা সান্ত্বনার বাণী! কোন দিন এমন বিপদে ত পড়ে নাই।

কালিকেশ এইমাত্র বাহির হইয়া গেল। গম্ভীর থমথমে মুখ, তপনকে দেখিয়াও দেখিল না। নিশ্চয়ই এমন কিছু রূঢ় ব্যবহার বা অপ্রত্যাশিত কিছু একটা ঘটিয়াছে—যাহার জন্য সদানন্দময় তরুণতরুণীর মুখে মেঘচ্ছায়া নামিয়াছে। কি এমন ব্যবহার?

অকস্মাৎ মাসকয়েক পূর্ব্বের বোটানিক্যাল গার্ডেনের কথা মনে পড়িল। তরুণ-মনে অকস্মাৎই এই মেঘ জমে। তবে কি আভাও কালিকেশকে ভালবাসে? পরস্পরকে ভাল না বাসিলে এমন একটা দুর্দ্দান্ত অভিমান ও বেদনা মনের উপর আধিপত্য করিবে কি করিয়া?

ভালবাসা না-ও হইতে পারে। যে বেদনা যে চিন্তা না ভুলিতে পারিয়া তপন আজ পল্লীপ্রবাসী—সে কি ভালবাসা? হয়ত না। একটা কামনা—লোলুপ, বেগবান্, সীমাশূন্য। যৌবন দৃপ্ত-দৃষ্টি দিয়া সব কিছু সুন্দরকেই অসামান্য দেখে এবং আয়ত্বে আনিবার জন্য প্রাণপণ করে। নমনীয়তা যৌবনের ধর্ম্ম নহে। প্রতিকূলে বীরের মত প্রসারিত বক্ষে, মুষ্টিবদ্ধ করে ও দৃঢ়পদে অগ্রসর হওয়াই তাহার ধর্ম্ম। যৌবন—লুণ্ঠন, অনধিকারপ্রবেশ, বিশৃঙ্খলতা ও আবেগের মধ্য দিয়া চলিতে ভালবাসে। শান্তি প্রত্যাশায় একটি ক্ষুদ্র নির্ব্বিঘ্ন গৃহকোণ—ও পথের কোলাহল হইতে রক্ষা পাইবার সতর্কতা যৌবনের বহু পরেই দেখা দেয়।

সুতরাং এই পাওয়ার কামনাকে ভালবাসা বলিয়া ভুল করিয়া কাব্য গড়া অনুচিত।

আভা কাঁদুক। ভালবাসা মনে করিয়া ভুলই যদি বোঝে, রাত্রির পক্ষপুটে বিশ্রাম করিলেই প্রভাতের সূর্য্য সে-বেদনা অনেকখানি লাঘব করিয়া দিবে। হাল্কা মনে সে আবার গৃহকর্ম্মে মাতিবে। একটা দাগ—

অস্পষ্ট রেখা হয়ত মনের কোণে আঁকা রহিবে এবং তাহারই চারিধারে বর্ণ-বিন্যাসে রমণীয় একখানি ছবির :মধ্যে দিনের পর দিন নির্ব্বাপিত-প্রায় কামনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া মানুষের অমরকাব্য রচিত হইতে থাকিবে। ভালবাসার কাব্য! অনমনীয় মনের বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কি বলা যায়?

তপন ফিরিয়া গিয়া সুবোধকে কোন কথা বলিল না। বরং পাছে সে বাড়ির ভিতর আসিয়া আভাকে এইভাবে আবিষ্কার করিয়া তাহার রোদন-সমাধি ভাঙ্গিয়া দেয়, সেই আশঙ্কায় তাহার হাত ধরিয়া ছায়াঘেরা আমবাগানের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে ঘুঘুর মিষ্ট স্বর মনকে উদাস করে। কোকিলের ডাকও মন্দ লাগে না; যদিও গ্রীষ্মের কোকিল চেঁচাইয়া গলা ভাঙ্গিয়াছে। আম-বাগানের ও-পারে ধূ-ধূ বিস্তীর্ণ মাঠ নদীর চড়ায় গিয়া মাথা রাখিয়াছে। ছোট ছোট ঝোপে টুনটুনি পাখীর অশ্রান্ত আলাপ—ঝর্ণার জলধারার মতই সুমিষ্ট। কিন্তু ওই রৌদ্রপীড়িত আকাশই বল, ছায়াঘেরা বনতলই বল, আর কোকিল-পাপিয়া-কুজিত নির্ঝরধ্বনিই বল কিংবা জ্যোৎস্না-রাত্রির আলোকবন্যা, উদাস মেঠো-হাওয়া ও পত্রমর্ম্মর ধ্বনির মাধুর্য্য—সমস্তই প্রকাশব্যাকুল বেদনায় মনকে কখনও বা সৌন্দর্য্যের পিপাসায়, কখনও বা শান্তির লালসায়, কখনও বা উপভোগের আলস্যে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছে। কামনা। সৃষ্টিরহস্য বা শক্তিই এই কামনা।

কিছুক্ষণ নীরবে চলিবার পর সুবোধ বলিল, "দুপুর রোদে বেড়াবার এ-খেয়াল হঠাৎ হলো কেন?"

তপন হাসিয়া অন্য প্রশ্ন করিল, "কালিকেশ তোমাদের স্বজাতীয় বুঝি?"

সুবোধ বলিল, "কেন, বল ত?"

তপন বলিল, "এমনি জিজ্ঞাসা করচি। বেশ সদানন্দময় মনখোলা ছোকরা। দেখলেই আপন করে নিতে ইচ্ছে হয়।"

সুবোধ বলিল, "হাঁ। মার ভারি ইচ্ছে ওকে আপন করে নেন। আভার সঙ্গে match করবে ভাল, কি বল?"

তপন বলিল, "বেশ ত। কাজটা শীগ্‌গির মিটিয়ে ফেল না; ভোজটা না হয় খেয়েই যাই।"

সুবোধ একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তা কি হবে?"

তপন বলিল, "কেন, ওঁদের বাড়ির আপত্তি আছে বুঝি?"

—"না।"

—"তবে?"

সুবোধ একটু ভাবিয়া বলিল, "ওর মত চঞ্চল প্রকৃতির ছেলে, বিয়ের দায়িত্ব আছে ত একটা।"

তপন হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, "বিয়ের দায়িত্ব!"

সুবোধ গম্ভীরস্বরেই বলিল, "এত বড় দায়িত্ব জীবনের কোন কাজেই নেই।"

তপন হাসিতে হাসিতে বলিল, "বল কি? তবে ত বিয়ে সাংঘাতিক দেখচি!"

সুবোধ সে-কথায় কান না দিয়া বলিল, "কিন্তু সে জন্যও নয়। দায়িত্ব-বোধ ও-সব বিষয়ে হয়ত আপনিই জন্মায়। অবস্থা ওদের ভাল, ছেলেও ভাল। সম্বন্ধ সবদিক দিয়ে কাম্য হলেও—"

তপন ছেদ টানিল, "কোন আপত্তিই উঠতে পারে না।"

সুবোধ বলিল, "পারে। আভার দিক দিয়ে। তুমি দেখেচ, কালিকেশ অসম্ভব রকমের পল্লীভক্ত। পল্লীর জন্য পারে না—এমন কাজ বোধ-করি পৃথিবীতে নেই। সেই জন্যই আমার ভয় বেশি।"

তপন বলিল, "অদ্ভুত ভয় তোমার, সুবোধ-দা!"

সুবোধ বলিল, "অদ্ভুত নয়, অত্যন্ত স্বাভাবিক। ওই ভক্তির তলায় নির্ভীক যে প্রাণ—তা জলে-ডোবা পদ্মপত্রের মতই জলশূন্য। ও প্রাণের আগুন শুধু ওরই মধ্যে জ্বলচে না, যে-কেউ ওর সংস্পর্শে আসে তাকেই পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। সে দাহন সহ্য করবার শক্তি—আভার আছে কিনা জানি না।

তপন বলিল, "তুমি যা বলচ—রাজরোষে পড়ে—"

সুবোধ বলিল, "খুবই সম্ভব, তপন। ওই সব চঞ্চল কলঙ্কলেশশূন্য চরিত্রবান ছেলেরা প্রাণের মায়া-মমতা রাখে না। আমি অনেককে দেখেচি। ওদের কেউ বলে নির্ব্বোধ, কেউ বা করেন প্রশংসা।"

তপন বলিল, "তুমি কি বল? আমি ত ও-সব জঘন্য উত্তেজকদের নাম দিয়েচি—কাপুরুষ।"

সুবোধ তপনের পানে চাহিয়া মৃদু হাসিল। বলিল, "ওদের কোন কিছু আখ্যা দিয়ে বাঁধতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। ওরা যা—ওরা তাই। আকাশকে লতাপাতায় সাজালে তার সৌন্দর্য্য বাড়ে না। কিন্তু কথা হচ্চে এই, আভা যদি হঠাৎ shock পায়? কালিকেশও হয়ত রাজী হবে না।"

তপন বলিল, "বিবাহের সত্যিকার দায়িত্ব যদি থাকে, একটু আগে তুমিই বলেচ, ওর পত্নীভক্তির মূলে সঞ্চয়ী-মনের আবির্ভাব হবেই।

সুবোধ বলিল, "তুমি জান না কালিকেশকে তাই ও-কথা বলচো। উন্নত ভবিষ্যৎ, এক কথায়—কলেজের পড়া ছেড়ে দিলে। বাপ তাড়না করলেন, বাড়ি ছেড়ে পালালো। বার দুই জেলও খেটেচে।" একটু থামিয়া বলিল, "যাই হোক, তুমি কি বল? এ বিবাহ হওয়া উচিত?"

তপন ভাবনায় পড়িল।

এই মাত্র দাওয়ায় অবলুণ্ঠিত আভার রুদ্ধ রোদনধ্বনি শুনিয়া আসিয়াছে। সে যদি কামনা হয়, যদি ভালবাসা না-ই হয়, তথাপি এই মিলন অবাঞ্ছিত বলিয়া ঘোষণা করিবার কণ্ঠের জোর তাহার কোথায় ?

দ্বিধায় পড়িয়া সে কহিল, "আমার মতে এ-সব বিষয়ে মেয়েদের মত নেওয়া দরকার।"

স্থবোধ বলিল, "হাঁ, আভার মত একটা নিতে হবে বৈকি। ও-সব বিষয়ে গুরুজনদের উপর সব ভার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়াকে আমি শিষ্ট, শান্ত, নিরীহ ও ভক্ত সন্তানের কর্ত্তব্য মনে করি না।"

তপন হাসিয়া বলিল, "যেন বিবাহের অঘটন তোমার উপর একদা পীড়নের মত চেপে বসেছিল !"

স্থবোধ তপনের হাসিতে যোগ না দিয়া পথপ্রান্তস্থিত কালকাস্থন্দার ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া ঝোপের উপর বারকয়েক আঘাত করিয়া কহিল, "চল, ফেরা যাক।"

ফিরিবার ইচ্ছা তপনের ছিল না। আভা হয়ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বসিয়াছে ও গৃহকর্ম্মও করিতেছে। কিন্তু মনের মাঝে যে-বেদনা ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে, সে-বেদনার অনেকখানি যেন তপনেরও।

বোটানিক্যাল গার্ডেনের পিক্‌নিক্ পার্টি। নাঃ, তপনের অন্তরে এই অনুভূতি এমন সজাগ ও তীক্ষ্ণতর হইয়াছে যে, বছরখানেক বাদে ভালবাসা আখ্যাও দেওয়া চলিবে !

কালিকেশের বাড়ির পথে আসিয়া পড়িতেই স্থবোধ বলিল, "চল দেখে আসি, কালিটা কি করচে।"

উঠানে বেতের মোড়ার উপর বসিয়া সৌম্যদর্শন এক বৃদ্ধ কাটারি দিয়া বাকারি চাঁচিতেছিলেন। স্থবোধ প্রণাম করিতেই অদূরে-পতিত সেগুনকাঠের গুঁড়িটা দেখাইয়া কহিলেন, "বোস। এটি ?"

—"আমার বন্ধু। কালি কোথায়, কাকাবাবু?"

বৃদ্ধ একটু আশ্চর্য্য হইয়াই কহিলেন, "তোমায় বলে যায় নি? আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় ছিলি এতক্ষণ? বললে—সুবোধ-দার বাড়ি। সে যে এইমাত্র সুটকেশ হাতে করে বাগেরহাটে চলে গেল।"

—"সেখানে—কি জন্যে?"

—"কি জানি—তাদের কি মিটিং আছে। বললে, শীগ্‌গির না-ও ফিরতে পারি।"

—"আপনি যেতে দিলেন কেন, কাকাবাবু?"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, "চাণক্যের নীতি আমি মেনে চলি, সুবোধ। লোকে বলে, সে মন্দ ছেলে, সে হুজুগে। আমি জানি, তার মত বাধ্য ছেলে আমার একটিও নাই। সে যা ভাল মনে করে—তার ওপর বাধা দেবার যুক্তি আমি খুঁজে পাই নে।"

সুবোধ বলিল, "লোকে বলে, আপনি তাকে বেশি ভালবাসেন।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "হয় ত বাসি। তার দাদারা সংসার পেয়েচে, উপার্জ্জন করচে। তাদের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তারা আজ সুখী। কিন্তু কালিকে দেখে মনে হয়, সংসারের সুখ ভোগ করবার জন্য ও জন্মায়নি। তোমার বোনের সঙ্গে ওর বিয়ে দেবার কথা উঠেছিল, আমি রাজী হইনি।"

সুবোধ বলিল, "বিয়ে দিলে একটা দায়িত্ব হয়ত—"

বৃদ্ধ বলিলেন, "কিছু না। লাভে হতে মেয়েটা আজীবন জ্বলেপুড়ে মরবে।"

সুবোধ বলিল, "আপনারও ত কম কষ্ট নয়, কাকাবাবু?"

বৃদ্ধ হাসিলেন, "কষ্ট! না, এখন আর কষ্টবোধ হয় না। আমি সইতে পারি।" বলিয়া বাখারির উপর দ্রুত দা চালাইতে লাগিলেন।

সুবোধ আর কোন কথা না বলিয়া বাহিরে আসিল।

তপন জিজ্ঞাসা করিল, "কালি ফিরবে কবে ?"

সুবোধ বলিল, "কালও ফিরতে পারে, দু'বছর বাদেও ফিরতে পারে, কিংবা না-ও ফিরতে পারে।"

তপন সবিস্ময়ে বলিল, "বল কি ? তার এত ভালবাসার গ্রাম—"

সুবোধ বলিল, "এ গ্রাম ত তার পিছনে পিছনে গেছে। তার ভালবাসায়, যেখানে সে থাকবে, সেইখানেই স্বর্গ সে গড়ে তুলতে পারবে।"

তপন বলিল, "তোমারও আজ উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি।"

সুবোধ বলিল, "দেখলে ত তার বাপের নির্ব্বিকার ভাব। ছেলে গেছে সে চিন্তাই যেন নেই, আপন মনে বাকারি চাঁচছেন।"

তপন বলিল, "তা ত দেখলুম, কিন্তু—"

সুবোধ বলিল, "ওই কাজের অন্তরালে বুড়োর স্নেহময় অন্তরখানি আমি দেখতে পেলাম। যে ছেলে যত অক্ষম, যত বঞ্চিত, তার ওপর বাবা মার স্নেহ তত বেশি।"

তপন প্রশ্ন করিল, "কিন্তু কালিকেশ অক্ষম কিসে ?"

সুবোধ বলিল, "সংসারী মানুষ আমরা, সংসার দিয়েই বিচার করি। যে সংসারকে আয়ত্ব করতে পারলে না, তার জীবনকে আমরা বৃথা বলে ধরে নিই।"

তপন বলিল, "সংসারকে আয়ত্ব করবার কি পন্থা ?"

সুবোধ বলিল, "কেন, উপার্জ্জন করতে শিখে বিয়ে করা। তারপর পুত্রকন্যা নিয়ে দিব্যি জাঁকিয়ে বসা। কলহ-কোলাহলের মাঝে চোখ বুজে ঝাঁপ খাওয়া আর কি !"

তপন বলিল, "শতকরা নিরানব্বইজন এই শান্তির উপাসক, একে তুমি কোলাহল বলতেই পার না।"

সুবোধ বলিল, "সমুদ্রের সব চেয়ে বড় ঢেউটা মাঝে মাঝে বিপ্লব

বাধায় বেশি। মনে হয়, সে-ই যত কিছু শান্তি ডাকাতের মত লুটে নিতে জন্মেছে। কিন্তু নৌকোয় করে যারা ছোট ঢেউয়ের উপর দিয়ে চলে যায় তারা জানে, যথার্থ কোলাহল কোনখানে।”

তপন কোন কথা কহিল না। সে ভাবিতেছিল আভার কথা। অতঃপর আভা করিবে কি? শতকরা নিরানব্বইজনের পন্থানুসরণ, না বিপ্লবী বড় ঢেউয়ের পানে চাহিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন? শ্রদ্ধা কথাটা ভাল, কিন্তু চিরজীবন শুধু শ্রদ্ধা বহিয়া নিঃসঙ্গ জীবন কাটানোর কোন অর্থ হয় না।

অপরাহ্ণ আগতপ্রায়। পুকুরধারে আসিতেই তপন দেখিল, একরাশ বাসন লইয়া আভা পুকুরের রানায় বসিয়া ঘস্ ঘস্ করিয়া মাজিতেছে। ওই শব্দ যেন সান্ত্বনা। রূঢ় কর্কশ শব্দ—সমস্ত মনোযোগকে সচকিত করিয়া কর্ম্মের পানেই টানিতেছে। অন্যদিকে তাকাইবার জো কি? নতমুখে বাসনের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বালি ও পাতা দিয়া তলা-উপর ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মাজিতে পরিশ্রম বড় কম হয় না। আভার গৌর ললাট বাহিয়া ঘাম ঝরিতেছে, পরিশ্রান্ত মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। তা উঠুক, ক্ষণপূর্ব্বের দুঃখ-বেদনা এই নিপুণ কর্ম্মের আঘাতে ধুইয়া মুছিয়া যাইবে। আভা শান্তি পাইবে।

* * *

পরদিন।

দাঁতন করিতে করিতে তপন একাই উত্তর-মাঠের প্রায় অর্দ্ধেকটা অতিক্রম করিয়াছে, এমন সময় পিছন হইতে ডাক আসিল। মাঠের যেখানটা বেড়া দিয়া ঘেরা, তাহারই সন্নিকটে আলের উপর বসিয়া

এক ব্যক্তি থেলো হুঁকায় তামাক টানিতে টানিতে মজুর দিয়া বেগুন চারা পোঁতাইতেছিলেন। তপন তাঁহাকে না চিনিলেও তাঁহার ডাকে ফিরিল।

অপরিচিত আপ্যায়িত করিয়া কহিলেন, "বোস। সুবোধের বন্ধু ত তুমি?"

বসিবার আসন না দেখিয়া তপন কহিল, "বেশ দাঁড়িয়েই আছি, বলুন কি বলবেন?"

লোকটি নিবস্ত হুঁকাটা ভড়ভড় করিয়া টানিয়া কহিলেন, "দেখেচ একবার দেবতার আক্কেল? সারা জষ্টিতে একফোঁটা বর্ষালে না। জল্‌দি বেগুনচারায় জল ঢালতে গেলেই ত খাওয়াবে আমায় বেগুন! রোজ একটা জনের খরচ ত।"

তপন উত্তর দিল না। এ সব বাজে আলোচনার চেয়ে সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্বে ছায়াময় মাঠটি যদি সে অতিক্রম করিতে পারিত!

লোকটি প্রসঙ্গান্তরে আসিলেন, "সুবোধ ছোকরা ভারি ভাল। থাকে বিদেশে, বাড়ি আসতেই পায় না। এমন দেশ যদি প্রাণ ভরে না-ই দেখলে···কেমন লাগচে পাড়াগাঁ?"

তপন সংক্ষেপে বলিল, "ভাল।"

—"হুঁ—হুঁ, বলতেই হবে। সেবার ম্যাজিস্টেট-সাহেব টুরে এসে বলেছিলেন, সারা বাংলায় এমন গাঁ একখানিও আমার চোখে পড়ে নি। পড়বে কোত্থেকে? তিন দিকে এমন নদী কোন গাঁয়ের? অসুখ বিসুখ নেই বল্লেই চলে। উঁ-হু-হু অত ঘেঁষাঘেঁষি নয়; ঠিক ওই বাকারির মাপে এক হাত অন্তর।"

বেগুনচারার নির্দ্দেশ করিয়া তিনি তপনের দিকে মনোযোগ দিলেন, "হাঁ, যা বলছিলাম, সুবোধ ছোকরা ত থাকে বিদেশে, দেশের কোন খবরই

রাখে না। এমন কি বাড়ির খবর পর্য্যন্ত না। এই গাঁয়ে কতকগুলো হাড়বকাটে ছেলে জুটেচে, তারা আবার সমিতি গড়েচে, নাকি পাড়াগাঁর উন্নতি করবে! ছাই করবে। লাভে হতে দেখি কতকগুলো বনেদী ঘর উচ্ছন্ন দেবার মতলব। চরকা চালাও, খদ্দর পর, পুকুর কাটাও, বন সাফ্ কর—এই সব ধুয়ো। আরে, সেবার আমার পিতমোর আমলের বড় পুকুরটাই দিলে মাটি করে। যেই পানা তোলা, ব্যস্! পরের বোশেখে পুকুর শুকিয়ে আধখানা! আরে, তা হবে কেন? খোদার ওপর কি খোদকারি চলে!"

কতক্ষণ বক্তৃতা চলিত বলা যায় না। নিবন্ত হুঁকাটায় বহুক্ষণ হইতেই ধুম উদ্গীরণ হইতেছিল না; ক্লান্ত ওষ্ঠকে বিশ্রাম দিয়া তিনি হুঁকাটি বেড়া ঠেস দিয়া রাখিলেন ও কাঁধের গামছা দিয়া হাতমুখ মুছিয়া পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "হাঁ, ওই বয়াটের দল কত মেয়ে-ছেলেকে যে ভুজুং লাগিয়েচে তা কি আর বলবো। কালিকেশটা দলের চাঁই। দেখতে এক ফোঁটা হলে হবে কি, কথা খুব চ্যাটাং চ্যাটাং। বাপের দু'দশ বিঘে আছে কি না, তারই রস। বুঝলে, এই স্থবোধের বাড়ি দহরম-মহরম ওর খুব বেশি। হাজার হোক, ঘরে আইবুড়ো মেয়ে রয়েচে—তুই সোমত্ত ছেলে—"

তপন অসহিষ্ণুস্বরে বলিল, "রোদ উঠলো, আমি চলি।"

তিনি ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "সবটা শোনই-না। মেয়েমানুষের মন ত! ভিজতে কতক্ষণ। লোকের মুখে কত কথাই শুনি; কেউ বলে ওদের বিয়ে হবে, কেউ বলে—"

তপন ততক্ষণে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। লোকটিও তাহার পিছু পিছু চলিতেছেন। ভাল বিপদ যাহোক! ভদ্রতার এমন নিদর্শন শহরের ইতিহাসে সত্যই দুর্লভ।

লোকটি বক্‌বক্‌ করিতেছিলেন, "তাই বলচি, বেশিদিন ওখানে থাকা ঠিক নয়। একটা বদনাম ত!—আভাটা শুনতে পাই—"

তপন আর কিছু না বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইল। মাঠের সীমা পার হইয়া পিছনে দেখিল, অদূরে দাঁড়াইয়া লোকটি তাহারই পানে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিয়াছে। পাগল মনে করিল নাকি? তা করুক। সে-বিষ কণ্ঠস্থ করিবার শক্তি তপনের ছিল না। দূর ছাই, এমন সুন্দর প্রভাতকে ওই নির্ম্মম লোকটা যেন অকস্মাৎ গলা টিপিয়া মারিয়াছে। ইহাদের জন্য কেন যে ফাঁসিকাঠের ব্যবস্থা হয় না—তাহা সে ভাবিয়াই পাইল না।

বিন্দু বিষও ক্রিয়াশীল। কথাটার রেশ তপনের মনে লাগিয়াই রহিল। কালিকেশ ও আভার নামে অনেক কিছুই কল্পনা-জল্পনা চলিতেছে। গ্রামের লোকও সে-সব কথা জানে। কাল আভার নিঃশব্দ-রোদনের মধ্যে যে সূক্ষ্ম কারণ-পরম্পরা তপনের চিত্তে তরঙ্গ তুলিয়াছিল, আজ বাতাস লাগিয়া সে তরঙ্গে মর্ম্মরধ্বনি উঠিল।

আভা এবং কালিকেশ দু'জনই চায়—দু'জনকে। বাড়ির লোক বিবাহের অনুকূলে, তবু তাহাদের বন্ধন নাই। কালিকেশ চঞ্চল দুর্দ্দান্ত বালক—জানে না, এ-কামনার পরিণাম কি? সে খেলা ভাবিয়া হৃদয়-বিনিময় করিয়াছে, খেলার ছলেই আভাকে আঘাত দিয়াছে এবং খেলার নেশায়ই হয়ত দেশত্যাগ করিল। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখিল না—এ-খেলার মূল্যে অপরের কতখানি ক্ষতি হইবে। কালিকেশের গৃহে যদি আভার স্থান না হয় ত এই গ্রামের বিষ কণ্ঠে ধরিয়া অচিরেই তাহাকে শুকাইয়া যাইতে হইবে।

* * *

দুপুরে সুবোধদের বাগানের জামগাছ দু'টিতে গ্রামের যত ছেলে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরিয়া কাঁধে গামছা বা ছেঁড়া ন্যাকড়ার ঝুলি ঝোলাইয়া তালগাছের মত উঁচু জামগাছে পা জড়াইয়া জড়াইয়া তাহারা টপ্ টপ্ করিয়া উঠিয়া গেল। অদ্ভুত ক্ষিপ্র গতি। যাহারা নিতান্ত শিশু বা যাহারা উঠিতে পারিল না—তাহারা চীৎকার করিয়া জাম ফেলিয়া দিবার জন্য মিনতি করিতে লাগিল। জাম পড়িল ত নীচেয় মারামারি গালাগালি জমিয়া উঠিল। এই হাসি, এই কান্না, চটাপট চড় ও চড়বড় করিয়া জাম-পড়ার শব্দ মিলিয়া তপনের তন্দ্রাটুকু টুটাইয়া দিল। জানালা খুলিয়া সে ছেলেদের জাম-পাড়া দেখিতে লাগিল। এমন জাম নাকি গাঁয়ের কোন গাছে নাই, তাই লোভীর দল প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে পঙ্গপালের মত গাছ দু'টিকে আক্রমণ করে। দিন পনেরো ধরিয়া চলে উহাদের ওই উল্লাস-উৎসব। তারপর জাম ফুরাইয়া গেলে ভগ্নশাখা রিক্তপত্র গাছের পানে কেহ ফিরিয়াও চাহে না।

গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে জাম-পাড়ার কলরবটুকুও কি বিচিত্র! এমন আনন্দ সারা বৎসরের মধ্যে কমই খুঁজিয়া মেলে!

জাম পাড়া হইয়া গেলে ছেলেরা গাছ হইতে নামিল। সমাগত সকলকে ঝুলি হইতে জাম বাহির করিয়া ভাগ করিয়া দিল। হিসাবহীন অবোধেরা ফরসা কাপড়ে জামের দাগ লাগাইয়া পরম আনন্দে ফল ভক্ষণ করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে জিভ বাহির করিয়া দেখাইতে লাগিল, কতটা নীল হইয়াছে।

তপনকে জানালা দিয়া এইদিক পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া উহারই মধ্যে বড় ছেলে দু'টি আগাইয়া আসিয়া বলিল, "খাবেন?"

তপন হাত পাতিয়া জাম লইল ও খেমু দিয়া বলিল, "বাঃ, সুন্দর ত!"

একটি ছেলে বলিল, "যদি বৃষ্টি হতো ত দেখতেন—এইসা ডব্বা ডব্বা হতো। সুবোধ-দাদের বাগানের মত জাম এ-গাঁয়ে আর নেই।"

গ্রামের কোথায় কি ভাল ফল পাওয়া যায় সে সংবাদও ইহারা তপনকে শুনাইতে ভুলিল না।

কাঁচামিঠে আম ভাদুড়ীদের বাগানে যেমন হয়, তেমন বড় ও মিষ্ট—কোন বাগানেই নাই। বৈঁচিফল কদমতলার ডোবার ধারে অপর্য্যাপ্ত ফলে। জামরুল মুখুয্যেদের উঠানের গাছের মত লাল ও মিষ্ট আর কোথাও নাই; লিচুও উহাদের চমৎকার। কিন্তু লাঠিহাতে মুখুয্যে-বুড়া দিনভোর উঠানের ছায়ায় বসিয়া তামাক খান। রাত্রিতে পাছে বাদুড় পড়ে বলিয়া শামুকের খোলা গাছে টাঙাইয়া দিয়াছেন, বাদুড় পড়িলে কিংবা দড়ি ধরিয়া টানিলে খড়খড় করিয়া শব্দ হয়; বাদুড় গাছে বসে না। মুখুয্যে-বুড়া রাত্রিতেও কম ঘুমান। বাদুড় ত আছেই, ছেলেদের উৎপাতও কম নহে। পাকা ভাল আম প্রায় প্রত্যেক বাগানেই ফলে। ছেলেরা প্রত্যেক ভাল আমের নাম ও পাকিবার সময় পর্য্যন্ত বলিতে পারে। শীত শেষ হইলে গাবফল। জেলে পাড়াতেই গাবগাছ বেশি, পাড়িতে গেলে তাড়া খাইতে হয়। তবু পাড়িতে তাহারা কসুর করে না। গোলাপজামের ভাল গাছ কোথাও নাই; ছেলেরা ও-ফলটা খুব পছন্দও করে না। তার চেয়ে কালোজাম ঢের ভাল।

কাম্‌রাঙা বা কয়েৎবেলের জন্য তাহাদের তাড়া খাইতে হয় না, পথের ধারে যেখানে-সেখানে গাছ। পাড়িয়া খাও—কেহ কিছু বলিবে না, এক অভিভাবক ছাড়া। তাঁহারা ছেলেদের ওই সব খাইতে দেখিলেই পীড়ার ভয়ে শঙ্কিত হইয়া উঠেন। পেয়ারার ভালমন্দ নাই। ডাঁসা পেয়ারা চিবাইতে যা আরাম! আর একটি লোভনীয় জিনিষ কুল।

কিন্তু মাঠের ধারে পাতা ঢাকিয়া ঝুড়ি ঝুড়ি যে কুল পাকিয়া থাকে, সে কুল নহে, গৃহস্থের উঠানের সযত্ন-রোপিত গাছগুলির উপরেই উহাদের লোভ বেশি। ঢিল মারিলেই চড়বড় করিয়া পড়ে। ওদিকে গৃহস্থের গালাগালি আরম্ভ হয়, এদিকে কুল কুড়াইবার ধুম! যেমন গৃহস্থ তাড়াইয়া আসেন, অমনই কে কোথায় দে ছুট্‌। আবার অসাবধান-মুহূর্ত্তে বৃক্ষ আক্রমণ। খেলা ও খাওয়া দু'য়ের আমোদই আছে। তাহাদের লোভ নাই—কলায়, আনারসে, পেঁপেয় বা কাঁঠালে। ও-সব জিনিষ টাট্‌কা পাড়িয়া খাইবার সুবিধা নাই। চুরি না করিলে, গাল না খাইলে খাওয়ার অর্দ্ধেক আনন্দ মাটি। মাঠের ধারে তরমুজ, শসা বা ফুটি খাইতে গিয়া যেদিন ধরা পড়িবার মত হয়, সেদিনকার গল্পই বেশি রোমাঞ্চকর। পুকুরের মাছধরা হইতে আরম্ভ করিয়া খেজুরের ভাঁড় নামাইয়া রস চুরি-করার মধ্যে যে বীরত্ব, জার্ম্মাণ-যুদ্ধ জয়ে মিত্রপক্ষ সেরূপ গৌরব পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ! সে বীরত্ব ওয়াটার্লুর যুদ্ধেও ছিল না, পোর্টআর্থারের পতনেও না! যখন কোথাও কিছু না থাকে নদীর ধারে কসাড় বন ভাঙ্গিয়া তাহারা চিবাইতে থাকে। 'নটা' নাকি আকের মতই মিষ্ট। পুকুরজলে পান-ফল তোলাতে বিপদ আছে, মাঝে মাঝে সাপ দেখা দেয়। সে অবশ্য জল-ঢোঁড়া। পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা দাঁড়স, হেলে বা জলঢোঁড়া দেখিয়া ডরায় না। লেজ ধরিয়া খানিক বন্‌ বন্‌ করিয়া হয়ত ঘুরাইয়াই দিল! লিচু থাকিতেও নোনা ও ধলা-আঁকড়ার ফল (ছাড়াইলে লিচুর মত শাঁস পাওয়া যায়) তাহারা খাইতে কসুর করে না। বেল ত গাছের তলায় গড়াগড়ি যায়। বাতাবী লেবুর বাল্যাবস্থায় দিব্য ফুটবল খেলা হয়, পাকাও অবশ্য ভাল—কিন্তু কাঁচার মত আমোদ তাহাতে নাই।

তপন দু'কান ভরিয়া শুনিতেছিল। যেখানে এত বৈচিত্র্য, সেখানে না থাকিয়া মানুষ শহরে ছোটে কেন? কিসের লোভে? ট্রাম-বাসের

ঘর্ঘরধ্বনি শুনিবার জন্য ? মিলের চিমনির গাঢ় ধোঁয়া বাতাসের সঙ্গে বুকে পুরিবার জন্য ? না, প্রমোদ-উল্লাসে মনকে পঙ্কিল করিয়া তুলিতে ?

তপন বাল্যকালের সীমা ছাড়াইলেও বহুদিন-পরিত্যক্ত শৈশবের স্মৃতি তার সারা অন্তরে উষ্ণতায় ভরিয়া আছে। পল্লীর এই অসীম ঐশ্বর্য্য, বঞ্চিত বলিয়াই হয়ত বেশি করিয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিতেছে। মনে হইতেছে, যৌবনকে এই বিছানার উপর শোয়াইয়া রাখিয়া খানিক মাঠে-বনে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। জাম পাড়িয়া, আম কুড়াইয়া, ঝগড়া করিয়া, হাসিয়া, হাঁপাইয়া—শ্রান্ত ক্লান্ত হয়। তারপর নদীর জলে পা ডুবাইয়া বাঁশের বাঁশীতে রাগিণীঝঙ্কার তুলে। রাত্রি ৯টা বাজিতে না-বাজিতে এই-সব দুরন্ত শিশু ঘুমাইয়া পড়ে। সারারাত্রি পরম নিশ্চিন্তে সুনিদ্রা। অমনই গাঢ় গভীর নিদ্রা যদি তপনের আসিত ! তা নহে ; পড়ার ভাবনা, পাসের ভাবনা ; এই সব ভাবনার মাঝে মাঝে আরও এক রঙীন ভাবনা। জীবন বাসনাময় হইয়া উঠিতেছে। সে সংসার পাতিতে চাহে, সঙ্গিনী খোঁজে—সুখ খোঁজে। সে কল্পনায় বিশ্বজয় করিতে ভালবাসে, সে দুর্দ্দম হইয়া উঠে ; বিক্ষোভে অন্তরকে উত্তাল করিয়া তুলে। অন্যান্য সুন্দর দৃশ্যের মত শৈশবের ছেলেমানুষিও—কামনায় বর্ণবিন্যাস করে। অতীত মানুষের কাছে তখনই লোভনীয় হইয়া উঠে, বর্ত্তমানের বক্ষে যখন সে স্থানসংগ্রহ না করিতে পারে। যাহার বর্ত্তমান সুন্দর, তাহার কাছে অতীত—বিলীন।

কাল দুপুর হইতে আভার মুখের হাসিটি লুপ্ত হইয়াছে। সে বেচারি বর্ত্তমানকে হারাইয়াছে। হারাইয়া অতীতের স্মৃতি ধ্যান করিতেছে। তাই মনের মেঘ তাহার—আড়ম্বরপূর্ণ। কালিকেশ গাঁ ছাড়িয়াছে, আভাকে আঘাত দিয়াছে ; সে না ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত এ-মেঘ কাটিবে না। কিন্তু সে আসিয়াই বা করিবে কি ? সেই দুর্দ্দান্ত উচ্ছৃঙ্খল-

প্রকৃতির সঙ্গে আভার শান্ত জীবনধারাটি কোনমতেই মিলিতে পারে না। কালিকেশের বাবা ঠিকই বলিয়াছেন,—বিবাহ তাহার না করাই ভাল।

কালিকেশের জীবনে কোন দায়িত্ব নাই। আজ সকালে যে-কথা শুনিয়া আসিয়াছে—গ্রামের মধ্যে কুৎসিত আন্দোলন। তবু কালিকেশ এই গ্রামকে ভালবাসে! ক্ষমা করিবার সহিষ্ণুতা তাহার প্রচুর। হয় সে উদার কিংবা নির্ব্বোধ। অন্ধ-ভালবাসাই সে বাসিতে পারে, মানুষ চিনিবার শক্তি নাই। তা না থাকুক, কালিকেশের এই অন্ধ-ভালবাসার পায়ে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য না দিয়া পারা যায় না।

বিচিত্র কালিকেশ! কুলকুমারীর সম্ভ্রম বিপন্ন করিয়া, লোকের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ হাসির বর্ম্মে ব্যর্থ করিয়া—সরল শিশুটির মতই নির্ভয়ে পথে পথে বিচরণ করিতেছে। সেই নিষ্পাপ কালো দীর্ঘপক্ষ্মাবৃত চোখে কপটতার লেশমাত্র নাই; পাতলা ঠোঁটের রেখায় নির্ম্মল হাসিটি। উদার ললাট ও নাতিদীর্ঘ চিবুকের মধ্যে ঈষৎ মোটা নাসিকাটি দৃঢ়চিত্তের নির্ভীকতাকে অর্দ্ধেক ব্যক্ত করিতেছে। কোথায় কলঙ্ক? জলে-ভেজা পদ্মপত্রের মতই জলশূন্য।

তথাপি সকলে ইহাকে ঘৃণা করে। এই গ্রামের লোক, এমন কি—তপন পর্য্যন্ত। সেই অকুণ্ঠিত তেজ তপনের নাই বলিয়াই কি অক্ষমতা-জনিত এই ঘৃণা! ভালকাজ করিবার প্রবল ইচ্ছা যেমন মানুষকে তুলিয়া ধরে, মন্দকাজ করিবার দুর্ব্বলতাও কি তেমনি তাহার অপরিসীম? কিন্তু এ-সব ভালমন্দের বিচার করিবে কে?

হয়ত কালিকেশ যা—সে তাই, যেমন সুবোধ বলিয়াছে। সে নির্ব্বোধ, বিপথগামী, অবিবেকী, রূঢ়, দুর্দ্দান্ত, রহস্যময়। তবু তাহার তেজ, শক্তি, সারল্য............না, তপন পর্য্যন্ত বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। আভা ক্ষুদ্র বালিকা, তাহার দোষ কি?

কালিকেশ নীচ, সহস্রবার নীচ। যে কুমারীকন্যাকে প্রলোভনের পথে টানিয়া নামাইতে পারে, আঘাত দিয়া সান্ত্বনা দেয় না, নিজের মত পরের সুনাম-দুর্ণামেও উদাসীন,—সে নীচ এবং কাপুরুষ। সহস্রবার।

মনে পড়িল, আর এক কাপুরুষের কথা। সম্ভ্রান্ত সমাজের রীতি-নীতি সুরুচি-সভ্যতায় মণ্ডিত হইয়া টবে-ফোটা ফুলটির মত সে লোককে আনন্দ দেয়। পাপ্‌ড়ীর আড়ালে সুতীক্ষ্ণ কাঁটা এমনভাবে লুকাইয়া রাখে যে, হাতে ফুটিবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্যমুগ্ধ বুঝিতেই পারে না। ফুটিলে যন্ত্রণায় 'উহু' করিবার সামান্য শক্তিটুকুও থাকে না। সভ্য সমাজ যে!

দুর্দ্দান্ত তেজ বা মধুর বিলাসিতা দুইয়েরই মোহ তরুণীদের চিত্তে একাধিপত্য বিস্তার করে। বীরত্বের গলে জয়মাল্য দান বা সুন্দর রুচিকে শ্রদ্ধা তাহারা না করিয়া পারে না। আভার জন্য দুঃখ, ছায়ার জন্যও ব্যথা। পৃথিবীতে এত বিচিত্র রকমের প্রলোভন এবং নারীর মন এমন কোমল করিয়া কেন বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন! রঙের জগতে রূপের খেলায় অসতর্ক প্রাণ প্রতিপলে পুড়িয়া মরে। আবেগ থাকিতে বিবেক মাথা তুলে না, এ বড় অদ্ভুত!

নিজের হৃদয়ের পানে চাহিলে সূর্য্যালোকের স্পষ্টতায় কি লেখা চোখে পড়ে? কুমারী ছায়ার সন্নিকটে বসিয়া—হাতখানি তুলিয়া হাতের মধ্যে রাখিলেই বিদ্যুৎ আসিয়া সেখানে জড়ো হয়, মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সারা দেহ চম্‌চম্‌ করিতে থাকে, দৃষ্টিশক্তিভরা চক্ষু অন্ধকারের আবরণ খোঁজে। নির্জ্জন ছায়াভরা বীথি, অথবা নিরালা গৃহকোণ কিংবা বর্ষাঘন অন্ধকারে কুটীর-কক্ষে স্তিমিতজ্যোতি দীপ—কোনটারই সৌন্দর্য্য বৃথা বলিয়া বোধ হয় না। অশান্ত হৃদয়ের মত্ততাকে অন্ধকার যবনিকা তলে চাপা দিয়াও কামনার কল্লোলধ্বনি রোধ করা যায় কি? অন্ধকারেই

যত কিছু রোমাঞ্চকর রহস্য, যত কিছু রমণীয় আত্মসমর্পণ বা গৌরবময় ভালবাসার জন্ম-ইতিহাস! এই ভাবব্যাকুলতায় মানুষ না পারে কি?

বৈকালে কালিকেশের কথাই হইতেছিল।

সুবোধ মাকে বলিল, "শুনেচ মা, কালিকেশ গাঁ ছেড়েচে? আভার বিয়ের কথায় তার বাবা কি বল্লেন জান?"

মা প্রশান্তস্বরে উত্তর দিলেন, "জানি। তিনিই প্রায় ও-কথা বলেন। কিন্তু যাকে ছেলের মত ভালবেসেচি একবার, তাকে ছেলের মত করেই পেতে চাই।"

সুবোধ বিস্ময়ান্বিত হইয়া কহিল, "তার মানে? মেয়েটার দুঃখ-দুর্গতির সীমা থাকবে না।"

মা হাসিলেন। ললাটে তর্জ্জনী রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "দুঃখ!—এটায় লেখা থাকলে কেউ ঠেকাতে পারে না, বাবা। বাংলাদেশের মেয়ে আমরা, দুঃখকে ডরালে কি আমাদের চলে?"

সুবোধ বলিল "কিন্তু—"

মা বলিলেন, "কাল আমি আভার মনের ভাব জেনেচি। সে—"

সুবোধ বলিল, "সে যদি সইতে পারে—"

মা বলিলেন, "সে রাগ করে বলেচে, এ বিয়ে হলে বিষ খেয়ে মরবে।"

তপন ও সুবোধ বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিল।

মা হাস্যমুখে বলিলেন, "ওতে অবাক্ হচ্ছিস্ কেন? কালকের ব্যাপার আমি কতক জানি। দুঃখের ভয় আভার একটুও নেই। কালিকে সে অপছন্দও করেনি।"

সুবোধ হতবুদ্ধির মত জিজ্ঞাসা করিল, "তবে?"

মা বলিলেন, "যাই হোক, এ বিয়ে একদিন হবেই। সেই দিন তোকে বলবো সে-কথা।"

তপন মনে মনে বলিল, "আমি জানি। ওরা পরস্পরকে ভালবাসে। এ একটা মান-অভিমানের পালা চলচে বৈত না!"

কিন্তু আশ্চর্য্য! আভা জীবনভোর দুঃখকে একটুও ডরায় না? সত্যই কি এ ভালবাসা, অথবা অন্ধ লালসার তীব্র আকর্ষণ? যে আবেগে মানুষ যুদ্ধক্ষেত্রে হাসিমুখে শত্রুর গোলা বুক পাতিয়া লয়, সেই আত্ম-বিসর্জ্জনের তীব্রতা আভার কামনায় ফুটিয়াছে? তথাপি সমাজধর্ম্ম-বহির্ভূত এই আকাঙ্ক্ষা লোকের মুখে কুৎসার রূপে বাহির হইবে। বালিকা জানে না, তাহার উত্তাপ বা দাহ-যন্ত্রণা।

* * *

অপরাহ্ণ না হইতেই সেদিন সহসা পশ্চিমদিক হইতে একখানা মেঘ উঠিয়া গ্রামের মাথায় চাপিয়া বসিল। সূর্য্য ত ডুবিলেনই—সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ধূমল-অন্ধকারের যবনিকাখানি গ্রামের মাথায় ফেলিয়া দিয়া বাতাসটুকু বন্ধ করিয়া দিল। পাক খাইতে খাইতে চিলগুলা দ্রুত নামিতে লাগিল; পাখীর ঝাঁক কলরব তুলিয়া নীড়ের পানে ছুটিতে লাগিল। আসন্ন বিপদ বুঝিয়া গরু হাম্বারবে বৎসকে ডাকিতে লাগিল। মানুষের ব্যস্ততাও কম নহে। রৌদ্রে শুকাইতে-দেওয়া ঘুঁটে কেহ ঝুড়ি ভরিয়া তুলিতে লাগিল, কেহ কেহ বা আচার, কাপড়, শুক্‌না কাঠ। মহা-আড়ম্বরে অচিরে যিনি আসিতেছেন, তিনি বেদুইন দস্যুর মতই ক্ষিপ্রকরে গ্রাম, জনপদ লুণ্ঠন করিয়া হতশ্রী করিয়া রাখিয়া যাইবেন। উত্তপ্ত পৃথিবীকে করিবেন সুশীতল, মানুষকে ভোগ করাইবেন আনন্দ ও উদ্বেগ।

প্রথমে দেবদারুশীর্ষ অল্প কাঁপিয়া উঠিল, ঝাউয়ের শাখা এ-দিক হইতে ও-দিক হেলিল, পথের ধূলা ও বাঁশের পাতা উড়িয়া পথঘাট একাকার করিয়া দিল; পরক্ষণেই বিকট শোঁ-শোঁ রবে—আকাশপ্রান্ত হইতে তীরগতিতে ছুটিয়া আসিয়া রুদ্রতাণ্ডবে তিনি ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। কালবৈশাখীর ঝড় দেখা দিল।

গাছের মাথা হেলাইয়া ভূমিস্পর্শ করাইয়া শক্তিমান বিজয়-অর্ঘ্য গ্রহণ করিল। এ-বাড়ির জানালা-দরজাগুলি বন্ধ হইয়া সকালেই সন্ধ্যার দীপ জ্বলিল। বর্ষার ঘনঘোর দুর্য্যোগে অকালেই সন্ধ্যা-বন্দনা সুরু হইয়া থাকে।

কড়্—কড়্—কড়াৎ। গম্ভীর নির্ঘোষে গ্রামের বুকখানি গুর গুর করিয়া কাঁপিল। ভারি পেষণ-যন্ত্রটাকে বলিষ্ঠ বাহুর অনায়াস-ঠেলায় গড়াইয়া দিয়া আকাশের এ-ধার হইতে ও-ধার পর্য্যন্ত বারুদ-বিস্ফোরণ শব্দে কাঁপাইয়া দুর্দ্দান্ত দেবশিশুদের সে কি উল্লাস-ক্রীড়া! আকাশের পাতলা আবরণ ছিঁড়িয়া গোলাটা যদি হঠাৎ গ্রামের বুকে গড়াইয়া পড়ে!

মত্তবায়ুর শোঁ-শোঁ গর্জ্জনে, আকাশের গুরুগম্ভীর নাদে ও পাতায় ধূলায় মিশিয়া প্রকৃতি যেন উন্মাদিনী হইয়া উঠিলেন। কি করিয়া গ্রাম-শিশুদের রক্ষা করিবেন এই দুশ্চিন্তায় মায়ের চক্ষু হইতে বড় বড় ফোঁটা চড়বড় করিয়া ঝরিতে লাগিল। হোগলা-চালায় বৃষ্টিপতন শব্দ—একটা অদ্ভুত রাগিণীধ্বনি তুলিল।

অদূরে ছাগল বিকট তারস্বরে ডাকিয়া উঠিল, প্যা—অ্যা—অ্যা—

ঝটিকাক্ষুব্ধ ধরণীকে শান্ত করিতে বৃষ্টি নামিল মুষলধারে। বাতাস কমিল না, শাখা-আন্দোলন শব্দে স্পষ্টই বোঝা যায়। তীক্ষ্ণ বক্র তরবারির মত বিদ্যুৎ আকাশকে ফালি ফালি করিয়া চিরিয়া ফেলিতে লাগিল।

সঙ্গে সঙ্গে কর্ণবিদারী গর্জ্জন। দাওয়া হইতে মাদুর গুটাইতে হইল, তথাপি তপন দুয়ার বন্ধ করিল না। চৌকিখানা দুয়ার-গোড়ায় টানিয়া আনিয়া সে কালবৈশাখীর রুদ্রলীলা প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিল।

শহরে জানালা বন্ধ করিয়া বিদ্যুৎবাতি টিপিয়া এমন দিনে ঘরের মধ্যে গল্প বা গান জমাইয়া তুলিতে ভারি আমোদ। চালকড়াই ভাজা চিবাইতেও বেশ লাগে। পাঠের উপর প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। শহরে ইনি আসেন শহরবাসীকে প্রমোদিত করিবার জন্য; ঘণ্টাখানেকের বৈচিত্র্য ও বিস্ময়।

সুদৃঢ় অট্টালিকায় বসিয়া বসন্ত-সমীরণের মত ইঁহাকে নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে—চাখিয়া চাখিয়া উপভোগ করা যায়। কিন্তু উলঙ্গ প্রকৃতির মাঝে—এই সংহারমূর্ত্তি,—অন্তরীক্ষ, মাটি, গাছ-পালা, ঘর-বাড়ির উপর তাণ্ডব নর্ত্তন, কাঁপাইয়া ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া উড়াইয়া এই যে ক্রূর ক্রীড়া,—এ ক্রীড়ায় আনন্দ থাকিলেও প্রতিদণ্ডে জীবন ও আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রচুর। ঝড়ের বেগ বাড়িলে হোগলার চালা শূন্যে উঠিতে কতক্ষণ! কিংবা ঝড়ের ধাক্কায় ঐ প্রকাণ্ড গাছটা যদি ধরাশায়ী হয়,—সে কি কুটীরখানিও সঙ্গে সঙ্গে নিষ্পেষিত করিয়া দিবে না? উঃ, কি আলো আকাশের গায়ে। সমস্ত বিদ্যুতের শক্তি একত্রিত হইয়া আকাশের পশ্চিমপ্রান্ত ফাঁসাইয়া দিল বুঝি!

তপন সে তীব্র তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া চোখ বুজিল, সঙ্গে সঙ্গে—বুক কাঁপাইয়া কান ফাটাইয়া শব্দ হইল,—কড়্—কড়্—কড়াৎ!

জার্ম্মাণদের বড় হাউইট্‌জারটা শেল-বিদারণে ভার্ডুনের কেল্লা ধ্বংস করিতেছে বুঝি? চোখ চাহিতেই ও-ধারে একটা তালগাছ জ্বলিতেছে দেখা গেল। শেল—গ্রামে না পড়িয়া গাছে পড়িয়াছে, গাছ জ্বলিতেছে।

সুবোধের মা বারতিনেক দেবতার নাম উচ্চারণ করিলেন।

ও-ঘর হইতে তপনকে ডাকিলেন, "বাবা, ওই ছাতিটা মাথায় দিয়ে—এ-ঘরে এসে বসো। একলা থাকা ঠিক নয়, বাজ পড়চে।"

বজ্র! বজ্র! পুরাণ-বর্ণিত অসুর-সংহারের অব্যর্থ অস্ত্র। সত্যাশ্রয়ী ব্রাহ্মণের তপস্যা-সঞ্চিত পুণ্য অস্থি। দেবকার্য্যে সৃষ্টিরক্ষাকল্পে ত্যাগীশ্রেষ্ঠ যে-দিন ধূলা-মুঠার মতই নশ্বর দেহ হইতে প্রাণটাকে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, সেদিনের পুণ্যতিথি-স্মরণে মাঝে মাঝে কি আকাশ-চারীরা মর্ত্ত্যের অচৈতন্য মানুষকে চেতনা দিবার জন্য ঐ কুলিশ বাদল-দিনে গ্রামের উপর ফেলিয়া দেন? বৃক্ষ জ্বলিয়া উঠে, কখনও মানুষ মরে। পরিষ্কার সূর্য্যালোকিত দিনে বজ্রের গল্পে মানুষ কত না আনন্দ পায়! পুরাণ না পড়িলেও, পুরাণের কাহিনীটুকু লোকমুখে জানা যায়। ব্রহ্মশাপ নহিলে মানুষ বজ্রাঘাতে মরে না!

পরিষ্কার দিনে—বজ্রের বিভীষিকা আমরা ভুলি না, কিন্তু বজ্র-সৃষ্টির ইতিহাস ভুলি। ত্যাগ ও সত্য কবির রচনা বলিয়াই বাস্তব-জীবনে জলবিম্বের মত উহার স্থিতি। বজ্র একবার পড়ে, দু'বার পড়ে—কেন বার বার পড়ে না? কেন প্রতি বৃক্ষে দেউটি জ্বালাইয়া—গ্রামের অন্ধকার ও মনের অন্ধকার চিরতরে নাশ করিয়া দেয় না? কেন অসংখ্য মানুষ মরে না?

জার্ম্মাণ-যুদ্ধ আবার ফিরিতে পারে, কিন্তু তপন সে দৃশ্য না-ও দেখিতে পারে। সংহারিণী প্রকৃতির রুদ্রলীলায় যুদ্ধের অসম্পূর্ণ ছবিও ত একটা পাওয়া যায়। তাই যথেষ্ট!

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেও ঝড়বৃষ্টি একেবারে থামিল না। কালবৈশাখী বাদল আনিয়াছে। শ্রাবণের এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যা। বৃষ্টি ও বায়ুর বেগ কথঞ্চিৎ শান্ত হইল বটে, একেবারে থামিল না। মাঝে মাঝে বর্ষণ চাপিয়া আসে, আবার থামিয়া যায়। বিদ্যুৎ আকাশের এ-ধার ও-ধার চলাফেরা

করে, শব্দ কম। মেঘের চাপা গুম্ গুম শব্দ—দীর্ঘকালস্থায়ী খেলার আভাস।

সুবোধের মা বলিলেন, "বর্ষা নামলো দেখচি। এ-বেলা খিচুড়ি হোক, কি বল তপন ?"

তপন পরম উৎসাহে মাথা নাড়িয়া বলিল, "বেশ ত।"

আভা মাথায় গামছা দিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল। বাদলপ্রকৃতির মতই অন্তর উহার দুর্য্যোগময়ী। বসিয়া বসিয়া আর খানিকক্ষণ গল্প করিলেও পারিত! কিন্তু গল্প করিবে কে ?

মা বলিলেন, "তোরা গল্প কর, আমি দু'খোলা চালছোলা ভেজে নিয়ে আসি।"

চালছোলা ভাজিয়া তেলনুন মাখিয়া মা এ-ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

সুবোধ বলিল, "লঙ্কা ?"

মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "দাঁড়া।" বলিয়া উঠানে নামিয়া গেলেন ও গাছ হইতে কাঁচা লঙ্কা তুলিয়া আনিয়া—একটা পাতার উপর রাখিলেন।

লঙ্কা তপন কখনও খায় না। কিন্তু টাটকা বৃষ্টি-ভেজা লঙ্কা দেখিয়া সে-ও একটা তুলিয়া লইল। মুখে দিয়াই, উঃ—কি তীব্র ঝাল! মা অপ্রতিভ হইয়া তেঁতুল আনিয়া দিলেন, মুখে দিয়া তপন সুস্থ হইল।

সুবোধ হাসিয়াই খুন! তিন চারিটা লঙ্কা চিবাইয়া খাইয়া সে খুব বীরত্বের গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। একবারও—আঃ, উঃ, করিল না।

তপন বলিল, "তুমি সত্যই বাঙাল।"

সুবোধ মাকে বলিল, "শুনচো তোমার ইংরেজ ছেলের কথা! যে-কাজ ওঁদের শক্তির বাইরে—তাই নিয়ে ওঁরা সভ্যতার বড়াই করতে ভালবাসেন না। জান মা, পড়ে গিয়ে যদি হাঁটু ছড়ে, ভাল ছেলেরা বলে, কেমন,

হলো ত? দৌড়ঝাঁপে পিছিয়ে পড়লে বলে, ও-সব গোঁয়ার্তুমির কাজ আমরা পারি নে। বীরত্বের কোন মর্য্যাদাই ওরা দেয় না।"

মা বলিলেন, "থাম বাপু, ওরা আর তোরা কি আলাদা?"

সুবোধ বলিল, "আলবৎ। আমরা বাঙাল—ওরা বাঙালী। এইতেই বোঝ শক্তির তারতম্য।"

লজ্জায় তপন আরক্ত হইয়া উঠিল। শক্তিহীনতার কথায় কোন যুবকই প্রফুল্ল হয় না।

সে কহিল, "নিজের কোটে পেয়ে বলচো খুব। ও বীরত্ব কার্য্যকালে বোঝা যাবে।"

সুবোধ লঙ্কা আগাইয়া ধরিয়া বলিল, "come on, fight. লঙ্কা থেকেই সুরু হোক।"

তপন হাসিয়া বলিল, "বাস্তবিক সুবোধ-দা, এই যদি শক্তি পরীক্ষার মূলসূত্র হয়, তাহলে তোমরা সত্যই অজেয়। লঙ্কা ডিঙিয়ে বীরত্ব দেখাতে—আমরা কোনকালে পারব না।"

সুবোধ হাততালি দিয়া বলিল, "fine retort. কিন্তু মা, শহুরে লোক বেশ মজলিসি কথা জানে, লোক হাসাতেও পারে। সর্দ্দা আইন নিয়ে যেবার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে মিটিং হয়—সেবার একজন শহরের লোককে আমরা খুব জব্দ করে দিয়েছিলাম। মারের ভয়ে ভদ্রলোক যুক্তির কথা মুখে না এনে আম্‌তা আম্‌তা করে সরে পড়লেন।"

মা বলিলেন, "তোমাদের মুখের চেয়ে হাত বেশি চলে; যুক্তির যে কেউ নও, তা জানি।"

সুবোধ বলিল, "আমরা অর্থাৎ যুবকরা তরবারি দ্বারা ধর্ম্ম প্রচারকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি।"

মা বলিলেন, "শক্তের ভক্ত, এতো পৃথিবীর লোক মেনে নিয়েচে।"

সুবোধ বলিল, "মেনে নিয়েই কিন্তু যত গোল। বিশ্বাসের চোখে কেউ কাউকে দেখতে পারচে না। জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক বসে, আর ভেতরে ভেতরে সবাই শক্তিবৃদ্ধির জন্য কৌশল সৃষ্টি করে।"

আভা রান্নাঘর হইতে ডাকিল, "মা।"

মা উত্তর দিলেন, "যাই।"

রান্না খাওয়া চুকিয়া গেল। গল্পও অজস্রধারে চলিতে লাগিল। বাহিরে অন্ধকারভরা গর্জ্জনশীলা প্রকৃতি; শাখাভঙ্গের শব্দ, পাখীর আর্ত্তচীৎকারধ্বনি ও দূরশ্রুত কোন আশ্রয়হীন পশুর সশঙ্কিত রব। জলধারার মাঝে বাহিরের বিশ্ব সকল সম্পর্ক চুকাইয়া ফেলিয়াছে। মাঝে মাঝে ওই চীৎকারধ্বনি বাহির সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দেয়। এমন দিনে গৃহকোণে দীপ জ্বালাইয়া যাহারা মুখোমুখী গল্প করিতে বসে—তাহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও আনন্দের বন্ধন কেমন অলক্ষিতে সুদৃঢ় হইয়া নকল আত্মীয়তার খোলস খসাইয়া একান্ত প্রিয়জনের মত নিকটে টানে, এ-কথা তপন ভাল করিয়াই বুঝিল। দুর্য্যোগে বাহিরের প্রয়োজন মিটিয়াছে, ঘরের আলোটিকে অন্তরের আলো বলিয়া নিষ্কর্ম্মা মন আত্মীয়তা পাতাইতেছে সন্তর্পণে।

অনেকক্ষণ গল্প করিয়া যে যাহার শয্যা আশ্রয় করিল।

ছোট ঘরখানিতে আভা আজ একাই শুইল। ঘরে কাঁসার বাসনপত্র আছে, বাদলদিনে চোরের সুবিধা বড় বেশি। মা বড় ঘর আগলাইবার জন্য ও-ঘরেই রহিলেন। ছোট ঘরের সাম্‌নের ঘরে তপন ও সুবোধ আশ্রয় গ্রহণ করিল!

দীপ নিবিল। বাহিরে রিমিঝিমি বৃষ্টির তালে চক্ষু জুড়িয়া ঘুম নামিল। গভীর শান্তিপূর্ণ নিদ্রা।

* * *

আভা দুয়ার বন্ধ করিয়াই কিন্তু ঘুমাইতে পারিল না। দীপ নিবাইল; নহিলে মা ও-ঘর হইতে বকিবেন। কিন্তু ঘুম যেন আর আসে না। বাদলরাত্রির বাহিরের মাতামাতির সঙ্গে অন্তরের সুন্দর যোগ। আসুক ছাঁট। জানালা খুলিয়া আভা বালিশটা জানালার ধারে পাতিয়া তাহার উপর মাথা রাখিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল।

ব্যাঙ্ ডাকিতেছে—গোঙ্‌র-গোঁ। জলের উপর দিয়া ছপ্ ছপ্ করিয়া শিয়ালই একটা ছুটিয়া পলাইল হয়ত। ভিজা মাটির গন্ধ বেলফুলের সঙ্গে মিশিয়া ভারি বাতাসের কাঁধে চাপিয়া জানালাপথে আভার সর্ব্বাঙ্গ স্নিগ্ধ করিয়া দিল। পাকা আমের গন্ধও সেই সঙ্গে মিশানো। ওই বোম্বাই গাছটার পিঁপড়াগুলা সবই হয়ত বৃষ্টির জলে ভিজিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়াছে কিংবা ঝড়ে তাহাদের বাসা ভাঙ্গিয়া কোথাও উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। কাল ওই গাছে উঠিলে বীরত্ব দেখাইবার কিছুই থাকিবে না। বেচারা—কালিকেশ!

স্পর্দ্ধাও তাহার কম নহে, আভাকে মারিতে চাহিয়াছিল। মারে নাই ঘৃণা করিয়া, কিন্তু দু'ঘা মারিলেই কি ইহার চেয়ে বেশি যন্ত্রণা হইত? ঘৃণা! আভাকে সে ঘৃণা করে! আর দাদা ও মা মিলিয়া সেই গোঁয়ারটার সঙ্গে আভার জীবন সংলগ্ন করিবার পরামর্শ আঁটিতেছিলেন। আভা যেন খেলানা? খেয়াল-খুশীতে যাহাকে ইচ্ছা বিলাইয়া দিলেই হইল! চাই সে অবহেলায় একপাশে ফেলিয়াই রাখুক, কিংবা আছাড় মারিয়া ভাঙ্গুক। বেশ বিধান যা-হোক।

কালিকেশ সত্যই কাপুরুষ। আভাকে প্রহার করিয়াই গ্রাম ছাড়িয়াছে। দোষ করিয়া ক্ষমা চাহিবার সাহসটুকু পর্য্যন্ত তাহার নাই। নাঃ, চিরদিনই কালিকেশ অমনই। বাল্যকালের বহু ঘটনাই মনে পড়ে। বহু কলহ ও লাঞ্ছনার ইতিহাস। ক্ষমা সে কোন দিন চাহে নাই।

অকারণে নির্য্যাতন করিয়াছে, নির্লজ্জের মত আসিয়া পরদণ্ডেই বলপ্রকাশে কলহ মিটাইয়া ফেলিয়াছে। কালিকেশের বড় বড় চোখ দু'টার পানে চাহিলেই ভয়ে আভার বুক কাঁপিয়া উঠে। এমন লোকের সঙ্গে কি কলহ করিয়া থাকা যায়? মুখে ক্ষমা সে চাহে না, কিন্তু ক্রোধে আরক্ত আয়ত চক্ষুতে অগ্নি-কণা নিষ্ঠুরভাবে জ্বলিয়া উঠে; সন্ধি-মুহূর্ত্তে সেই আয়ত চক্ষুই কোমল অশ্রুপতনের মাধুর্য্যে মনকে গলাইয়া দেয়। বল-প্রকাশের মধ্যে তাই ক্রোধ ও ক্ষমা দু'টি জিনিষই আশ্চর্য্যরূপে চোখের মধ্যেই ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়।

তথাপি কালিকেশ গোঁয়ার। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা তাহার কম। যে-কার্য্য সে একবার ভাল বলিয়া বুঝে, তাহার এতটুকু ত্রুটি তাহার আইনে অমার্জ্জনীয়। একটা ভিখারীর করুণ কণ্ঠস্বরে যে-হৃদয় গলিয়া পড়ে, দীনতা দেখাইয়া অনায়াসে যাহাকে প্রতারণা করা সহজ—সেই সরল উদার হৃদয়—কার্য্য-ত্রুটিতে যে-কোনরূপ নিষ্ঠুরতম দণ্ড দিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। তাহার উদ্দেশে যে উপহাস করিবে, লাঞ্ছনা তাহার অনিবার্য্য।

মহৎ—উদার। আভাকে প্রহার করিয়া যত হীনতাই সে অর্জ্জন করুক না কেন, ঐ দু'টি বিশেষণ হইতে টানিয়া নামাইবার দুঃসাহস আভার নাই। দেশের সেবা-উপলক্ষ্যে খুব বেশি না হউক—যে টাকাটা তাহার হাতে আসিয়াছিল, সে টাকাটা অনায়াসে আত্মসাৎ করিলে কিছু অশোভন হইত না। সে-টাকার না ছিল পাকা লেখাপড়া, না ছিল ভাল হিসাব।

কাগজে মাঝে মাঝে এমন কাহিনী যে বাহির হয় না, তাহা নহে।

আভাকে শুনাইয়া কালিকেশ মুখ রক্তবর্ণ করিয়া কহিত, "এইসব নরপশুরা কাজটাকে খালি পিছিয়ে দিচ্ছে, আভা। অর্থের এতই যদি লালসা তোদের—লেখাপড়া শিখে ফাঁকির পথ ধরলি কেন? চল না সেই পথে!"

আভা যদি রহস্য করিয়া বলিত, "দেখা পেলে তাদের কি দণ্ড দিতে, কালি-দা ?"

দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া কালিকেশ উত্তর দিত "প্রাণদণ্ড। উঃ, আইন যদি আমার হাতে থাকতো !"

আভা হয়ত হাসিয়া বলিত, "তাহলে ফাঁসিকাঠে দেশ উঠতো ভরে।"

কালিকেশ ক্রুদ্ধ চক্ষে চাহিতেই আভা হাসি থামাইয়া বলিত, "থাম, বীরপুরুষ, থাম ; আমি বলছিলাম কি, দোষীকে শোধরাবার অবসর না দিয়ে—"

কথা শেষ না হইতেই হো হো করিয়া কালিকেশ বিকট ভাবে হাসিয়া উঠিত, "দোষীকে শোধরাবার অবসর ! সে আইন কাদের জন্য জান ? যারা মূর্খ, বোঝে না—তাদের জন্য। কিন্তু লেখাপড়া শিখে আইনের ধারা মুখস্থ করে যারা ফাঁকির চেষ্টায় ফেরে, তাদের ফাঁসি নয়, স্রেফ্ গুলি—স্রেফ্ গুলি।"

কালিকেশের গম্ভীর মুখভাবে আভার হাসি ফুটিতে পারে নাই। তারপর, দেশ দেশ করিয়া এত অল্প বয়সে এই যে অক্লান্ত দুঃখ, কষ্ট, বিপদ মাথা পাতিয়া লওয়া, সে কি ক্ষুদ্র মরণভীত সঙ্কীর্ণ অন্তরের কাজ ? বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রিগুলি ইচ্ছা করিলে পাকা ফলের মত কালিকেশ বিনা আয়াসেই সংগ্রহ করিতে পারিত। বাপের জমিজমা যাহা আছে তাহার ভরসা না করিলেও দুই দাদার সুপারিশে ভাল চাকুরি কি একটা মিলিত না ? অতঃপর বিদ্যা ও বিত্তের বেড়া দিয়া নির্ব্বিঘ্ন-সংসারের কুটীর-খানিতে গৃহীজীবনের প্রতিষ্ঠা। কাব্য বল, কার্য্য বল, খ্যাতি বল, নাম বল—কিনা পাওয়া যায় !

সে-কথা একদিন হইয়াছিল।

কালিকেশ হাসিয়া আবৃত্তি করিয়াছিল,—

"মোর তরে রুদ্রের প্রসাদ—
পথে পথে অপেক্ষিছে শ্রাবণ-রাত্রির বজ্রনাদ।"

কালবৈশাখীর এই বজ্রনাদমুখরিত অন্ধকার ভরা গ্রামখানিতে—রুদ্রের প্রসাদ মাগিয়া গৃহহারা সেই পথিক—কোন্ তেপান্তরের মাঠের মধ্যে বিদ্যুতের শিখায় পথ দেখিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে, কে জানে!

আভা জানালার ধারে আর একটু সরিয়া আসিয়া তীক্ষ্নদৃষ্টিতে বাহিরের পানে চাহিল। কিছুই দেখা যায় না, সূচীভেদ্য অন্ধকার। জলস্থল একাকার হইয়া গিয়াছে, শুধু দর্দ্দুরী-নির্ঘোষে গ্রামখানির পরিচয় মিলে।

কোথায়—কোথায় সেই গৃহহারা পথিক? সেই নিষ্ঠুর, নির্ভীক, মহৎ, উদার?

কালিকেশ কেন দু'ঘা মারিল না! আভা অভিমানের বশে যে-অন্যায় করিয়াছে সত্যই তাহার মার্জ্জনা নাই। আজ এই ঘনঘোর দুর্য্যোগময়ী তামসী-নিশীথে কালিকেশের নিষ্ঠুরতাকে ছাপাইয়া আভার অপরাধই বার বার বিদ্যুৎ-বিদারণে অন্তরকে চিরিয়া চিরিয়া দিতেছে। নিশ্চিন্ত আরাম-শয়নে পড়িয়া অভিমানের ধ্যান করা বা ছবি আঁকা মন্দ নহে, ঘৃণা করাও সহজ; কিন্তু ঘৃণা-অভিমানের বাহিরে যে দুর্দ্দান্ত আশ্রয়হারা হইয়া জল-ঝড় মাথায় পাতিয়া দুর্গম পথ অতিক্রম করিতেছে, তাহার কথা ভাবিলে ওই সব বৃত্তিগুলিকে বিলাস ছাড়া কিছুই মনে হয় না। অভিমান করিতে হয়, অন্ধকারের মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াও, মাথা পাতিয়া বর্ষণধারা লও, কাদা-জল ঠেলিয়া খানিক মাঠে মাঠে ঘুরিয়া এস। সামনে বজ্র পড়িলে বড়-জোর চক্ষু মুদিতে পারে, প্রাণভয়ে পলাইবার পথ বন্ধ। সম্মুখে পশ্চাতে ঘন অন্ধকার, পথ অজানা। শীতে ও ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তারপর দোষী কালিকেশের বিচার করিও। বুঝিব, কত বড় বিচারক তুমি।

ওকি? বৃষ্টির ছাঁট চুল বাহিয়া চোখের কোণ দিয়া বালিশে গড়াইয়া পড়িতেছে? না, আভা কাঁদিতেছে? অনুশোচনা? মন্দ নহে! দোষীর বিচার করিতে বসিয়া কান্না? দুর্যোগময়ী রজনীর এ কেমন নূতনতর বিলাস!

ছপ্—ছপ্—ছপ্! মস্ত বড় একটা শিয়াল জানালার ধারে দাঁড়াইল।

আভা কৌতূহলভরে মাথা তুলিল না। সে তখন তেপান্তরের মাঠে ঝড়জল মাথায় করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে।

পিছন হইতে কে ডাকিল, "আভা।"

আভা পিছনে না চাহিয়াই ছুটিল। ছুটিতে ছুটিতে সে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল—সেই জল-কাদার উপর। একটা বিশ্রী ক্লেদার্দ্র স্পর্শ; শীতে ও ঘৃণায় সারা দেহ শিহরিয়া উঠিতেই তন্দ্রা টুটিয়া গেল। কিন্তু সেই ডাক মিলাইল না।

আভা চমকিত হইয়া চাহিতেই অন্ধকারমাখা একখানি হাত তর্জ্জনী উঠাইয়া কি যেন ইঙ্গিত করিল। ভয়ে আভা কথা বলিতে পারিল না। তর্জ্জনী নামাইয়া মূর্ত্তি মৃদুস্বরে বলিল "আমি।"

আভা অর্দ্ধোত্থিত ভাবেই ফ্যালফ্যাল করিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। স্বপ্নঘোর কাটিয়াও কাটিতে চাহে না, এমনই মোহ বাদলরাত্রির!

মূর্ত্তি জানালার ভিতর হাত গলাইয়া দিয়া কহিল, "হাত ধর, দেখ সত্যি কি না?"

আভা অস্ফুট স্বরে বলিল, "এ সময়ে—"

মূর্ত্তি তেমনই নিঃশব্দ হাসিমাখা স্বরে বলিল, "এই ত সময়। কিন্তু—আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ভিজবো বল? দুয়োর খোল, কথা আছে অনেক।"

আভা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। বালিশের তলা হইতে দিয়াশলাই লইয়া গৃহকোণের প্রদীপটি জ্বালিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

আগন্তুক ঘরে ঢুকিয়া দুয়ার অর্গলাবদ্ধ করিল।

আভা বিবর্ণ মুখে বলিল, "চল না ও-ঘরে। মাকে ডেকে তুলে—"

কালিকেশ বলিল, "তা হলে মার কাছেই যেতাম, মাকেই ডাকতাম, এখানে এসে উঠতাম না।"

আভা ম্লান মুখে কালিকেশের পানে চাহিয়া কি বলিতে গেল, কালিকেশ বাধা দিয়া বলিল, "দোহাই তোমার—আগে ভিজে কাপড় ছাড়বার কোন ব্যবস্থা থাকে ত কর, তার পর না-হয় তোমার আপত্তি শোনা যাবে।"

আভা বলিল, "তাইত বলছিলাম—মাকে ডাকি।"

অর্গলে হাত দিয়া কালিকেশ কহিল, "ডাক, আমি চল্লাম।"

আভা কি যে করিবে ভাবিয়াই পাইল না। এই নিশীথরাত্রিতে, জলে, ঝড়ে পৃথিবীতে তুমুল আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে, এমন সময় কালিকেশ কেন আসিল? একাকিনী কুমারীর ঘরে অর্গলাবদ্ধ করিয়া—হউক সে পরিচিত—মহৎ, উদার—কি এমন কথা তাহার? আভার বুক ভয়ে ঢিপ-ঢিপ করিতে লাগিল। সত্য বটে কালিকেশের অনুধ্যান করিয়া স্বপ্নে সে এইমাত্র প্লাবন-বিস্তীর্ণ মাঠের উপর দিয়া ছুটিতেছিল, তাহার দুঃখের পশ্চাতে সহানুভূতিভরা কল্পনাকে প্রেরণ করিয়া মনে মনে শ্রদ্ধা নিবেদন সে করিতেছিল, কিন্তু এমন করিয়া মুখোমুখী—দীপালোকে? বাহিরের বাদল-অন্ধকারকে মুছিয়া সেইদিনের অপরাহ্নকেই কক্ষমধ্যে দাঁড় করাইয়া দিয়া গেল যে! আভার ক্রমবর্দ্ধমান অভিমান বুক জুড়িয়া উঠিতে না-উঠিতে অর্গল খোলার শব্দে— মিলাইয়া গেল। ক্ষিপ্রকরে আলনা হইতে সে একখানা শাড়ি টানিয়া লইয়া কালিকেশের দিকে ছুড়িয়া দিল; কোন কথাই বলিল না।

উষ্ণ কাপড়ের স্পর্শে কালিকেশ ফিরিল। ফিরিয়া মৃদু হাসিল ও দ্বার অর্গলাবদ্ধ করিয়া কহিল, "যাক, আশ্রয় দিলে।"

মুহূর্ত্তে সে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, দড়ির আলনা হইতে শুষ্ক গামছা টানিয়া লইয়া মাথা মুছিল ও স্তম্ভিত আভার পানে চাহিয়া কহিল, "আলোটা নিবিয়ে দাও।"

আভা আর সহ্য করিতে পারিল না। চক্ষুতে আগুন জ্বালাইয়া বলিল, "সেদিনের বেত তোমার হাতে নেই কেন? না থাকে ত বল, আমি কুড়িয়ে এনে দিই। আমার পাপের শাস্তি দিয়ে চলে যাও।"

কালিকেশ স্নিগ্ধ হাসিতে মুখমণ্ডল ভরাইয়া কোমলস্বরে বলিল, "ছি! এখনও সে-কথা মনে করে রেখেচ? আমি ত সঙ্গে সঙ্গেই ভুলে গেছি।"

আভা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, "ভুলে গেছ ত আবার এলে কেন? আমার যে-টুকু অপমান বাকি ছিল—"

কালিকেশ মধুর স্বরেই বলিল, "অপমান তোমায় করবো এমন ইচ্ছা আমার কোন কালে হয় না। তোমায় বকি বা দু'ঘা মারি, মনে করি, নিজের ওপর নিজে পীড়ন করছি। দোহাই, আলো নিবিয়ে না দিলে— তুমি জান না আভা, কি বিপদ ওই জলঝড়ের সঙ্গে বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করচে।"

আভা সহসা যেন ভয়ে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "তুমি কি খুন করে এসেচ?"

কালিকেশ মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, "না। এ ডিটেক্‌টিভের গল্প নয়। এ জগতে সত্যিকারের খুন খুব কমই হয়। খুন-করাকে আমি কোন কালে বাহাদুরী বলে মানি নে। অথচ মিথ্যাকে ঠেকাতে দু'টি সহজ সরল সত্যকথা বলেচ কি সবাই তোমায় চোখ রাঙাবে।"

আভা কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় জানালা দিয়া একটা দমকা বাতাস আসিয়া আলো নিবাইয়া দিল।

আভা ব্যস্ত হইয়া ওধারে যাইতেই খট্‌ করিয়া কি একটা শব্দ হইল কালিকেশ পকেট হইতে টর্চ্চ বাহির করিয়া সেইদিকে আলো ফেলিয়া দেখিল, আভার পায়ের কাছেই মাটির প্রদীপ উল্টাইয়া পড়িয়াছে। ভাঙ্গে নাই।

হাসিয়া বলিল, "ভালই হলো। থাক, থাক, ওকে তুলো না। তুললেও তেল কোথায় পাবে যে, জ্বালাবে? ভয় কি, তুমি ওই তক্তাপোষের উপরেই বোস, আমি এখানে দাঁড়িয়ে যা বলবার বলে যাই।" বলিয়া টর্চ্চ নিবাইয়া দিল।

অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে ঘর নিস্তব্ধ হইল।

রুদ্ধনিশ্বাসে আভা কালিকেশের কথার অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কালিকেশ বলিল, "সে দিনের কথা, তুমি যে ইচ্ছে করে অমন একটা ঘৃণাজনক কাজ করনি প্রথমটা রাগের মুখে বুঝতেই পারিনি। তারপর, এখান থেকে চলে গিয়ে বহুক্ষণ ধরে ওই কথাই ভাবলাম।"

আভা অস্ফুটস্বরে বলিল, "আজ ও-সব কথা তোলবার কি দরকার?"

কালিকেশ বলিল, "আছে। আমরা কাউকে ব্যথা দেব না এই পণ করেই সেবাব্রত গ্রহণ করেচি।"

আভা শুষ্কস্বরে বলিল, "তাই আমায় সান্ত্বনা দিতে এসেচ? তুমি কি মনে কর—এখনও আমি কচি খুকী যে—তোমার সান্ত্বনা না পেলে—"

কালিকেশ বলিল, "কাঁদবে না, জানি। কিন্তু বয়সের বিজ্ঞতায় কি চোখের জল চেপে রাখা যায়? যায় না বলেই ত জলঝড়ের মধ্যেই আজ এখানে আসতে হলো। আমায় আঘাত করতে সেদিন তুমি ওই কাজ করেছিলে, কিন্তু আমার তিরস্কারের চেয়ে তোমার কাজে কি তুমি বেশি করে লজ্জা পাও নি?"

আভা ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "তুমি অন্তর্য্যামীত্বের বড়াইও করতে পার, দেখছি।"

কালিকেশ সে কথায় কান না দিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল, "সত্যি বলতে কি, আমি অন্ধ। যে কাজ আমার সম্মুখে—তারই আলোয় সোজা পথটিকে আমি কর্ত্তব্যের মত চিনি। আসে-পাশে কোথায় কি রইলো বা গেল সে খোঁজ আমার থাকে না।"

আভা বলিল, "তবে এ অপূর্ব্ব মনস্তত্ত্বের খবর পেলে কোথায় ?"

কালিকেশ বলিল, "একটা ঘটনা থেকে। কিন্তু থাক সে-সব অনাবশ্যক ইতিহাস। জানতে পেরেই মনের সমস্ত কর্ত্তব্য এই পথের মধ্যে এসে জমা হলো। মন টানতেই ফিরলাম। বিশ্বাস কর, আভা—তোমায় তিরস্কার করে পর্য্যন্ত একটি মুহূর্ত্তের তরে আমার মনে শান্তি ছিল না।"

আভার সারা দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এ নিষ্ঠুর আজ বলে কি ? গ্রামের সেবা ছাড়া আর কোনকিছুতে যে কর্ত্তব্যকঠিন মনটি তাহার ক্ষণেকের তরেও জড়াইয়া গিয়া অশান্তি অনুভব করিতে পারে, এ-কথা কে বা জানিত ? খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া আভা ব্যাকুলস্বরে বলিল, "তা অন্ধকারে বিপদের কথা কি বলছিলে না ?"

কালিকেশ সে-কথায় কান না দিয়া বলিল, "তাই ত ভাবলাম, জল-ঝড়ের রাত্রিতে একলা তোমায় পাব, অনেক কথা বলতে পারবো। পরিষ্কার দিনের আলোয় মেলাই কথা দিয়ে যা বোঝানো যায় না, এই নিস্তব্ধ অন্ধকারে একবারমাত্র তোমার হাতখানি ধরে কোন কথা না বলে তাই বোঝাবো। হাতের ভাষা আছে, জানো ?"

আভা রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "না. আমি গণক নই ?"

কালিকেশ বলিল, "আমিও নই। বাড়ি এসেই তোমার সঙ্গে দেখা

করবো এই হলো আমার প্রথম ইচ্ছা। বাবা বললেন, "কবে ফিরবে?" বললাম, "জানি না।" আবার বললেন, "এমন কিছু খারাপ কাজ করো না যার লজ্জায় আমার মুখখানা পুড়ে যায়।" তাঁর পা ছুঁয়ে বললাম, "আপনি বিশ্বাস করেন আমার দ্বারা তেমন কাজ হবে?" তিনি মাথা নাড়লেন। প্রণাম করে উঠতেই তিনি আশীর্ব্বাদ করলেন, "মানুষ হও।" আভা, মানুষ কি আমি নই? আশ্চর্য্য আশীর্ব্বাদ, নয়?"

আভা বলিল, "মানুষ মানুষকে এই আশীর্ব্বাদই করে।"

কালিকেশ বলিল "বাঃ—রে! এই চামড়াঢাকা দেহখানা তবে কি?

আভা বলিল, "তা কি তুমি জান না? মানুষ যদি আকারে শুধু মানুষ হতো, তাহলে অন্ধকারে এই দুর্য্যোগ মাথায় করে চোরের মত তুমি এখানে কেন?"

কালিকেশ বলিল, "কিন্তু বলেচি ত—সহজ, সরল সত্য যারা বলে—তারাই অপরাধী।"

বাহিরে বোধহয় বৃষ্টি ধরিয়া আসিতেছিল। শেষরাত্রির মেঘভাঙ্গা চাঁদও পাণ্ডুর আকাশের গায়ে উঁকি মারিলেন। বর্ষণসিক্ত গাছের ডালে ডানা ঝাপ্‌টাইয়া কয়েকটা পাখী—প্রভাত-বন্দনা-গীতি গাহিয়া উঠিল।

কালিকেশ চমকিত হইয়া কহিল, "হাঁ,—আসল কথাই বলতে ভুলে গেছি। বাবা বললেন, কাল নাকি তোমার দাদা আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন। তোমার মার ইচ্ছা তিনি জানিয়ে এসেচেন, বাবা রাজী হন নি! তাতে হয়ত জেঠাইমা মনোক্ষুন্ন হয়েচেন।"

কথাটার ভাবার্থ বুঝিয়া আভা কোন উত্তর দিল না। ঘরের মধ্যে অন্ধকার না থাকিলে গণ্ডের আরক্ত ভাব বা সঙ্কোচকুণ্ঠায় অবনত মুখ দেখিয়া প্রশ্নের উদ্দেশ্য—একটা ঠিক করা যাইত।

কালিকেশ সে-সব ইঙ্গিত-ইসারার ধার দিয়াও গেল না। বলিল, "আমাদের বিয়ে যে হতে পারে না—এতো স্পষ্ট কথা। নয় কি? এর মধ্যে আবার মনে করা-করির কি আছে।

এবারও আভা কোন উত্তর দিল না।

কালিকেশ বলিল, "তোমার মাকে বুঝিয়ে বলতে পারবে না কি? লজ্জা করবে?—তবে থাক।"

আভার যাহা কিছু বলিবার ছিল ঐ একটি কথায় কালিকেশ সে পথ বন্ধ করিয়া দিল। একে নির্জ্জন রাত্রি, তায় অন্ধকার ঘর, বাহিরে বিশ্বের উপর প্রকৃতির বিপ্লব। মুখোমুখী তরুণ-তরুণী সেই অন্ধকারে বসিয়া। দিব্য নিশ্চিন্তে কালিকেশ বিবাহের কথা বলিয়া গেল। দিব্য নিশ্চিন্তেই। অন্যান্য পাঁচটা কাজের মত এও যেন একটা! কথা তাহার পরিষ্কার; না কম্পন, না জড়তা, না বা বিহ্বলতা!

হায়! ক্ষণপূর্ব্বে ইহারই মুখে ব্যথার কথা শুনিয়া আভার দেহে রোমাঞ্চ জাগিয়াছিল!

কিন্তু বিবাহ হইতে পারে না কেন? সে-কথা কালিকেশ জানে, আভা জানে না।

কালিকেশ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তবে আসি। হয়ত আর দেখা হবে না, হয়ত—"

আভা বলি-বলি করিয়াও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

কালিকেশ নিঃশব্দে হাসিয়া কহিল "হয়ত থাক। চরকা, খদ্দর, দেশ এ-সব কখনও ভুলো না। তোমায় উপদেশ দেওয়াই মিছে; জানি তুমি ভুলবে না কোনদিন।"

খিল খোলার শব্দ হইল। তথাপি আভা কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার আয়ত দু'টি চোখের কোল বহিয়া নিঃশব্দে ধারা

নামিয়া আসিল। কালিকেশ চলিল, হয়ত বা জন্মের মতই। কিন্তু হায়! কেন সে আজ দেখা দিতে আসিল? সেদিনের তীব্র ভর্ৎসনার ভিতর দিয়া সে নিষ্ঠুর যে বিষ ঢালিয়া দিয়াছিল, তাহার জ্বালায় জর্জ্জরীভূত হইয়া আভা সে স্মৃতি অনায়াসে ভুলিতে পারিত। কেন আজ প্রসন্ন মনে, ক্ষমার কথা না কহিয়াও অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া গেল সে! দেহে ও মনে এই অমেয় দান, এই অযাচিত স্নেহস্পর্শ—কি করিবে সে? কোথায় লুকাইবে মুখ? অন্তরের উত্তাল হাহাকার সশব্দে বুক বিদীর্ণ করিয়া বাহিরে আসিল!

কালিকেশ মুখ ফিরাইয়া টর্চ্চটা জ্বালিয়া ফেলিল।

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আভা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে!

বিস্মিত কালিকেশ পুনরায় দ্বার বন্ধ করিয়া আভার শিয়রে আসিয়া কোমল কণ্ঠে ডাকিল, "আভা?"

আভা রুদ্ধবেদনায় মাথা নাড়িয়া অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "তুমি যাও, তুমি যাও, যাও।"

কালিকেশের বিস্ময় বাড়িল। টর্চ্চ নিবাইয়া আভার মাথায় একখানি হাত রাখিয়া কহিল, "ছি! আবার কাঁদে।"

এই কথায় কান্না কমে না। সুতরাং প্রাণ খুলিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া আভা বড় কান্নাটাই কাঁদিল। বাহিরের যত মেঘ, যত বর্ষণ, যত বিদ্যুৎ, বজ্র সমস্ত আভার অন্তর আশ্রয় করিয়াছে। ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অশ্রুতে বাহির করিয়া না দিলে আভার মৃত্যু অনিবার্য্য। প্রান্তরপথে অসহায় পথিকের মত মাথা পাতিয়া ধারা লওয়া ছাড়া—উপায় কি? কালিকেশ নিঃশব্দে ডান হাতখানি আভার মাথায় রাখিয়া বসিয়াই রহিল।

কাঁদিয়া শান্ত হইয়া আভা উঠিয়া বসিল। কালিকেশের পানে অন্ধকারে অশ্রুভেজা দৃষ্টি মেলিয়া পরিষ্কার কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "আমাদের বিয়ে কেন হতে পারে না বলবে কি?"

কালিকেশ হতবুদ্ধির মত বলিল, "তা কি তুমি জান না? আমার মত হতভাগা, ছন্নছাড়া—"

আভা সংযত কণ্ঠে বলিল, "থাক। কিন্তু—এই রাত্রিতে আমার এখানে এতক্ষণ কাটিয়ে গেলে কাল সকালে আমার যে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না, তা তুমি জান?"

কালিকেশ কহিল, "অন্ধকারে এসেছি, দেখবার কেউ নেই।"

আভা দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, "আছেন। একজন আছেন।"

কালিকেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

আভা বলিল, "ধর্ম্ম। তাঁর কাছে আমি কি কৈফিয়ৎ দেব? জীবনে আমিও যদি বিয়ে না করি এবং তাতে যদি লোকে কলঙ্ক রটায়, কিসের জোরে সে কলঙ্ক আমি ঠেকাবো—বলে দাও?"

কালিকেশ বলিল, "কেন, তোমার মনের জোরে। সত্যিই ত কোন মন্দ কাজ করি নি আমরা।"

আভা বলিল, "না করি নি। কিন্তু মনে আমার জোর নেই।"

কালিকেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আভার পানে চাহিয়া বলিল, "এ-কথার অর্থ কি,আভা?"

আভা নতমুখে উত্তর দিল, "মনে আমার জোর নেই।"

কালিকেশ কহিল, "তাহলে বিবাহ করাই তোমার উচিত।"

আভা সবেগে গ্রীবা তুলিয়া কহিল, "বিয়ে! মেয়েমানুষের কবার বিয়ে হয়?"

কালিকেশ কহিল, "দুর্ভাগ্যক্রমে তোমার হয়ত একবারই হবে।"

আভার কণ্ঠে অস্বাভাবিক জোর ফুটিয়া উঠিল, "হাঁ, একবারই। হবে নয়, হয়েচে। সেই অধিকার, সেই ভার আমায় তুমি দিয়ে যাও। যেখানে তোমার খুশী, ইচ্ছে হয় এসো, না-হয় এসো না—শুধু বলে যাও—"

কালিকেশ ম্লান হাসিয়া বলিল, "আমার ইচ্ছেয় যদি যাওয়া-আসা চলতো তাহলে অনায়াসে এ-ভার তোমায় দিয়ে যেতাম। তুমি ছেলে-মানুষ, সারাজীবন মানে কি বোঝ না। একটা উত্তেজনায় যা তা করে বসো না।"

আভা চৌকি ছাড়িয়া অন্ধকারে উঠিয়া আসিয়া কালিকেশের পদপ্রান্তে মাথা রাখিয়া বলিল, "না, না, উত্তেজনা নয়, আমায় আশীর্ব্বাদ কর। নইলে আত্মহত্যা ছাড়া আর আমার পথ নেই।"

ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে মাঠের পথে আসিতে আসিতে শূন্যস্খলিত হইয়া একটা বিদ্যুৎভরা বজ্র মহাশব্দে সম্মুখের তালগাছে পড়িয়াছিল। নির্ভীক কালিকেশ সেই শব্দেও বুঝি অন্তরে এতটা কাঁপিয়া উঠে নাই! এ আভা বলে কি? চিরজীবনের অধিকার? বিবাহ?

আভা কি জানে না, রাত্রির অন্ধকারে গগনের বিস্তার-সীমায় যে-সব নক্ষত্র সারিবাঁধা পথে নিজ নিজ গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া শৃঙ্খলা ও শান্তিকে সমৃদ্ধ করে, কালিকেশ সেই সব আকাশচারীর কেহ নহে? মাঝে মাঝে জ্যোতির্ম্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া অনন্ত শূন্যে দেউটি জ্বালাইয়া বে-লাইন যাহারা ইরম্মদবেগে অধোগামী হয়, কালিকেশের প্রিয় তাহারা। বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর তপোবনের ওপারে, সাতভাই বুধের বহুদূরে, চন্দ্রমণ্ডল ছাড়াইয়া, সন্ধ্যা ও শুকতারার পাশ কাটাইয়া, ছায়াপথের অযুত তারা-দম্পতিকে নতি জানাইয়া নিত্যই সে অন্ধকারে পৃথিবীর আকর্ষণে অধোগামী হয়। রূপসম্পদশালিনী ধরিত্রী—তাঁরই কোমল মৃত্তিকায় মুখ গুঁজিয়া তারা-জীবনের জ্যোতিকে নিবাইতে ভালবাসে। শূন্যে ঝুলিয়া অকারণ জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া লোকের প্রশংসা যদি সে না-ই লইতে পারে—পৃথিবীর পঙ্কশয্যা, কে বলিবে, তাহার মনোরম নহে!

পায়ের কাছে আভা মাথা রাখিয়া পড়িয়া আছে। পরম আশ্রয় তাহার চাই। সমস্ত জীবনকে কুৎসা-গ্লানির উপর মেলিয়া ধরিয়া সূর্য্যের আলোককে প্রাণ ভরিয়া দেখিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার। সারাজীবনের পাথেয়—এই বাণী।

আভা পড়িয়া রহিল, কালিকেশও ভাবিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত যেন যুগের মধ্যে লুকাইয়া গিয়াছে! ধর্ম্ম—সমাজ!

শূন্যে সজোরে বাহু আস্ফালন করিয়া অস্ফুট স্বরে কালিকেশ বলিল, "রাশিয়া—রাশিয়া। তুমি ধর্ম্ম মান আভা?"

পদতললীনা আভা উত্তর দিল, "মানি।"

কোথায় রাশিয়া, আর কোথায় মানবসভ্যতার জন্মভূমি—ভারতবর্ষ।

কবিরা স্বপ্ন দেখিয়া গিয়াছেন :—অসংখ্য তীর্থ, অগণ্য মন্দির। শাস্ত্র, ধর্ম্ম, জাতি, ভাষা, আচার, অনুষ্ঠান, সভ্যতা কোন্‌টা না আদিম কাল হইতে জলতলশায়ী ধরিত্রীর কানে সৃষ্টির অপূর্ব্ব কথা কহিয়া সগৌরবে আজ পৃথিবীর পুরোভাগে দাঁড়াইয়া নীতি প্রচার করিতেছে। প্রেমে সে জগৎ জয় করিবে! কিন্তু তার পূর্ব্বে? মিলনের পূর্ব্বে?

আভা, দুর্ব্বল আভা সে কথার অর্থ তুমি জান, কিন্তু জীবন বিনিময়ে বুঝিবার চেষ্টা করিও না। লোকচক্ষে বা ধর্ম্মচক্ষে (একই কথা) নিজেকে নিরপরাধী প্রমাণ করিতে না পারিলে—এই মুহূর্ত্তে তুমি বলিয়াছ, জীবন বিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত নও। কিন্তু হায়! সে জীবন নব-বসন্ত মুঞ্জরিত শ্যামল পত্রের ক্ষুদ্র অবয়বের মত সবে মাত্র তোমার দেউলের সীমায় দেখা দিয়াছে। ঊষার বর্ণচ্ছটা দেখিয়া সমগ্র দিনের প্রসন্নতাকে আয়ত্ব করার মত দুশ্চেষ্টা না থাকাই ভাল!

বিবাহ? বন্ধন?

দুই হাতে মাথার চুল শক্ত করিয়া ধরিয়া কালিকেশ চঞ্চল কণ্ঠে কহিল, "আমায় টেনে নামাতে তোমার এত আগ্রহ কেন, আভা ?"

অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। মুহূর্ত্তে পায়ের উপর হইতে মাথাটা শুধু সরিয়া গেল এবং কানের মধ্যে সুরের শিখা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

—"ধর্ম্ম না মানো ক্ষতি নেই, কিন্তু ভক্তি, বিশ্বাস ও-গুলো মানুষকে নীচে নামায় নি কোন দিন, ওপরেই উঠিয়েচে। বরং তুমি এমনি স্বার্থপর যে, নিজের সুখের ভাগ দিতে চাও না কাউকে। বেশ দিও না, কিন্তু মনে রেখো, সাধনা করবার অধিকার সকলেরই আছে। দেশ তোমার একার নয়।"

কালিকেশ আর শুনিতে পারিল না। দু'হাতে আভার মাথা তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "তবে ধর্ম্ম থাকুক পড়ে, নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের জোরে—এ অধিকার তুমি পাবে। আমার প্রবৃত্তির একটা রাশ তোমার হাতেই দিয়ে গেলাম, আভা, মনে মনে টান দিয়ো, হয়ত একটা চমকপ্রদ খবরও তুমি আমার সম্বন্ধে সংবাদপত্রে পাবে না।"

উত্তেজনা, উদ্বেগ একটুও ছিল না। কালিকেশ শান্তভাবে টর্চ্চটা পকেট হইতে বাহির করিয়া জ্বালিয়া বিছানার উপর রাখিল ও আভার খোঁপা হইতে একটা কাঁটা টানিয়া লইয়া আপনার বাম বাহুতে বিদ্ধ করিয়া দিল। মুহূর্ত্তে তাজা রক্তে সেখানটা ভাসিয়া গেল। বিস্মিত আভা কোন কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সেই রক্তাক্ত বাহু আনিয়া আভার সিঁথির উপর রাখিয়া কালিকেশ বলিল, "আজ থেকে তুমি আমার স্ত্রী—সঙ্গিনী।"

টর্চ্চের আলোয় আভার সিঁথি চক্‌চক্ করিয়া উঠিল, আনন্দে মুখখানি প্রভাত-পদ্মের মত টলটল করিতে লাগিল।

কালিকেশ ত্বরিতে টর্চ্চ নিবাইয়া দুয়ার খুলিয়া ফেলিল এবং আর কোন কথা না বলিয়া কোন দিকে না চাহিয়া বাহির হইয়া গেল।

* * *

একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তপনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। শেষরাত্রির পাণ্ডুর চাঁদের আলোয় সে দেখিল, আভার ঘর হইতে এক পুরুষমূর্ত্তি বাহির হইয়া উঠানের জলকাদা ভাঙ্গিয়া বাগানের ও-ধারে চলিয়া গেল। আভা দুয়ারে দাঁড়াইয়া সেই অপসৃয়মান লোকটার পানে পলকশূন্য হইয়া চাহিয়াই রহিল। প্রফুল্ল মুখ, উজ্জ্বল চক্ষু। কে বলিবে দিন দুই পূর্ব্বের ম্রিয়মাণা তরুণী! বিস্রস্ত কেশপাশ পিছনে এলাইয়া পড়িয়াছে। পূব হইতে জলজ্বলে প্রভাততারা ও পশ্চিম হইতে ক্ষীণকায় চাঁদ যে রশ্মিটুকু আভার প্রসন্ন মুখে ফেলিয়াছেন—সিঁথির সিন্দূরবিন্দু তাহাতে বিশেষ উজ্জ্বল বোধ হইতেছে না। কপালময় একটা দুরপনেয় কলঙ্কের দাগ—কালো হইয়া ফুটিয়াছে। এইমাত্র যে বাহির হইয়া গেল……ঘৃণায় তপনের অন্তর শিহরিয়া উঠিল। ওঘরে সুপ্তিমগ্ন মা জানেন না, এ-ঘরে অচেতন সুবোধও জানে না—বাদলরাত্রি কতখানি অগৌরব বহিয়া আনিয়া এই ছোট কুটীরখানির মাঝে ভরিয়া দিয়া গেল। বইয়ে-পড়া সেই লাইনটি সে কয়েকবার উচ্চারণ করিল—

Frailty, thy name is woman!

মিথ্যা নহে। হয়ত বা জগতের সমস্ত নারী-সম্বন্ধে চোখে একটা চশমা দিয়াই ঐরূপ উক্তি করা চলে। ছায়াকেও সে দেখিয়াছে। কথায় আচরণে কোথাও এতটুকু জড়তা তাহার নাই। তরুণকে সে Compliment দেয় অসঙ্কোচেই, তপনকে সম্বন্ধচ্ছেদের জন্য দুঃখ করিতে নিষেধ করে। মন তাহার পদ্মপত্রের জল, সদাই টল টল করিতেছে। আভাকে দেখিয়া সে অনেকটা তৃপ্তি পাইয়াছিল! নারীর সহজাত গুণ কোমলতা-

তার কার্য্যে ও ব্যবহারে কুসুমসৌরভের মত পরিব্যাপ্ত। সে তর্কচ্ছলে কখনও অসঙ্গত কথা বলে না, বা ব্যঙ্গোক্তির দ্বারা কাহারও মন বিঁধিতে ভালবাসে না। তার ক্রোধের প্রকাশ যেমন সহজ, প্রসন্নতার আবির্ভাব তেমনই অনাড়ম্বর। ফ্যাশান লইয়া সে ব্যতিব্যস্ত হয় না; গৃহস্থের ঘরের মেয়ে—বিদ্যা বা সৌজন্যতার বেড়ার ওপারে দাঁড়াইয়া নব আগন্তুকের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত রুচির কোন খুঁত আছে কি না খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখে না। অর্গ্যানে বসিয়া গান গাওয়া বা বাসে না চড়িয়া পদব্রজে যাওয়ার বড়াইও তার নাই। সরল। এত সরল যে সময়ে সময়ে তপনের মনে হইত, জীবনকে কয়েক দণ্ডে পুরাতন করিয়া ফেলিয়া তবে তার নিষ্কৃতি! সেই স্থৈর্য্যশালিনী আভা সারল্যের অন্তরালে এতদিন যাহা লুকাইয়া রাখিয়া ছিল, নারীর প্রকৃত রূপ বুঝি তাহাতেই নিহিত।:—

Frailty, thy name is woman !

ছায়াকে, না, তরল জল নিম্নমুখী হইবেই, উজ্জ্বল অগ্নি দাহ্য পদার্থকে মুহূর্ত্তে আশ্লেষে বেড়িয়া উল্লাস-নৃত্য করিবেই! কিন্তু নারীমাত্রেই ঐ উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করিবে—এ-কথায় অন্তর সায় দেয় না।

পুকুরধারে লণ্ঠন হাতে স্নেহ-ব্যাকুলা জননী? তাঁকে ত প্রথম যৌবনের অপর পারে মহিমময়ীরূপে আবিষ্কার করিয়া সন্তানেরা ধন্য হয়। চঞ্চল চক্ষুতে সন্তান স্নেহের প্রাচুর্য্য, উত্তপ্ত করে সন্তান-সুখ-বিধায়িনীর কোমলতা, বক্ষের ক্ষীরধারায় লালনার্ত্ত সন্তানের জন্য পুষ্টিকর জীবনীরস···তিনি মা। কিন্তু সন্তানসম্ভাবনার পূর্ব্বে—সেই মা?

আভা এতক্ষণে দুয়ার বন্ধ করিয়া কক্ষ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ঘুমের ঘোরে সুবোধ পাশ ফিরিল। আর একটু পরেই সকাল হইবে,

আভা জলযোগের আয়োজন করিয়া এ-ঘরে ডাকিতে আসিবে। তখন ঘৃণায় সে যদি সেই খাবার মুখের কাছে তুলিতে না পারে? কেমন করিয়াই বা পারিবে? প্রত্যুষের আবরণে কামনাময়ী নারী শুচিস্নিগ্ধা কল্যাণীর মতই সংসারকে চালনা করিবার স্পর্দ্ধা করিবে! মায়ের হাতের কাজ কাড়িয়া লইয়া, ভায়ের সঙ্গে হাসিকৌতুক করিয়া অবহেলায় দিনকে সন্ধ্যার দুয়ারে ঠেলিয়া দিবে। তারপর রাত্রির কালো কুন্তলে নিজের কালো ছায়া মিলাইলে তাহার মহিমাকে ক্ষুন্ন করে কে?

নারী অবিশ্বাসী নহে, অবিশ্বাসী এই বয়স। এই প্রভাত-কোমল-ধরিত্রীর মদময়তার আলস্যে স্নিগ্ধ সূর্য্যকিরণে প্রথম নয়ন মেলিয়া দুর্জ্জয় কামনাকে অন্তরে অন্তরে বন্দী করিয়া রাখিবার ব্যাকুলতা। শ্রাবণ-সন্ধ্যার ঘনায়িত অন্ধকারের মত প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিবার উদার প্রকাশ। আকাশের মতই তার বিস্তার অনন্ত, প্রান্তরের মতই সবুজ রেখাকীর্ণ। এবং রহস্যঘন স্নিগ্ধতায় ও অভিনবত্বে সুচারু সন্ধ্যার মায়া তার বিস্তৃত উজ্জ্বল দুই অদ্ভুত চোখে। চিনিয়াছি বলিয়া হাতের মুঠা বাড়াইয়া অভিজ্ঞতাকে ধরিতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা আর কি আছে? ছোট হৃদয়ের রহস্য বহুবিচিত্র ধরণীর অপরিচয়ের মতই দুর্জ্ঞেয়। ভূগোল যেমন উত্তর দক্ষিণ কমলাকৃতি করিয়া এত বড় নদনদীভরা পৃথিবীকে আকার দিয়াছে,—হৃদয়-রহস্য বোঝাইবার তেমন সহজ সংজ্ঞা কিছুই নাই!

পূর্ব্বযুগের শিভ্যলরী মরিয়াও মরে নাই। অবরণ বদলাইয়াছে মাত্র।

এ হয়ত ভালই হইল। একটা প্রাণান্তকর মোহ হইতে সে মুক্তিলাভ করিল। নারী-সম্বন্ধে তার কৌতূহল মিটিয়া গেল। মরীচিকার অনুসরণ করার মত একটা দুশ্চেষ্টা হইতে সে অব্যাহতি পাইল।

ছায়ার ছায়াও তার মনকে আর প্রলুব্ধ করিতে পারিবে না। মুক্তি ত আসিল; বেদনার শেষ কৈ? অনিবার্য্য মৃত্যুকে জানিয়া—বিয়োগ-ব্যথায় বিদীর্ণ হইয়া পড়িবার মত এক পরম দুর্ব্বলতা মনের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে। ধূলিকে নশ্বর জানিয়াও শক্ত মুঠা শিথিল করা যায় না কেন?

আভা যে ঘৃণায় অন্তর ক্লেদাক্ত করিয়া দিয়াছে, ছায়ার সেখানে দাঁড়াইবার সাহস নাই। সাহসিকা ছায়া ভীরুতার কুণ্ঠায় মুখ ঢাকিয়াছে, আলোহীন কালো আকাশের মতই লজ্জা তার দুঃসহ।

পল্লীর উষা ম্লান যবনিকান্তরালে দেখা দিয়াছে।

সম্মুখে একটিই জগৎ। বিদ্যা ও যশের তুষার কিরীট-মণ্ডিত। মনে তার নীলবর্ণের আকাশের টুক্‌রা—কর্ম্মমুখীন্।

স্বাস্থ্যকে সংযত, আশাকে পরিমিত, বেদনাকে সহিষ্ণু ও সুখকে উপভোগ্য করিলেই না পরিপূর্ণ এক মানবসত্তা—উদাহরণ-ঔজ্জ্বল্যে ইতিহাসের পৃষ্ঠা গৌরব-রঞ্জিত করিতে পারে!

তপন হাতমুখ ধুইয়া দাওয়ায় আসিয়া বসিল। জলে জলে পথঘাট কর্দ্দমাক্ত, মৃদু বাতাসে গাছের জল ঝরিয়া মাথায় পড়ে; পাখীর কাকলি নাই—সূর্য্যের আলো ফুটিল না। পাণ্ডুর আকাশতলে বিষাদিনী উষা ঝঞ্ঝাবিমর্দ্দিত পল্লীপ্রকৃতির বুকে পদক্ষেপ করিতেও অত্যন্ত কুণ্ঠিত যেন! শূন্য পথেই দিনের সঙ্গে আলাপ সারিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

ভিজা ঠাণ্ডা বাতাস, কাপড়ের খুঁট গায়ে দিয়া বসিলে আরাম পাওয়া যায়।

দাওয়ার কোল ঘেঁষিয়া কতকগুলা কেন্নুই কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া আছে, ছোট ডুমুর গাছটা শুঁয়োপোকায় ভরা, উঠানের জলে ছপ্‌

ছপ্ করিয়া ব্যাঙ লাফাইতেছে। মাচার উপর সতেজ শসা গাছটার ডগায় গোল গোল কি সব পোকা এক একবার পাখা মেলিতেছে, জলে ভিজিয়াছে বলিয়া হয় ত উড়িতে পারিতেছে না। উঠানের উঁচু দিকটায় জল নাই, গুটি-চারেক কেঁচো ভিজা মাটির উপর দাগ কাটিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া রান্নাঘরের দাওয়ামুখীন্ হইতেছে। এই সমস্ত চোখে পড়িলেই গা ঘিনঘিন করিয়া উঠে।

সর্ব্বোপরি বৃক্ষলতা ঘেরা গ্রাম-সৌন্দর্য্য ঝঞ্ঝায় শাখাপত্র ছিঁড়িয়া জলে পাতা ভিজাইয়া এমন গম্ভীর ও বিশৃঙ্খল হইয়াছে!

সুবোধ হাসিয়া বলিল, "দেখ পাড়াগাঁর কেমন রূপ।"

তপন অদূরে জলভরা পুকুরটার পানে আঙুল দেখাইয়া বলিল "রূপ ঐখানে।"

সুবোধ বলিল, "ঠিক বলেচ। গৃহস্থের অভাব বুঝেই ও আজ পরিপূর্ণ। এই বাদলার দিনে এক কাপ গরম চা—"

তপন বলিল, "হাঁ, চা ত চাই-ই। কিন্তু নিজের হাতে তৈরি করে নিতে হবে।"

সুবোধ বলিল, "আভা আপত্তি করবে।"

তপন বলিল, "আমরা শুনবো না সে আপত্তি। এই জলে-ভেজা মাঠ, পিছল পথ, থমথমে গাঁ—ঠায় চুপ করে বসে বসে কতক্ষণ দেখা যায় বল। স্টোভ জ্বাল।"

কেটলির গর্জ্জনে বিষণ্ণ ভাবটা অনেকখানি কাটিয়া গেল।

চা তৈয়ারী হইল। তপন কাপে চুমুক দিতে দিতে বলিল, "নাও না এক কাপ।"

সুবোধ বলিল, "না, আমার প্রতিজ্ঞা অত হালকা নয়। বাদল-বিলাসে তাকে ভিজিয়ে চেখে দেখতে আমার ইচ্ছা হয় না।"

তপন হাসিয়া বলিল, "তোমার প্রতিজ্ঞা তোমার পক্ষে পীড়ন। সোসাইটিতে মিশতে গেলে হাসিকৌতুক চেপে যেমন কতকগুলো এটিকেটের বোঝা ঘাড়ে না চাপালে স্বষ্টির আর্ট হয়ে ওঠে অদ্ভুত, তেমনি।"

সুবোধ বলিল, "অসংযম যদি চিত্তদারিদ্র্যের মুক্তি ঘোষণা করে ত তার ঋণ শোধ করবার শক্তি আমার নেই—মানি। ফুলের কুঁড়িটাকে ছিঁড়ে উপভোগ করার চেয়ে ফোটার অপেক্ষা করা ভাল।"

তপন বলিল, "অথচ তোমার ভাগ্যে সেই দীর্ঘ-অপেক্ষিত মুহূর্ত্তে ফুল যদি না-ই ফোটে।"

সুবোধ বলিল, "মানুষের মত প্রকৃতি ভয়ঙ্করী খেয়ালী নন। বিপর্য্যয় তিনি মাঝে মাঝে দেখান বটে, কিন্তু খেয়ালের বশে চলবার ক্ষমতা তাঁর নেই। চন্দ্রে-সূর্য্যে ও তারায়-তারায় তাঁর গ্রন্থি বাঁধা।"

তপন বলিল, "খেয়াল নেই বলেই প্রকৃতি পঙ্গু, বোবা।"

এমন সময়ে আভা কচুরি ও পাঁপড় ভাজা লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

ডিস দুখানি দু'জনের সম্মুখে নামাইয়া দিয়া কৌতুকোজ্জ্বল চক্ষে সুবোধের পানে চাহিয়া কহিল, "প্রকৃতির কথা কি হচ্ছিল, দাদা?"

সুবোধ বলিল, "এই বোবা প্রকৃতির কথা।"

আভা বিস্ময়কৌতুকে গালে হাত দিয়া বলিল, "প্রকৃতি বোবা! ও মা—যাব কোথায়! ছোড়দা, আপনি ত এই কালই বলছিলেন, পাড়াগাঁর নির্জ্জনতা মনকে একটুও পীড়া দেয় না, এর গাছপালা পশু-পাখী—সবাই মানুষের সঙ্গী। এমন কি আকাশ, মাঠ, ওই বাগানটা পর্য্যন্ত!"

তপন ইচ্ছা করিয়াই আভার দিকে চাহিল না। রাত্রিশেষের পাণ্ডু-

লেখা সে মুখের হয়ত কোথাও নাই। স্বরটি পর্য্যন্ত শুদ্ধ—অনাবিল। তবু এই শুচিস্নিগ্ধ বেশ, এই সেবা-মধুরতা, এই মিষ্ট হাসি সবই কৃত্রিমতায় ভরা।

আভা তপনের উন্মনা ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ডিসটা যে পড়েই রইলো, খাবেন না?"

ঘাড় নাড়িয়া তপন জানাইল, না।

আভা ঈষৎ শঙ্কিত স্বরে প্রশ্ন করিল, "শরীরটা খারাপ হয়েচে বুঝি?"

তপন কোন কথা না বলিয়া মাথা নাড়িল।

আভা বলিল, "যাই মাকে বলিগে। দাদা, ঝোলের মাছ আজ এনো।" বলিয়া চলিয়া গেল।

সুবোধ উদ্বিগ্ন স্বরে বলিল, "কি অসুখ? জর, না—"

তপন বলিল, "কিছুই না। খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না, এই পর্য্যন্ত। সুবোধ-দা আজকের সকালে বাড়ি ফিরবার কোন ট্রেণ নেই?"

সুবোধ বলিল, "মাঠের জল দেখে সত্যিই কি মনে হচ্চে—জলে পড়েচ?"

অপ্রতিভ হইয়া তপন বলিল, "না, না; তবে এখানে আর ভাল লাগচে না।"

সুবোধ বলিল, "না লাগে বাড়িই যেয়ো। কিন্তু মা তোমার শরীর অসুখ শুনলে কিছুতেই যেতে দেবেন না। যে ছেলে হাসিমুখে বিদায় নিতে না পারে—তার সম্বন্ধে মায়ের ব্যাকুলতা বড্ড বেশি।"

তপন বলিল, "বেশ ত, খেয়েই না হয় যাব।"

মোটকথা তপনের আর এখানে ভাল লাগিতেছিল না। কাল রাত্রির

দুঃস্বপ্ন নবাগত যৌবনের দুয়ারে বিভীষিকা বিস্তার করিয়াছে। আজ রাত্রি এখানে কাটাইলে, ছায়ার কাছে গিয়া দাঁড়াইবার কামনাটুকু তার নিঃশেষে বিলীন হইয়া যাইবে। সুতরাং, যাওয়া আজ চাই-ই।

মধ্যাহ্নে কলিকাতা হইতে একখানি পত্র আসিল। ডবল স্ট্যাম্প দেওয়া ভারি চিঠি। এত কিসের সংবাদ? মেজ বৌদি—কয়েকদিনের ব্যাপারগুলি ঠাসিয়া পাঠাইয়াছেন বোধ হয়। অন্য কিছু না থাকুক, ছায়ার সংবাদ বিস্তারিতই আছে। তামাসা করিবার দুরন্ত প্রলোভনকে মেজ বৌদি কখনও জয় করিতে পারেন নাই!

পত্র খুলিয়াই তপন আশ্চর্য্যান্বিত হইল। এতো মেজ বৌদির হস্তাক্ষর নহে। পরিষ্কার গোটাগোটা হরফে মুক্তার মত সাজানো সেই লেখা দেখিবামাত্রই যে চিনিয়া লইতে বিলম্ব হয় না! লাইন বাঁকা কাটাকুটি কালি-ধ্যাবড়ানো লেখার তলায় স্বাক্ষর দেখিয়া আরও সে আশ্চর্য্য হইল।

চিঠি লিখয়াছেন—বড় বৌদি! যিনি জন্মে কলম ধরিবার অবসর পান না,—যাঁর কাজের তাড়া অফুরন্ত!

তাড়াতাড়ি সে পড়িতে লাগিল :—

ভাই ঠাকুরপো, তুমি গিয়া অবধি কোন খবর দাও নাই সে-জন্যে আমরা বড়ই ভাবিত আছি। পত্রপাঠ তোমার কুশল সংবাদ-দানে সুখী করিবে। এদিকে এক ব্যাপার ঘটিয়াছে। ব্যাপারটা তোমাকে জানাইতেছি এই জন্য যে, হয়ত বা এর প্রতিকার তোমাদ্বারা সম্ভব। তোমারই বিবাহসম্বন্ধে। জান বোধ হয়, তোমাকে ছায়ার সঙ্গে বাঁধিবার যে-আয়োজন হইয়াছিল—তাহার মূলে অর্থের যোগাযোগ ছিল। অর্থাৎ পণের মোটা টাকার ব্যবস্থা। সে-সব এমন কিছু দোষের নহে। আজকালকার দিনে পণ না লন এমন একটিও লোক তুমি বাঙলায়

দেখাইতে পার না। বিশেষত—ছেলে যদি বিদ্বান্, সচ্চরিত্র ও ধনবান হয় ত সোনায় সোহাগা। সুলতার বাবা অকৃতী নহেন, দিবার ক্ষমতা তাঁর যথেষ্টই আছে।

তিন বৎসর পরে বিবাহ স্থির হইলেও পণের পরিমাণটাও ঐ সঙ্গে স্থির হইয়া গেল। সম্বন্ধ পাকা করিবার জন্য উভয় পক্ষের লেনদেনও কিছু হইয়াছিল। যত গোল বাধিয়াছে ঐখানে। তুমি বোধহয় জান, সুলতার পিতা অত্যন্ত তেজী লোক, কোন রকম অন্যায়কে কখনও তিনি প্রশ্রয় দেন নাই। কিন্তু ভাই, আশ্চর্য্য দেখ, মানুষের তেজকে চূর্ণ করিতে স্নেহের মত—তরল পদার্থ আর ভূভারতে নাই। যে মাথা মেয়ে দিয়াও হেঁট করেন নাই, স্নেহবিমূঢ়তায় সেই মাথা নামাইতে হইল! তিন বৎসর পরের সম্বন্ধকে তিনি অর্থ দিয়া বাঁধিতে চাহিলেন।

এদিকে নাকি ব্যবসার বাজার মন্দা। সব সওদাগরী আপিসই টলমল করিতেছে। সু-র পিতা যে-আপিসের ক্যাশিয়ার ছিলেন, একদিন দেখা গেল—হঠাৎ পঁচিশ হাজার টাকা তহবিলে কম। আগের দিন তহবিল মিলাইতে আদেশ হওয়ায়—সু-র পিতা মিলাইতে গিয়া দেখেন—এই কাণ্ড! তিনি সদ্ব্যয়ী—উদার প্রকৃতির লোক। চিরকাল আত্মীয়-কুটুম্ব প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন। যেমন উপায় করিতেন—মুঠা ভরিয়া তেমনই তাঁর অকৃপণ খরচ ছিল। সুতরাং ঘর কুড়াইয়া মাত্র দশ হাজার টাকা পাইলেন। আর পাঁচ হাজার গহনা বাঁধা দিয়া যোগাড় হইল। বাকি দশ হাজার।

সে-দিন রাত্রি তখন ন'টা, সু-র পিতা—আমাদের বাড়ি আসিয়া উপস্থিত। বিশৃঙ্খল বেশ, চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখখানি শুকনা। বাবা বৈঠকখানায় বসিয়া হিসাব দেখিতেছিলেন, আসিয়াই—কচি ছেলের মত তাঁর হাত দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন,—'আমায় বাঁচান।'

বাবা ত অবাক্! অত বড় একটা মানী লোক, বলা নেই, কহা নেই—হঠাৎ হাত ধরিয়া কাঁদেন কেন? পাখাটায় পুরা দম দিয়া বাবা তাঁহাকে চেয়ারে বসাইয়া সুস্থ হইতে বলিলেন। তিনি বসিলেন, কিন্তু মুখের ব্যাকুলতা একটুও ঘুচিল না। সে ব্যাকুলতা এমনই যে, দেখিলে মনে হয়—সমস্ত প্রাণ বাহির হইবার অপেক্ষায় বুঝি মুখে আসিয়া জমিয়াছে। আমি তখন ছোট খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া নীচে নামিতে-ছিলাম, হঠাৎ স্থ-র পিতার কাতর কাকুতি শুনিয়া কেমন কৌতূহল হইল, দোরের পাশে দাঁড়াইয়া ব্যাপার কি দেখিতে লাগিলাম।

তিনি বলিলেন,—"বেই মশায়, আজ রাত্রের মধ্যে দশ হাজার টাকা আমার চাই, নৈলে কাল জেল ছাড়া অন্য পথ নেই।"

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

তখন তিনি সমস্তই বলিলেন। সে-কথা উপরেই লিখিয়াছি। শুনিয়া বাবা বহুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর দিলেন, "তাই ত! বড় ভাবনায় ফেল্লেন আমাকে! তা এক কাজ করুন না বেই,—গহনা বন্ধক দিয়ে—?"

তিনি বলিলেন, "সে-সব বাঁধা দিয়ে যা যোগাড় করেচি, সবই ত বল্লুম আপনাকে। কোনদিকে কোন উপায় খুঁজে পাইনি বলে এখানে এসেচি। আপনি জানেন না, সে-টাকা ফেরৎ চাইতে আমার—মাথা কাটা যাচ্চে, কিন্তু উপায় কি? জেল ঠেকাতে এ-অপমানও আমি মাথায় পেতে নিলুম।"

বাবা বলিলেন, "বাড়ি বাঁধা দেবার চেষ্টা—"

তিনি হতাশাভরে বলিলেন, "অসম্ভব। শরিকানী বিষয়, এই রাত্রে মর্টগেজ রাখবার লোক পাই কোথায়? আপনি রাখবেন?"

বাবা হাসিয়া বলিলেন, "পাগল হয়েচেন! কুটুমের সঙ্গে ও-সব

হাঙ্গামা না রাখাই ভাল।” পরে গম্ভীর হইয়া বলিলেন, “কথা কি জানেন, আমরা ঘরে ত এক পয়সা রাখি না, যে বাজার—কোত্থেকে কে লুঠে নেবে, সব ব্যাঙ্কেই জমা থাকে। আপনি তপনের বিয়ের যৌতুক বলে—যে দশ হাজার টাকা আগাম দিয়েছিলেন, তা তো চৌরঙ্গীর বাড়ি মেরামতিতে খরচ হয়ে গেচে।” খাতাটা আগাইয়া দিয়া বলিলেন “এই দেখুন হিসেব।”

সু-র পিতার অবস্থা দেখিয়া আমার ভয় হইল, হয়ত বা তিনি এখনই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন। অনেক কষ্টে তিনি সামলাইয়া লইয়া জড়িত-স্বরে কহিলেন, “তবে কি টাকাটা পাব না?”

বাবা বলিলেন, “একটু বসুন, আপনার বেয়ানের সঙ্গে একটা পরামর্শ করে আসি।”

তিনি ব্যাকুল হইয়া বলিলেন “না, না, এ-সব কথা তাঁকে আর বলবেন না, তাহলে লজ্জায় আমি মুখ দেখাতে পারবো না।”

বাবা বলিলেন, “কিন্তু তাঁর হাতেই যে টাকাকড়ি সব। দেওয়ার মালিকও তিনি। এখন ত লজ্জার সময় নয়।”

তিনি কোন কথা কহিলেন না।

ভিতরে মার সঙ্গে কথা কহিয়া বাবা ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন, “যা বলেচি,—ঘরে ৫০০৲ টাকাও খুচরো নেই—সব ব্যাঙ্কে জমা। আর আপনার বেয়ান ঠাকরুণ বল্লেন, এ-টাকা উঠিয়ে নিলেই ত খরচ হয়ে যাবে, আর কি তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে পারবেন!”

তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “আমি যদি বাঁচি—মেয়ের বিয়ে আটকাবে না। কিন্তু সত্যিই কি টাকাটা পাওয়া যাবে না?”

—“না”, বলিয়া বাবা চেয়ারে গিয়া বসিতেই তিনি উঠিয়া আসিয়া—তাঁহার পা দু’খানি জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, “দোহাই আপনার, বাঁচান।”

তার পর ছোট ছেলের মত তাঁর সে কি বুকফাটা কান্না! কিন্তু সে কান্না বেশিক্ষণ শুনি নাই। সিঁড়ির উপর ধপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট আর্ত্তনাদ। ফিরিয়া দেখি,—সুলতা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। সম্ভবত, আমারই মত সে আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল। তেজী পিতার দুর্দ্দশা সে সহ্য করিতে পারে নাই, জ্ঞান হারাইয়াছে।

সুলতাকে লইয়া আমরা ব্যস্ত রহিলাম। রাত্রি একটার সময় তার চৈতন্য ফিরিল।

আমাকে কাছে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া—ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কোথায় ?"

বলিলাম, "তিনি চলে গেছেন।"

সুলতা কম্পিত করে আমার হাত দু'খানি চাপিয়া ধরিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তুমি ত জান বড়দি, তাঁর প্রকৃতি! এই হয়ত তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা।"

আমি তার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলাম, "চুপ কর। টাকা তিনি অন্য জায়গায় নিশ্চয়ই পাবেন।"

সুলতা ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, "সে-কথা আমার চেয়ে তুমি ভালই জান! কিন্তু বড়দি, সে দিনের কথা মনে পড়ে? তুমি বলেছিলে—এমন হীন কাজ তিনি কখনই করবেন না।"

বলিলাম, "পড়ে। শুধু মেয়ের মুখ চেয়ে তিনি এ-কাজ করেছেন!"

সুলতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "শুধু আমাদেরই জন্য। কেন যে বাঙ্‌লায় মেয়ে জন্মায়, কেন যে তাদের বিয়ে দেবার জন্যে এত আঁকু-পাঁকু! তারপর সে চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকার পর তাহাকে নিদ্রামগ্ন ভাবিয়া আলো নিবাইয়া চলিয়া আসিলাম।

সকালে দেখি, কাল রাত্রির স্থ যেন অকস্মাৎ বদলাইয়া গিয়াছে। এক রাত্রিতে মুখের চেহারা হইয়াছে এক বৎসরের রোগীর মত। চোখের কোণে কালি, কণ্ঠার হাড় ঠেলিয়া উঠিয়াছে, মুখখানি শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে। তবু স্থলতার মুখে হাসি লাগিয়াই আছে। সে এক অদ্ভুত হাসি। দেখিলেই চোখের জল চাপিয়া রাখা দুষ্কর হইয়া উঠে। ভিতরের দাহযন্ত্রণাকে চাপা দিবার জন্য সে অদ্ভুত আত্মপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে—হাসি ফুটাইয়া, গতি চঞ্চল করিয়া। দেখিয়া বড় ভয় হইতেছে আমার। আশ্চর্য্য! বাবার কথা সে একবারও জিজ্ঞাসা করে নাই। যেন তিনি মহাদায় হইতে মুক্তি পাইয়াছেন,—এমনই তার নিশ্চিন্ততা!

দুপুর উতরাইলেও স্থ-র পিতার কোন সংবাদ নাই। তিনি জেলে ঢুকিয়াছেন কি টাকা দিয়া অব্যাহতি পাইয়াছেন জানি না। একবার স্থ-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—টাকা পাইবার অন্য কোন উপায় আছে কি না?

স্থ—বলিয়াছিল, "না। তবে বড়দি তুমি মিছে ভেবো না, জেলে তিনি কখনই ঢুকবেন না।"

তাহার দৃঢ়তায় অবাক হইয়া ভাবিলাম, হয়ত কোন উপায় আছে, নতুবা মেয়ে হইয়া স্থ—এরূপ নির্ভাবনায় রহিল কি করিয়া?

অপরাহ্ণে স্থ—একখানি পত্র ডাকে দিবার জন্য ছোট ঠাকুরপোর হাতে দিল। ঠিকানাটা দেখিলাম, বাপের বাড়ির। ছায়ার নামে। ভাবিলাম ছোট বোনের কাছে বাবার সংবাদ জানিবার জন্য—সে এই চিঠি দিল। পরদিন সে চিঠির কোন উত্তর আসিল না। আমি আশ্চর্য্য হইলাম, স্থ-র উদ্বেগহীন মুখে প্রশান্তির একটা মাধুর্য্য দেখিয়া। তোমার ঘরে দুয়ার বন্ধ করিয়া সে অর্গ্যানের ডালা খুলিয়া দিব্য কিনা গান ধরিল!

দোরে কান পাতিয়া শুনিলাম, গানটা মোটেই করুণ নহে। গান শুনিলে মনের মধ্যে আলস্য ও ভীরুতা দূর হইয়া যায়, একটা সাহস জাগে। বার তিনেক গানটি গাহিয়া সে দুয়ার খুলিল।

আমাকে সামনে দেখিয়াই হাসিল, "কি বড়দি, চুরি করে গান শুনচো? জান, মা দেখতে পেলে আর রক্ষে রাখবেন না।"

আমি বলিলাম, "আর তোমায়?"

সে হাসিয়া বলিল, "আমি ত শাসনের বাইরে। তিনি কতবার বলেচেন, শোননি! আর গণ্ডারের চামড়া কিনা, ফোটে না!" বলিয়া হি-হি করিয়া হাসিল।

তাহাকে টানিয়া আনিয়া ভর্ৎসনার স্বরে বলিলাম, "তুই কি পাগল! কাল বাপের এই বিপদ শুনলি, আর আজ—"

সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাবার কিসের বিপদ, বড়দি? যে যেমন কাজ করে, সে তেমন ফলভোগ করবেই। তিনি মানী লোক—কেন মেয়ের জন্য খাটো হতে গেলেন!"

বলিলাম, "সন্তান যে কি জিনিষ তুই ত জানিস। ওদের জন্যে খাটো হতে বাপ মার এক তিলও লজ্জা নেই।"

স্থলতা ছুটিয়া গিয়া ছেলেকে খাট হইতে টানিয়া তুলিয়া অজস্র চুমায় তার গাল ভরাইয়া দিয়া কহিল, "আমি কিন্তু ওর জন্য একটুও খাটো হতে পারবো না—তা তোমায় বলে রাখচি, বড়দি!"

আমি হাসিলাম। পাগল আর কাকে বলে!

স্থলতার ছেলের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে—কাঁদিতেছিল। স্থলতা চুমা দিয়াও, যখন তাহাকে ভুলাইতে পারিল না, তখন আমার কোলে ছেলে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "ভাল লাগে না তোর কান্না! বড়দি, এটাকে তোমায় দিয়ে দিলুম, মানুষ করো।"

আমি বলিলাম, "তা করবো, কিন্তু তুই কাঁদবিনে তো ?"

সুলতা বলিল, "ইস ! বয়ে গেচে আমার কাঁদতে ! ও যদি নেমকহারাম না হয় ত আমার জন্যে কাঁদবে, ঠিক যেমন কাঁদচে আজকে ।"

আমি রাগ দেখাইয়া বলিলাম, "তোর কাঁদুনে ছেলে নিতে বয়ে গেচে আমার !"

সুলতা হাসিয়া বলিল, "তোমার কোন্ ছেলেটাই বা কাঁদুনে নয় ?—তবু তুমি পরম ধৈর্য্যশীলা। যদি কেউ ছেলে মানুষ করতে পারে—সে তুমি। তুমি বর্ত্তমানে বাস করলেও ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখ। জীবন তোমার কাছে কোন অবস্থাতেই দুর্ব্বহ নয়।"

এ-কথা সে যখন-তখন আমায় বলিত। তুমিই বলত ভাই, আশা নিয়ে মানুষ বাঁচে। ভবিষ্যৎ কে না দেখে !

ছেলেকে সে আমার কোল হইতে না লইয়াই ছুটিয়া উপরে গেল। না, সুলতা যদি ইহার চেয়ে খানিক কাঁদিত ত সান্ত্বনা দিয়াও আমার তৃপ্তি আসিত। যে অবস্থা স্বাভাবিক তাহার জন্য ভাবনা হয় না। দুঃখে মানুষ কাঁদিয়াই থাকে। কেহ কম, কেহ বেশি। তাই ত বড় ভয় হইতেছে। তুমি যত শীঘ্র পার চলিয়া আসিবে। এমন কাহাকেও পাইতেছি না যে, সু-র বাপের বাড়ির খবরটা নিই। সু নিশ্চিন্ত—আমি মরিতেছি ভাবিয়া। তুমি সত্বর আসিবে। এবং পার যদি এই অপ্রীতিকর ব্যাপারের একটা নিষ্পত্তি করিও। এখানকার অন্যান্য সংবাদ ভাল। কিন্তু শান্তি এতটুকু নাই। আশাকরি কুশলে আছ ? আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

"আশীর্ব্বাদিকা—বড় বৌদি।"

তপনের পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি ?"

তপন কোন কথা না বলিয়া চিঠিখানি সুবোধের কোলের উপর ফেলিয়া দিল। সমস্ত পড়িয়া সুবোধের মুখেও ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিল। কহিল, "তাই ত! আজকের গাড়ি সেই রাত দশটায়!"

তপন কহিল, "তা হোক, আজই আমায় যেতে হবে।"

সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল, "দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?"

তপন বলিল "কর!"

সুবোধ প্রশ্ন করিল, "তোমার মেজ বৌদির বাপের নাম কি?"

তপন নাম বলিলে সুবোধ ঈষৎ চমকিত হইয়া বলিল, "ও—! তিনি?"

তপন বলিল "তুমি তাকে চেন নাকি?"

সুবোধ বলিল, "চিনতাম। ওঁদের বাড়ির পাশেই আমাদের মেস ছিল।"

তপন জিজ্ঞাসা করিল, "চিঠি পড়ে তোমার কি মনে হয়?"

সুবোধ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তোমার যাওয়া উচিত।"

তপন বলিল, "কিন্তু আমি কি উপায় করতে পারবো!"

সুবোধ বলিল, "হয়ত কোন উপায়ই তোমাদ্বারা হবে না, তবু তোমার যাওয়া উচিত।"

তপন ভীত স্বরে বলিল, "এ-কথার মানে কি—সুবোধ-দা?"

সুবোধ বলিল, "আমিও তোমার সঙ্গে যাব। জানি না কতটা সাহায্য আমায় দিয়ে হবে—, তবু যাব।"

তপন ব্যাকুল স্বরে বলিল, "তোমার কি মনে হয়, সুবোধ-দা?"

সুবোধ বলিল, "মনে ত অনেক কিছুই হয়। তোমার বড় বৌদির মত একটা ভয় জাগচে, কিন্তু সে অনুমান! মিথ্যে হতেও পারে।"

—"তবু—কি ভয়?"

সুবোধ ধীরস্বরে বলিল, "এ-অবস্থায় আত্মহত্যা করা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।"

শুনিয়া তপন আঁৎকাইয়া উঠিল, "কি হবে সুবোধ দা?"

সুবোধ তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া সান্ত্বনার ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিল, "ভয় কি? জীবন এত হেলা-ফেলার নয় যে টপ্ করে তাকে দেহ থেকে বার করে দেওয়া যায়। তিনি জ্ঞানবান, পিছনে তাঁর বিপুল দায়িত্ব—একটা সংসার। তিনি কখনই এমন কাজ করবেন না।"

তপন ঈষৎ আশ্বস্ত হইল।

সুবোধ বলিল, "বোস, আমি কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করে দু' একটা কাজ সেরে আসি।"

এই মুহূর্ত্তে যদি উড়িয়া কলিকাতায় যাওয়া চলিত! কলকব্জার যুগেও মানুষের এমন পরাধীনতা মোটেই সহ্য হয় না। সকালে, সন্ধ্যায়, দুপুরে, রাত্রিতে, অন্ধকারে বা চন্দ্রালোকে পল্লীর বিচিত্ররূপ মনের একটা অমূল্য সম্পদ। কাল সন্ধ্যাবেলায় কালবৈশাখীর প্রচণ্ড তাণ্ডবও উপভোগ করা গিয়াছিল। মরুভূমিতুল্য রাজধানীর সবুজশ্রীহীন রাজপথে ধূমমলিন আকাশসীমায় বন্দিনী প্রকৃতি নিতান্ত অনিচ্ছায় প্রতিদিন হাজিরা দিয়া থাকেন। তাঁর সে উদয়ে এতটুকু উল্লাস নাই, এতটুকু আগ্রহ নাই। নিবিড় অন্ধকারের মাধুর্য্যগুণ্ঠনে কোনদিনই রাজধানী মুখ ঢাকে না, লক্ষদিকে তার আলোর সুতীক্ষ্ণ তীর। বসিয়া বসিয়া এই পল্লীসৌন্দর্য্য উপভোগ না করিলে জীবনই বৃথা। কিন্তু এই উদ্বেগ-আশঙ্কার মুহূর্ত্তে সত্বর প্রতিকারের ব্যবস্থা রাজধানী করিয়া রাখিয়াছে। বিজ্ঞান,—মানুষকে যতটা পারে উদ্বেগহীন করিয়া স্বাচ্ছন্দ্য দিয়াছে।

একখানা এরোপ্লেন যদি পল্লীতে থাকিত ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা উদ্বেগ বহিয়া শুকাইতে হইত না!

যদি অপমান লাঞ্ছনার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য সংসারকে—ছায়ার পিতা তুচ্ছজ্ঞানই করেন? মায়া-মমতার ডোর কাটাইয়া যদি-ই বা তিনি আত্মঘাতী হন, ছায়ার কি হইবে? অসহায়া আশ্রয়হীনা তরুণী! বেথুন হইতে শ্যামবাজার স্যাণ্ডাল-পায়ে হাসিমুখে গল্প করিতে করিতে প্রতিদিন পথ অতিবাহন করে। সে হাসি-গল্প—বুঝি অকস্মাৎই শুকাইয়া যাইবে। ভাবনাহীন জীবনের উপর কালো যবনিকাখানি ধীরে ধীরে নামিয়া আসিবে এবং সেই আঁধার-যবনিকার অন্তরালে অজানা নক্ষত্রটির মত তার জ্যোতি নীরবে মিলাইয়া যাইবে!

কাল রাত্রিতে নারীকে তপন ঘৃণা করিয়াছে। তরলমতি আনন্দ-উপবনে বসন্তের প্রজাপতি! যেখানে ঐশ্বর্য্যের আলো, সেইখানেই রঙীন বেশে নারীর আবির্ভাব? সমুদ্রমন্থন হইতে সেই যে সংগ্রাম সৃষ্টি-প্রত্যূষে আরম্ভ হইয়াছে, আজিও নারীকে লইয়া সে যুদ্ধের বিরতি ঘটিল না! না, সন্ধি উহারা করিবে না। জীবনকে উদ্দাম করিয়া, বিক্ষোভিত করিয়া, সফেন সমুদ্রতরঙ্গের মত উপকূলে কোলাহল তুলিয়া প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত—প্রাণের সন্ধানে অমনই ব্যাকুল করিয়া রাখিবে।

আগুন জানিয়াও পতঙ্গ ঝাঁপ দিতে দ্বিধাবোধ করে না! দুঃখ জানিয়াও ব্যর্থতা বুঝিয়াও নারীকে কামনা না করে কে?

যদি অমনই একটা দুর্ঘটনা ঘটে, ছায়ার পাশে সেই ঘনঘোর দুর্দ্দিনে তপনকে দাঁড়াইতে হইবেই। অতীতকে ভুলিতে হইবে, বোটানিক্যাল গার্ডেন মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। তরুণকে বাধা দিবার জন্য দুর্ভেদ্য বর্ম্মজালে দেহ আবৃত করিতে হইবে। ছায়ার পাশে দাঁড়াইবার একমাত্র অধিকার—তপনেরই। কাল রাত্রিতে নারীর যে-রূপই

চোখে পড়ুক, যত দুঃসাহসিকতা বা বজ্রবিদ্যুৎভরা ঝটিকাময়ী রাত্রির বিভীষিকাই সে বহন করিয়া আসুক, ছায়াকে সে শান্ত দিনের পরিপূর্ণ আলোর মধ্যে একান্ত নির্ভরশীলা নারীর মতই বক্ষোসান্নিধ্যে টানিয়া লইবে। ছায়া তপনের বুকে মাথা রাখিয়া অজস্র ধারা মুক্ত করিয়া দিবে ; তপন সান্ত্বনা দিবে ! এত বড় সুখ জগতে দুর্লভ নহে কি ?

আসন্ন বিদায়কালে এত বিরূপতা সত্ত্বেও মৃদু বেদনা অনুভূত হইল। মা অশ্রুভেজা কণ্ঠস্বরে—এখানে আসিবার জন্য তপনকে অনুরোধ করিলেন। আভা বিষন্ন মুখখানি লইয়া চৌকির ধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গৃহপালিত মার্জ্জারটির মুখেও বিদায়-বেদনার ছায়া ! প্রকৃতি পর্য্যন্ত মানুষের দীর্ঘনিশ্বাসে মলিন হইয়া উঠিয়াছেন !

স-পল্লব আমের ডাল জলপূর্ণ ঘটের উপর রাখিয়া মেঝেয় দু'খানি আসন বিছাইয়া মা সুবোধ ও তপনকে বসিতে বলিলেন। তাহাদের সম্মুখে ছোট রেকাবে জলখাবার নহে, কিছু সিদ্ধির গুঁড়া ও শুকনা বিল্বপত্র এই মাত্র আভা শিবমন্দির হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। দুপুরে পাতা খানিকটা দই—এক পাশে রহিয়াছে।

মা দু'জনের কপালে দইয়ের ফোঁটা দিয়া সিদ্ধি দাঁতে কাটিবার উপদেশ দিলেন। এবং শুকনা শিব-নির্ম্মাল্য মাথায় ঠেকাইয়া দু'জনের জামার পকেটে সন্তর্পণে রাখিতে বলিলেন।

কালী, দুর্গা, গণেশ, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি শুভবিধায়িনী দেবদেবীর নাম উচ্চারণ করিয়া গৃহদ্বারে স্থাপিত জলপূর্ণ ঘট দর্শন করিতে বলিলেন। সর্ব্বোপরি শিরশ্চুম্বনে সর্ব্বাঙ্গে ঘেরিয়া দিলেন অপূর্ব্ব অক্ষয় মাতৃস্নেহ।

তপন বড় তৃপ্তিতেই মায়ের পায়ে মাথা নামাইল।

ভাবিল, এই দুর্ব্বল অক্ষম স্নেহ দেখিয়াই কি কবি গাহিয়াছেন :—

'সপ্ত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী—
রেখেছ বাঙালী করি, মানুষ করনি।'

কবি যাই বলুন, দেশ-মার এমন প্রতীক, সশঙ্কিত স্নেহের এমন অপরূপতা বিশ্বের কোথায়ই বা আছে?

আভা প্রণাম করিতেই তপন বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরাইতে পারিল না। বিদায়ক্ষণে আভার মুহূর্ত্তের ভুলকে বড় করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি তাহার হইল না। একটা অনুকম্পা জাগিল,—আহা! দুর্ব্বলা!

আভা বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "গিয়ে চিঠি দেবেন।"

ঘাড় নাড়িয়া তপন স্বীকার করিল।

সন্ধ্যা না হইলেও মা ও আভা ছেলেদের সঙ্গে বহুদূর পর্য্যন্ত আসিলেন। নীরবে—নিঃশব্দে বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতে করিতে চারিটি প্রাণী মোড়ের মাথায় টিউবওয়েলের কাছ পর্য্যন্ত আসিলেন। তারপর ভিন্ন পাড়া। ট্রেনের সময় কম বলিয়া এ বিদায় আরও মর্ম্মস্পর্শী হইল।

মোড় ফিরিবার মুখে তপন পিছন ফিরিয়া দেখিল, মা ও আভা মাটির মূর্ত্তির মত এদিকে তাকাইয়া ঠায় দাঁড়াইয়া আছেন। কালিকার ঝঞ্ঝা-বিদীর্ণ তালগাছের মতই—অসহায়—অনিমেষ।

* * *

এত ভোরেই ট্রেনখানা প্ল্যাটফরমে ঢুকিল।

নিদ্রিত শহর সবেমাত্র পাশ ফিরিতেছে। স্টেশনের সূর্য্যপ্রভান্বিত বিদ্যুৎ-আলোগুলা কোথাও অন্ধকার রাখে নাই; উৎসব-দিনের ঔজ্জ্বল্য ও প্রাচুর্য্য তার দীপ্তিতে। কুলির কোলাহল ও এঞ্জিনের দীর্ঘনিশ্বাসে ঘুমক্লান্ত যাত্রিদল চোখ মুছিতে মুছিতে মোটঘাট নামাইতে লাগিল।

তপন ও সুবোধ বাহিরে আসিয়া দেখিল, পিঙ্গল উষার প্রকাশ শহরের পথে ও পান্থশালায়। স্ক্যাভেঞ্জার গাড়ির ঘড় ঘড় শব্দে গ্যাস নিবানোর ঠকাঠক শব্দ মিশিয়া গিয়াছে, পাইপের আগায় ছড়্‌ছড়াৎ জল ছড়ানো হইতেছে। উৎকলী ও পশ্চিমারা মিলিয়া শহর-প্রভাতের অভ্যর্থনা-আয়োজনে ব্যস্ত। আর একটু পরে ঘর্ঘর নাদে ট্রাম চলিবে, ঝক্ ঝক্ শব্দে বাস্ দৌড়াইবে। মোটরের ভেঁপু, রিকশার ঘণ্টা, ঘোড়ার গাড়ির ঝর্‌ঝরাণি—সমগ্র শহরকে উত্তপ্ত ও মাতাল করিয়া তুলিবে। কর্ম্মক্ষেত্রে কেরানী ছুটিবে দলে দলে। সারাদিন ও রাত্রির মধ্যযাম পর্য্যন্ত এই ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি, কোলাহল-কলরব অবিছিন্নভাবে চলিবে। তারপর শান্তি।

মরা—পাংশু প্রভাত! অবজ্ঞাভরে শহরবাসীরা চাহিয়াও দেখে না! অট্টালিকা-অরণ্যের মাঝে দিনদেব যখন নয়নপথবর্ত্তী হন, তখন বিপুল কর্ম্মের তাড়ায় চোখ মেলিয়া সেদিকে চাহিবার অবসর নাই। কর্ম্মহীনেরা মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে তাঁর প্রখরতা ভাল করিয়াই অনুভব করে।

কাজের লোকের কাছে তিনি থাকিয়াও নাই। আপিসের ছুটি অন্তে রৌদ্রের একটুকুরাও পথে পড়িয়া থাকে না। কাজের লোকের মুখে তখন ছোট সংসারের অভাব-অভিযোগ, হাতে মুদি-মশলার দোকান!

গাড়িবারান্দায় একখানা ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল।

তপন হাতল ঘুরাইয়া ভিতরে গিয়া বসিল ও সুবোধকে বসিতে বলিল। সুবোধ আপত্তি করিল, "এইটুকু ত পথ—হেঁটেই যাই না!"

তপন বলিল, "না সুবোধ-দা, যতই বাড়ির কাছে আসচি—ততই আমার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করচে। না জানি কি দেখবো গিয়ে। তুমি আমার বাড়ি পর্য্যন্ত চল।"

সুবোধ আর কোন কথা না বলিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিল। পথে কেহ কোন কথা বলিল না।

মিনিট কয়েকের মধ্যে বাদুড় বাগানের গেটওয়ালা বাড়ির মধ্যে হর্ণ দিয়া ট্যাক্সিটা ঢুকিয়া পড়িল।

ভাড়া মিটাইয়া দিয়া তপন আর এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারিল না। শহরের প্রভাতের মতই বাড়িটা বিষণ্ণ ও বাক্‌হীন। উষার আলোয় বিদ্যুৎ-আলোও জ্বলিতেছে। বৈঠকখানায় অনেকেই যেন বসিয়া আছেন ও চাপা কথায় কি-সব আলোচনা করিতেছেন। গতপরশ্ব রাত্রির ঝড় এখানেও বহিয়া গিয়াছে। বাগানের বহু তরু উন্মূলিত, শাখাপত্র বিপর্য্যস্ত; টেনিস গ্রাউণ্ডের উপর জলও খানিকটা জমিয়া আছে। আকাশের থমথমে ভাবটা যেন বাড়ির মাথায় চাপিয়া বসিয়াছে! প্রভাতবেলায় কক্ষে কক্ষে অলো জ্বলিতে দেখিলে কাহার মন না আশঙ্কায় মুহ্যমান হয়?

বৈঠকখানার পাশের ঘর হইতে বড়দা বাহির হইলেন। চুলগুলি রুক্ষ, চোখ ফোলা, মুখের ভাব উদ্বেগ-ব্যাকুল। সারারাত্রি দুশ্চিন্তায় কাটাইলে যেমন হয়—তেমনই বিশৃঙ্খল বেশবাস!

তপনকে দেখিয়া কহিলেন, "এসেচিস, আয়।"

তপন প্রশ্ন-ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিল।

তিনি সুবোধের পানে চাহিয়া বলিলেন, "কাল একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেচে। মেজ বৌমা হঠাৎ মারা গেলেন।"

তপন কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িতেছিল সুবোধ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছিল?"

—"কলেরা। আসল এশিয়াটিক কিনা, আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ।"

তপনের অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "ওকে ধরে পাশের ওই ঘরটায় নিয়ে আসুন ত; আমি ফুল আনতে যাচ্ছি। এই রামপিয়ারি—গাড়ি লাগাও।"

মোটরে চাপিয়া বড়দা ফুল আনিতে চলিলেন। ওদিকে অট্টালিকার মাথায় সূর্য্যদেবও উঠিলেন। ঘরের মধ্যে তখনও বিজলীবাতি জ্বলিতেছে।

সূর্য্যের আলোকে সে-দীপ্তি বিগত-জীবন। প্রভাত যে কোনদিন এমন কদর্য্য কুৎসিত রূপে দেখা দিতে পারে এ ধারণা কেই বা করিয়াছিল?

দামী মেহগনি খাটখানাই বাহির করা হইল। চকচকে পালিশ এখনও উঠে নাই, হয়ত বছর কয়েক পূর্ব্বে ফুলশয্যার রাত্রিতে ওই খাটে শুইয়া নবদম্পতি সংসারের রঙীন স্বপ্ন দেখিয়াছিল। সাদা ধবধবে বিছানা—সুলতার নিজের হাতে সেলাইকরা ঝালর দেওয়া বালিশ; বালিশের কোণে সবুজ সুতার লতাপাতা ও লাল সুতার ছোট ফুল। চমৎকার কারুকার্য্য। সেই বালিশেই মাথা রাখিয়া সুলতা শুইয়াছে। এত লোকের সামনে লজ্জা-নিমীলিত নয়নে অরুণরাগ ফুটে নাই; স্থির, শান্ত, উদ্বেগহীন বিশ্রামের এক সুপ্রশান্ত ছায়া। সিঁথিতে সিঁদুর, মাথার খোঁপা পরিপাটী করিয়া বাঁধা, কানে দুল। গলায় মফ্‌চেন—দামী ঢাকাই শাড়ির উপর বেশ মানাইয়াছে। এয়োতির লোহা ও গাছকতক বরফী-কাটা চুড়িশোভিত বামহাত খানি বুকের উপর আড়াআড়িভাবে স্থাপিত, ডান হাত বিছানার উপর শিথিল ভাবে ন্যস্ত। কোমর পর্য্যন্ত সুদৃশ্য সিল্কের চাদর প্রসারিত। পায়ের পাতা দু'খানি বাহির হইয়া রহিয়াছে, আলতায় লাল টুকটুকে। চারু এইমাত্র তাহার সুবাসিত তরল আলতার শিশি উজাড় করিয়া ঐ দু'খানি পা রাঙাইয়া দিয়াছে।

ফুল এখনও আসে নাই। আসিলে সুলতা কুসুম-আভরণে সাজিবে। সোনার গহনা তখন হয়ত দেহে থাকিবে না।

কর্ত্তা সে-কথা একবার বলিয়াছিলেন, কিন্তু গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে জানাইয়াছিলেন, "বড় আদরের বউ, এয়োরানী ভাগ্যিমানী। ওর হাত খালি করতে কিছুতেই পারবো না গো। সেখানে তোমরা যা হয় করো, আমায় যেন চোখে না দেখতে হয়।"

সুতরাং গহনা খোলা হয় নাই।

শাশুড়ী যে স্নেহশীলা এ-কথা চারুও পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই। দামী খাট, শাড়ি, বিছানা, বালিশ কিছুই তিনি সরাইতে দিলেন না। বড় বাড়ির বউ—স্বামী বর্ত্তমানে বৈকুণ্ঠধামে চলিল বলিয়াই ইহকালের তুচ্ছ সম্পদকে তিনি যৎকিঞ্চিৎ গৌরবস্বরূপ উপহার দিলেন। অথচ কয়দিন পূর্ব্বে সুলতার বাপ তাহার শ্বশুরের পায়ে ধরিয়াও মন গলাইতে পারেন নাই। সেদিন তাঁর মন গলিলে সুলতাকে—অকালে হয়ত এমন সৌভাগ্যবতী হইতে হইত না।

আশ্চর্য্য ছেলেটা! চারুর কোলে উঠিয়া পরম আরামে স্তন্যপান করিতে করিতে চোখ বুজিয়াছে—একবারও কাঁদে নাই। সুলতা সংসারে আসিল, কিন্তু স্বপ্ন দেখিল না। না ছেলে, না স্বামী, না বা সুখ-ঐশ্বর্য্য—কোন কিছুরই মায়ারজ্জু তাহার জীবনকে বাঁধিতে পারিল না। নির্দ্দয়া সে দিনের মুখের কথার মতই অনায়াসে মায়া কাটাইল। যাক, চলিয়া যাক, চারু কাঁদিবে না। এমন নিষ্ঠুর যে—তাহার জন্য কাঁদিয়া মরা কেন? কিন্তু অশ্রু বড় অকরুণ। পায়ে আলতা পরাইবার কালে, সিঁথিতে সিঁদুর লেপিবার সময়ে বড় বাদই সাধিল। দৃষ্টি জলে ঝাপসা হইয়া উঠে, লাল রঙ ফ্যাকাশে হইয়া যায়। সুলতার রক্তহীন মুখের পানে চাহিয়া চারুর অন্তর বুঝি বিদীর্ণ হইয়া গেল। চুপি চুপি নহে, ইচ্ছা হয়—ওই বুকে আছাড় খাইয়া পড়িয়া—ওই মুখখানি চাপিয়া ধরিয়া হাহাকার করিয়া সে একবার কাঁদে। মাত্র একবার। মা যেমন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছেন—অমন কান্না নহে, আরও গভীর, আরও আর্ত্ত, আরও সকরুণ বুকভাঙ্গা।

তপন একবার মাত্র সে-মুখ দেখিয়া ছোট ঘরের খাটে মুখ গুঁজিয়াছে, সুবোধ তাহাকে শান্ত করিতে পারে নাই।

বহুক্ষণ পরে তপন মুখ তুলিয়া কহিল, "তুমি জান না সুবোধ-দা—মেজ বৌদির সঙ্গে এ বাড়ির হাসির পাট উঠলো।"

সুবোধ বিষণ্ণ-গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "জগতের নিয়মই এই। সদ্য বিয়োগটা বড় তীব্র হয়েই বাজে, তারপর—আবার সব ঠিক হয়ে যায়।"

তপন বলিল, "কিন্তু এমন চোখের সামনে মৃত্যু—"

সুবোধ বলিল, "তুমি মৃত্যু কখনও দেখনি হয়ত। নশ্বর জীবনে একটা চৈতন্যের মতই সে আসে, কিন্তু সংসার সে-চৈতন্যকে বেশিক্ষণ জেগে থাকতে দেয় না। একমাত্র ছেলে হারিয়ে বাপ তাই বেঁচে থাকে, স্বামীকে হারিয়ে বিধবারা দীর্ঘজীবন লাভ করে।"

তপন আকুলকণ্ঠে বলিল, "তবু এ খেলা কেন প্রকৃতির?"

সুবোধ বলিল, "মৃত্যুকে সব চেয়ে বড় বেদনা বলে মনে করচো কেন? বেঁচে থাকার মধ্যে ব্যর্থ জীবনে যে-ব্যথা দুঃসহ হয়ে ওঠে—মরণ অনেক সময় তাকে শান্তি দেয়। মরণ অনেকেরই বন্ধু; এ-সব কথা এখন থাক। আমি একবার তোমাদের বাগানটা ঘুরে আসি। দেখি কিছু ফুল পাই কিনা।"

সুবোধ চলিয়া গেল এবং অনতিবিলম্বে একগোছা জুঁই ফুল লইয়া ফিরিয়া আসিল।

তপনকে বলিল, "একবার ওঠ; এই ফুলের গোছা ওঁর শিয়রে রেখে আমি চলে যাব।"

তপন উঠিলে সুবোধ তাহার হাতখানি ধরিয়া অনুনয় করিয়া বলিল, "আর একটা কথা। শ্মশানে চিতায় যখন ওঁর দেহ তুলে দেবে, এই ফুলের গোছাটিও দিতে ভুলো না। না, না, শ্মশানে তোমায় যেতেই হবে—আমার এই অনুরোধ।"

তপন সবিস্ময়ে সুবোধের পানে চাহিল। সুবোধের সংযম-রেখাঙ্কিত কপালে কতকগুলি শিরা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মুখের শ্যামলতায় রক্তের অজস্রতা রঙকে গাঢ়তর করিয়াছে এবং বিস্তৃত দুই চোখের তারা

অনিবার্য্য অশ্রুপতনকে রোধ করিয়া লাল ও বিস্তৃততর হইয়াছে। সুবোধের মুখখানিতে প্রলয়বন্যার আসন্ন উদ্বেলতা। থর থর করিয়া হাতের ফুল কাঁপিতেছে।

তপন তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "একটু বোস, সুবোধ-দা, একটু বোস।"

সুবোধ নিঃশব্দ-হাসির মধ্যে বুকের বেদনাকে বাহির করিয়া দিয়া কহিল, "বোসবো। না রে, আমি অল্পেতে ভেঙ্গে পড়ি না। অনেক, অনেক সহ্য করতে পারি। এই বাইসেপসের মতই শক্ত বুক! চল, ফুলটা রেখে আসি।"

তপন বলিল, "সুবোধ-দা, একটা কথা—"

সুবোধ বলিল, "না, কোন কথা নয়। আমার জীবন-ইতিহাসের শেষ অধ্যায় লেখা হয়ে গেল। যিনি লিখলেন, তিনি, সেই অন্তর্য্যামী জানেন—এর বেদনা। কিন্তু ভাই, মানুষের কাছে সে নালিশ জানিয়ে কি লাভ! যা গেল—তা ত গেলই।"

তপন বলিল, "তোমার কথা শুনে সাহস করে আমিও যেন দুঃখ করতে পারচি নে। এত তীব্র ব্যথা বুকে পুরে কি করে বেড়াচ্ছিলে সুবোধ-দা!"

সুবোধ বলিল, "ছুটোছুটি করে কোন লাভ নেই বলে। তপন, একটা কথা জেনে রাখ, নিজের দুঃখের কথা বলে কখনও পরের সহানুভূতি লাভ করবার চেষ্টা করো না। পৃথিবীতে ওর মত হাস্যাস্পদ আর কিছু নেই।"

তপন বলিল, "আশ্চর্য্য যুক্তি!"

সুবোধ বলিল, "পৃথিবীর সবই আশ্চর্য্য। জন্ম, মৃত্যু, বাসনা—কোনটা বা নয়? মহাভারতে ধর্ম্মরূপী বক—যুধিষ্ঠিরকে এই পরমাশ্চর্য্যের প্রশ্ন করেছিলেন।"

তপন বলিল, "তুমি কেন আমাদের সঙ্গে শ্মশানে চল না?"

সুবোধ একটু থামিয়া ব্যথাভরা দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, "আমি মানুষ, সহ্যের সীমা বিধাতা আমারও নির্দ্দেশ করে দিয়েচেন। পাছে সেই অসংযত মুহূর্ত্তে কাউকে খাটো করে ফেলি—এই আমার ভয়। কেন, তুমি পারবে না?"

তপন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "পারবো। তুমি যা বললে না সে-কথা আমি বুঝেচি, সুবোধ-দা।"

১৯

সুবোধ ত্রস্তস্বরে বলিল, "যদি বুঝে থাক, ও-কথা ভুলেও উচ্চারণ করো না!"

তপন অল্প উত্তেজিত হইয়া বলিল, "কিন্তু সংসারের সর্ব্বত্রই এই অবিচার। নারীর জন্য পুরুষকে অনেক সইতে হয়। নারী সৃষ্টির অভিশাপ।"

সুবোধ বলিল. "নারী দেবী। ওঁরা বিশ্বসৃষ্টির আশীর্ব্বাদ। তুমি জান না ভাই, ওঁরা যা সহ্য করেন—সর্ব্বংসহা ধরিত্রীও তা সইতে পারেন না।"

তপন মাথা নাড়িয়া বলিল, "না। নারীর ত্যাগ সাময়িক উত্তেজনা ছাড়া আর কিছু নয়। সহমরণ বা জহরব্রত তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পুরুষের চেয়ে নারী বেশি আত্মঘাতিনী।"

সুবোধ বলিল, "ও-সব তর্ক এখন থাক। আমি শ্রদ্ধা ছাড়া নারীকে আর কিছু দিতে পারি না। নারী মা, নারী ভগ্নী, নারী প্রিয়া। স্নেহে প্রেমে তার তুলনা দেওয়া মিছে।"

তপন বলিল, "অদ্ভুত শ্রদ্ধা তোমার! চোখের উপর যা দেখচি—"

সুবোধ বলিল, "চোখের দেখায় মন অনেক সময় সায় দেয় না, তপন।"

তপন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তা দেয় না। চোখের ভালকে যদি এড়িয়ে চলতে পারতুম ত জীবনে অনেক দুঃখকষ্ট আমাদের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারতো না। এ-মোহ কি কিছুতে যাবার নয়, সুবোধ-দা?"

সুবোধ জানালার বাহিরে বড় আমগাছটার পানে আঙুল নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ওর মোহ নেই অথচ জীবন আছে। নিস্পৃহ—নিরাসক্ত—আনন্দহীন জীবন। কিন্তু মানুষ গাছ নয়। দুঃখের উদ্বেগ ও সুখের শান্তি দুই-ই তার জীবনের পরিপূর্ণ সম্পদ্।"

তপন বলিল, "কিংবা অন্ধপ্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ-করাকে সে গৌরব মনে করে। কতকগুলো মানুষ আছে—যারা সংসারে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে ভালবাসে। যে-কোন অবস্থায় ত্যাগ তাদের কাছে মূল্যবান। তুমি এদেরই দলে।"

সুবোধ ম্লান হাসিয়া বলিল, "ভাগ্য অনেক সময় জীবনগতি নির্দ্দেশ করে। এ-সব কথা এখন থাক, ওই শোন মোটরের শব্দ, বড়দা ফিরে এলেন বোধ হয়।"

তপন বলিল, "তবু আশ্চর্য্য সুবোধ-দা, ওই ত্যাগকে, সংযমকে মানুষ শ্রদ্ধা না দিয়ে পারে না। এই থেকে অপরে কর্ত্তব্য শিক্ষাও করে থাকে! নিজের জীবনে যে জ্বালাকে মনে হয় অসহ্য, অপরের জীবনে সেই নিরুপায় সহ্যশক্তিকে সংযম বলে আমরা শ্রদ্ধা দিয়ে থাকি! আশ্চর্য্য নয়?"

সুবোধ কোন কথা কহিল না।

তপন একটু থামিয়া বলিল, "নারীর সহিষ্ণুতা প্রবাদবাক্যের মত। কিন্তু আমরা জানি, দুর্ব্বল বৃত্তির ভারে বেশি নুয়ে পড়ে বলেই অল্প সহ্যই তার পক্ষে প্রচুর। তাই তার স্তুতিবাদ! কিন্তু বাইরের সংঘাত-বিক্ষোভ—

পুরুষ যা সয়, হাসিমুখে পুরুষ যা অগ্রাহ্য করে—নারী সেইখানে হয় আত্মঘাতিনী।”

সুবোধ তথাপি কোন উত্তর দিল না। তর্ক করিবার প্রবৃত্তি যেন তাহার নাই। যাহার পর পরিসমাপ্তির ছেদ, তাহার পরই বই বন্ধ করিবার কথা। খানিক ভাবিবার কথা।

তপনের মনে বিক্ষোভ জাগিয়াছে। নারীকে সে প্রথম ভালবাসিতে শিখিয়াছে, প্রথম হৃদয়-দ্বন্দ্ব অনুভব করিতেছে। এই সব কোমল মুহূর্ত্তে মন যে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও চঞ্চল হইয়া পড়ে—এতো স্বতঃসিদ্ধ কথা। মোহকে লালন করিবার প্রবৃত্তি উদ্দাম হইয়াই জাগে। পৃথিবী কখনও পরম স্নেহে আত্মীয়ার মত শান্তিদায়িনী, দারুণ সন্দেহে কখনও বা বেদনা-বিধায়িত্রী। ক্ষুদ্র স্মৃতিতে কখনও কুসুমমাল্য রচনা চলে, কখনও বা কণ্টকক্ষতের জ্বালা। গ্রীষ্মের প্রখর তাপে পুড়িয়া বা বর্ষার অবিশ্রান্ত ধারায় ভিজিয়া কিংবা দুর্জ্জয় শীতে কাঁপিয়া—মানুষ সেই মুহূর্ত্তে প্রকৃতিকে অভিশাপ দিয়া থাকে, কিন্তু গ্রীষ্ম, বর্ষা বা শীতের স্মৃতি—মোহের মত তাহার মনকে প্রীতির আস্বাদ দিতেও ভুলে না।

তপন সুবোধের বেদনাতুর মুখের পানে চাহিয়া আর তর্ক চালাইল না। তাহার হাত হইতে জুঁইফুলের গোছাটা লইয়া কহিল, “চল না একবার ও-ঘরে।”

মাথা নাড়িয়া সুবোধ অসম্মতি জানাইল। যে কাহিনী অসমাপ্ত রহিয়া গেল—এ-জীবনে ক্রন্দন বা দীর্ঘনিশ্বাস ঢালিয়া তাহাকে লোকচক্ষে করুণ করিয়া কি লাভ?

সুবোধ চলিয়া গেল।

ফুলের গুচ্ছ নাড়িতে নাড়িতে তপন ভাবিল, সে কাপুরুষ, না নির্ম্মম? জলে-ভেজা জুঁই গন্ধভরা; ক্ষুদ্র, শুভ্র, অনাড়ম্বর। সুবোধের শেষ

কামনার মতই কলুষহীন। Sentimental সুবোধের এই সংযম হয়ত বা অদ্ভুত বিলাস। ব্যর্থ-জীবনের হাহাকার মাপিয়া, মরা-ভালবাসার ধ্যান করিয়া সুবোধের মত দৃষ্টান্ত দেখাইতে প্রত্যেক সংসারীই গৌরব বোধ করে। কিন্তু মানুষের কি গৌরব তাহাতে? মৃতের জন্য কাঁদিয়াই যদি জীবনের মেয়াদ শেষ হইল, সুখের জন্য মানুষের এ কাঙালপনা কেন? সুবোধ হয় ত বলিবে, টাকা জমাইয়া যাহারা সুখী, দানশীলের চোখে তাহাদের মত দুঃখী পৃথিবীতে কেহ নাই। কিন্তু দাতার সুখে কৃপণের চোখেও কি অমনই জলধারা ফাটিয়া পড়ে না? সুতরাং সুবোধের একনিষ্ঠতা বা ভালবাসাকে বিলাস বলিয়া এক কথায় মনুষ্য-জীবনের নির্দ্দেশ করার মত দুঃসাহস আর নাই।

বৌদির চিতায় এই ফুলের গোছা তুলিয়া দিয়া সে আজ শ্রদ্ধা নিবেদন করিবে। অনাগত জীবনে ত্যাগ যদি কোনদিন আসে ত এমনই মহিমময় মূর্ত্তিতে যেন সে আবির্ভূত হয়। এমনই শুভ্র অকলঙ্ক ক্ষুদ্র জুঁইয়ের মত শুচিতায় ও গন্ধে সুস্নিগ্ধ, এমনই নয়নের অন্তরালে সুদুষ্কর তপস্যার মত সুদুর্লভ ও মহিমাব্যঞ্জক—এবং প্রচারহীন গৌরবে গরীয়ান্।

* * *

এই মর্ম্মান্তিক দৃশ্যের করুণ ইতিহাসটুকু তপন অবশেষে শুনিল।

চারুর মুখেই শুনিল।

দিন দুই পূর্ব্বে সুলতার পিতা টাকার যোগাড় করিতে না পারিয়া লোক চক্ষুর অবজ্ঞেয় দৃষ্টি এড়াইতে আত্মহত্যা করিয়াছেন। পিছনে প্রকাণ্ড সংসার তাঁহার মুখ চাহিয়া বসিয়াছিল, স্নেহ-ভালবাসার সহস্র শিকড়ে আঁকড়াইয়া প্রতিদিনকার জীবন—মমতার রসধারা পান করিয়া পুষ্ট হইতেছিল, সে-সব একবারও ভাবিলেন না। নিজ জীবনের মর্য্যাদাকেই বড় করিয়া বুঝিলেন।

এই কাজ কাপুরুষের। স্বার্থপরতা হইতে এই মনোভাবের সৃষ্টি। যাক্, তিনি ত চক্ষু মুদিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এত বড় সংসারটাও ভাঙ্গিয়া দিয়া গেলেন। ছায়া নিরাশ্রয়া। সুলতা এ-আঘাত সহ্য করিতে পারিল না, পিতার পথগামিনী হইল। না হইয়াই বা সে করিত কি? এত বড় অবমাননার পর এ-বাড়িতে একদণ্ডও বাঁচিয়া থাকা তার পক্ষে পলে পলে মৃত্যুর সমান হইত! এ বিবাহ-প্রস্তাব সে-ই করিয়াছিল। অবশ্য কন্যাস্নেহমুগ্ধ পিতা এতটা নতিস্বীকার করিবেন—সুলতা ভাবিতে পারে নাই। চোখের সম্মুখে সেদিন যখন সুলতার আত্মবিশ্বাস চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল, তখনকার প্রচণ্ড আঘাত সে সহিতে পারে নাই। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। জ্ঞান হইবার সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্যও তাহার স্থির হইয়া গিয়াছিল। শুষ্ক বিশীর্ণ অধরে তাই হাসির রেখা ফুটিয়াছিল, পিতার জন্য একবারও সে ভাবে নাই। চারু পত্রে তাহার যে-সব অসংলগ্নতা দেখিয়া শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিল—কার্য্যকারণ-পরম্পরায় আজ মনে হইতেছে—তার চেয়ে স্বাভাবিক আর কিছু হইতে পারিত না। তেমন দিনে সুলতা গান গাহিল, নিজের ছেলে পরকে বিলাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল; পিতার সংবাদ সংগ্রহের জন্য কিছুমাত্র ব্যাকুলতা তাহার মুখে ফুটিল না। চারু বুঝিতে পারে নাই—এ-সব বিদায়ের আয়োজন।

তপনের চোখের সম্মুখ হইতে ধীরে ধীরে সংসারের যবনিকা উঠিতেছে। মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে সুলতার যন্ত্রণাকে সুশীতল করিতে আসে নাই। জ্বালা সহিতে না পারিয়া অভাগিনী আত্মঘাতিনী হইয়াছে। বাহিরের কেহ এ-কথা জানে না। অর্থমহিমায় নারীর পরম কাম্য সৌভাগ্য লইয়া আলতা সিঁদুর পরিয়া ফুলের খাটে চাপিয়া সুলতা কোন্ মহাতীর্থের অভিমুখে প্রয়াণ করিল? কেহ জানিল না, কেহ বুঝিল

না—সৌভাগ্যবতীর পায়ের আলতা ও সিঁথির সিঁদুর অকস্মাৎ লাল হইয়া উঠিল কেন?

তপনের দৃষ্টি ক্রমশঃই যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে। সুলতার জীবনের পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়গুলি আজ যেন চোখের সম্মুখে খোলা পড়িয়া আছে। জুঁইফুলের গোছা আগুনে তুলিয়া দিবার জন্য সুবোধের সেই ঐকান্তিক অনুরোধের মধ্যে বহুদিন-পূর্ব্বের অনতিস্ফুট এক কাহিনী আকার লাভ করিতেছে। মানব মনের চিরন্তনী—কামনা বল কামনা, ভালবাসা বল ভালবাসা।

তপন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, সেইদিন সুলতা কেন আত্ম-ঘাতিনী হয় নাই!

দৃষ্টির প্রসার বাড়িয়া গেল। সেইদিন—ঠিক সেইদিন হইতেই লোকচক্ষুর অন্তরালে জীবনক্ষয়ের সাধনা সুরু হইয়াছিল। নারীর সহ্যশক্তি অপ্রচুর নহে, অসীম। যে পিতার মর্য্যাদাকে ধূলিশায়ী দেখিয়া সুলতা জীবন-বিসর্জ্জনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল এবং অনায়াসে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত সে জীবন পরিত্যাগও করিল—বহু—বহুদিন পূর্ব্বে সেই পিতার মর্য্যাদা রাখিতে, হয়ত বা সংসারের শান্তি অটুট রাখিতেই, সুলতা বিবাহের যূপকাষ্ঠে অবনতশির হইয়াছিল। হয়ত দরিদ্র বলিয়া সুবোধকে তাঁহারা উপেক্ষা করিয়াছিলেন, হয়ত বা অন্য কিছু। কিন্তু সংসারকে রৌদ্রোত্তাপ হইতে রক্ষা করিতে নারী চিরদিনই সহিষ্ণুতার ছায়া মেলিয়া আসে নাই কি? তাই বুঝি সুবোধ সে-কথার প্রতিবাদ করে নাই: 'বাইরের সংঘাত-বিক্ষোভ পুরুষ যা সয়, হাসি-মুখে পুরুষ যা অগ্রাহ্য করে—নারী সেইখানে হয় আত্মঘাতিনী।' মিথ্যা, মিথ্যা সে কথা।

বিবাহের পর এ-সংসারে আসিয়া একদিনও সুলতা মুখভার করে

নাই। নিজ-জীবনের আনন্দ-দীপ নিবাইয়া সংসারের রশ্মিটিকে স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে সে প্রাণপণ করিয়াছে। স্থলতার সঙ্গে সঙ্গে হাসি-আনন্দ এই বাড়ি হইতে বুঝি চিরদিনের মতই বিদায় গ্রহণ করিল।

না, নারীকে সে অবহেলা করিবে না। বাহিরের চক্ষু প্রতিনিয়ত প্রতারণা করে, সে চক্ষুর বড়াই করা মিথ্যা।

আজ ছায়ার পাশে দাঁড়াইবার প্রয়োজন ও অধিকার একমাত্র তপনের।

তপন ভাল করিয়া বেশ-ভূষা করিল না। হাতকাটা সার্টটা আলনা হইতে টানিয়া গায়ে দিল ও স্যাণ্ডেলে পা গলাইয়া বাড়ির বাহির হইল। মোটর তৈয়ারী থাকিলেও—সে মোটরে উঠিল না। হয় ট্রামে, নতুবা পায়ে হাঁটিয়া সে শ্যামবাজার যাইবে। মোটরে চড়িয়া শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিতে যাওয়ার মত নিষ্ঠুর বিদ্রূপ জগতে আর কি-ই বা আছে?

কিন্তু জগৎ-সৃষ্টিকে বিদ্রূপ করাই যে মানবধর্ম্ম এ-কথা কে না জানে? যে মহাত্মার মৃত্যুতে উচ্চ গদ্গদ কণ্ঠে শোকসভায় বক্তা দর্শক-হৃদয় আপ্লুত করিয়া তুলেন, সেই মহাত্মার সম্পত্তির উপর তাঁহার যে তীক্ষ্ণ লোভার্ত্ত দৃষ্টি নাই—তাহা অন্যে কি বুঝিবে? শ্রাদ্ধবাসরে শোক-গাথা ছাপাইয়া অনেকে অশ্রুজলকে চিরস্মরণীয় করিবার প্রয়াস করেন, কিংবা স্মৃতিসৌধ তুলিয়া লোকের শ্রদ্ধা-বিস্ময়কে লুণ্ঠন করিবার চেষ্টাও চলে! হাতে কালো ফিতা পরিয়া বলনাচের নিমন্ত্রণে যাইতে কাহারও বাধে না এবং কালাশৌচের মধ্যেই পরিণয়-পর্ব্ব সমাধা করিতে কেহ বা দ্বিধাবোধ করেন না।

বাড়ির দুয়ারেই তরুণের সঙ্গে দেখা। সে ছড়ি ঘুরাইয়া শিস্ দিতে দিতে বাহির হইয়া যাইতেছে। শোক প্রকাশ করিতে আসিয়াছিল বোধ হয়! তপনকে দেখিয়া একটু মুচকিয়া হাসিল এবং কুশল-প্রশ্ন আদান-প্রদানের পর বিদায় গ্রহণ করিল।

তপন ভাবিল, ফিরিয়া যাই। যে-কার্য্য আমার করা উচিত ছিল—সেই কার্য্য সারিয়া তরুণই যেন চলিয়া গেল। মুখে তার বিজয়ীর গর্ব্বিত হাসি, ভ্রূকুটিতে তাচ্ছিল্য।

কিন্তু, ছিঃ! এ-সব সে ভাবিতেছে কেন? সত্যকার সমবেদনায় অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া সে এখানে আসিয়াছে, জয়-পরাজয়ের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। নিরর্থক এই সব চিন্তা। তরুণের মত মুখোস পরিয়া যেন কোনদিন তাহাকে ছায়ার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে না হয়।

কুণ্ঠাহীন হইয়াই সে ভিতরে ঢুকিল।

চাকরটা বাহিরের ঘরে বসিয়া তামাক সাজিতেছিল। বাড়ির ভিতরে কোলাহল স্তব্ধ। মাঝে মাঝে সকরুণ বিলাপধ্বনি বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল; কোন নিকটতম আত্মীয়ার মর্ম্মব্যথার প্রকাশ।

চাকরটা তপনকে নমস্কার করিয়া কান্নার সুরে কি কথা ফাঁদিতেছিল, বাধা দিয়া তপন ছায়াকে ডাকিয়া দিতে বলিল। অপ্রসন্ন মুখে সে উঠিল।

অনতিবিলম্বে ছায়া আসিল। পায়ে স্যাণ্ডাল নাই, বেশবাস বিশৃঙ্খল না হইলেও মলিন। লালপাড় মিলের সাধারণ শাড়ি পরনে, রুক্ষ চুল এলো করিয়া পিছনে বাঁধা, হাতে মাত্র দু'গাছি রুলি। ঝড়ের পর সুবোধদের গ্রামখানিকে যেমন দেখিয়া আসিয়াছিল—তেমনই। তেমনই থমথমে, তেমনই মলিন—অশ্রুমুখী।

তপন কোন কথাই খুঁজিয়া পাইল না। শোকে সান্ত্বনা দিতে আসাটাই যেন মস্ত বড় একটা চাতুরী বলিয়া তাহার মনে হইল। তবু যুগযুগান্তর ধরিয়া এই কার্য্য মানুষেরই। নিজের কিংবা অপরের দুঃখ জানাইয়া—সে শোকার্ত্তের অশ্রু মুছাইতে চেষ্টা করে, শাস্ত্রের শ্লোক তুলিয়া জীবনের অনিত্যতার প্রমাণ দেয়। মৃত্যু শাশ্বত সত্য এবং জীবন

মায়ামরীচিকা, মৃত্যু অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হইবার সেতু এবং জীবন সেই আনন্দ-তীর্থপথের বিঘ্নস্বরূপ—একথা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়া—শোককে স্তব্ধ করিবার কি-ই বা সার্থকতা। নদীপ্রবাহের মত যাহার গতি নিশ্চিত, হাসিয়া হউক আর অশ্রু ফেলিয়াই হউক, তাহাকে বরণ করিয়া না-লওয়া ছাড়া উপায় কি? যদি বলা যায়, 'আর মিছা কাঁদিয়া কি হইবে, যে গেল সে ত চলিয়াই গেল'—ত তাহার চেয়ে অসম্মানকর আর কি আছে? কৈ, সুখের দিনে মানুষের অবিশ্রান্ত হাসিকে সম্বৃত করিবার জন্য কেহ ত এমন সদুপদেশ দেয় না? কান্নার বেলায় সে উপদেশ দেয়. প্রকৃতিকে জয় কর—শান্ত হও। হাসির বেলায় বলে, অমিতাচারী হও ক্ষতি নাই, প্রকৃতিকে রোধ করিও না।

হায়রে উপদেশ!

কিন্তু এই মুহূর্ত্তে কিছু না বলিলেও অশোভন-মুহূর্ত্ত যুগ হইয়া দাঁড়াইতেছে।

ছায়া তাহাকে সেই মহাদায় হইতে নিষ্কৃতি দিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিল, "পাড়াগাঁ থেকে ফিরলেন কবে?"

"কাল।" বলিয়াই মনে হইল, এখানে একবার আসা উচিত ছিল।

ছায়া তাহাকে সেই লজ্জা হইতেও নিষ্কৃতি দিল। বলিল, "বসুন।"

যন্ত্রচালিতের মত তপন বসিল। তাহার মহাশোকে ছায়াই যেন সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছে!

বসিয়াই তপন কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তৎপূর্ব্বে ছায়াই প্রশ্ন করিয়া বসিল, "দিদি পরশু রাতেই মারা গেছেন বুঝি?"

তপন মাথা হেলাইতেই ছায়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ছায়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছিল? কলেরা? সত্যিই কি কলেরা হয়েছিল?"

তপন কাসিতে আরম্ভ করিল। এ প্রশ্নের কি উত্তর সে দিবে?

প্রশ্ন করিয়া ছায়াই তাহার উত্তর দিল, "উঃ, দেখুন একবার অঘটন! বাবাকে সে দেবতার মতই ভালবাসতো; তাই ছেড়ে একটি দণ্ডও থাকতে পারলে না। কি আশ্চর্য্য দেখুন, বাবা যেদিন মারা যান সেদিন মেসোমশাই এসে চুপি চুপি আমায় বললেন, আসল খবরটা চেপে যেতে হবে, না হলে তাঁর মর্য্যাদার হানি ঘটবে। ডাক্তারকে ঘুষ দিতে রাজী হইনি শুধু আমি, তাই লোকের কাছে তাঁর কলঙ্ক ছড়িয়ে পড়েচে। বলুন দেখি তপনবাবু, আসল ঘটনাটা চেপে যাওয়াই কি আমার পক্ষে উচিত কাজ হতো? ওকি, অমন করচেন কেন? ভজুয়া—জল—জল নিয়ে আয়।"

চোখেমুখে জলের ঝাপটায় ও মাথায় পাখার বাতাসে তপনের অচৈতন্য-ভাবটা কাটিয়া গেল। ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া সে কি বলিতে গেল।

ছায়া বলিল, "ছিঃ, এই দুর্ব্বল দেহ নিয়ে এসেচেন এতদূরে? কি দরকার ছিল বলুন ত?"

তপনের মনে হইল, ছায়ার প্রতিটি শব্দে বিদ্রূপের কষাঘাত! ছায়া যদি পিতার মৃত্যুর জন্য খানিক কাঁদিত বা তপনের পিতাকে অভিযুক্ত করিত, তপন শান্তি পাইত। দুর্ব্বল দেহই বটে! স্থুলতার মৃত্যু-রহস্য প্রকাশ করিবার মনের জোর তাহার নাই। বড়ঘরের মর্য্যাদা লইয়া কথা।

দিনকতক যাক, ছায়াকে সে আসল কথা বলিবেই। কিন্তু আজ নয়। ছায়ার সুকোমল মনে আঘাতের পর আঘাত দিয়া ধূলিতে মিশাইয়া দিলে—তপনের সত্যনিষ্ঠার গৌরব বাড়িবে না। না-হয় ছায়া তাহাকে আপাতত হীন বলিয়াই জানুক।

কি কথা বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া তপন বলিল, "আসবার সময় দেখি—তরুণবাবু বেরিয়ে যাচ্ছেন।"

ছায়া বলিল, "হাঁ, উনি রোজই আসচেন। সত্যকথা গোপন না করায় বিপদও আমার কম হয়নি। ভাগ্যিস্ উনি ছিলেন। তরুণ-বাবু সম্প্রতি Special Branchএ ঢুকেচেন কিনা; ওঁর জন্যই পুলিশ-রিপোর্টে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।"

এ-কথায় তপন একটুও আনন্দিত হইল না। যে কৃতজ্ঞতা তপনের পাওয়া উচিত ছিল—তরুণ তাহা দস্যুতা করিয়া লুটিয়া লইয়াছে। তরুণ পুলিশ-বিভাগে চাকরি করিতেছে—আচরণটাও সম্ভবত—কিন্তু এ-সব পরচর্চ্চা থাক।

তপন বলিল, "ভালই হয়েচে। আপাতত—"

ছায়া বলিল, "এ বাড়িতে মন আমার হাঁপিয়ে উঠচে। যাঁরা আছেন দিনরাত্রি তাঁদের হা-হুতাশে আমার দম আটকে আসচে। আশ্চর্য্য দেখুন তপনবাবু, যে কান্নায় গলার স্বর বন্ধ হয়ে আসে, সে কান্নার কোন মূল্যই নাকি সংসারে নেই। অন্তত এঁরা ত তাই বলেন।"

তপন বলিল, "ভেতরটা খুব কম লোকই দেখতে জানে, ছায়া।"

ছায়া বলিল, "তরুণবাবুও ঠিক এই কথা বলছিলেন। উনি বলেন, জেসিডিতে ওঁদের বাড়ি আছে, সেখানে গিয়ে দিনকতক থাকলে মনটা—"

তপন বলিল, "ও-সব বাজে। মন যার ভাল থাকে না—তার কোথাও থাকে না। আর এই সব আত্মীয়-বন্ধু ছাড়া হয়ে এ-সময়ে দূরে থাকাও ঠিক নয়।"

ছায়া ঈষৎ বিস্মিত হইয়া কহিল, "মানে? আত্মীয়-বন্ধুরা যে মনের খবর রাখেন না, এইমাত্র আপনিই ত এ-কথা বললেন! আমি চেঁচিয়ে কাঁদি না বলে ওঁরা কত কথাই পরস্পর বলাবলি করেন, কিন্তু বোঝেন না, ভেতরটা যার উত্তাপে শুকিয়ে গেল, তার চোখে জল আসে কোথা থেকে?"

বলিতে বলিতে ছায়ার কণ্ঠস্বর আর্দ্র ও রুদ্ধ হইয়া গেল।

তপন দারুণ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, আমি সে-কথা বলিনি, তবে তোমার পক্ষে—"

ছায়া আর্দ্রস্বরে বলিতে লাগিল, "না, ও-সব সমবেদনা সহ্য করবার শক্তি আমার নেই। আমায় পালাতেই হবে এখান থেকে। জানেন, শুধু আমারই জন্য তাঁর এই অকাল-মৃত্যু, শুধু আমারই জন্য।"

তপনের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। এখনই বুঝি সেই বিবাহের অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। তা যদি হয় ত তপন লজ্জায় মুখ লুকাইবে কোথায় ?

সে কথা উঠিল না। ক্ষণকাল মুহ্যমান ও মৌন থাকিয়া ছায়া বলিল, "আমি ত মনে করেচি—পরশুই রওনা হব। তরুণবাবুকে কথাও দিলুম—এইমাত্র।"

তপন অভিমানক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিল, "হঠাৎ সব বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেলেচ, নৈলে আমি—"

ছায়া বলিল, "আমি জানি—উপায় আপনিও একটা করতেন। এ জগতে বন্ধু যদি কেউ থাকেন ত—তরুণবাবু আর আপনি।"

বার বার তরুণের নামটা তপনের প্রীতিপ্রদ হইল না। ছায়া অন্ধ। শোকে সান্ত্বনা দিয়া পিছন ফিরিয়া যে হাসিতে পারে, তাহার সমবেদনার অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে তপনের ঘোরতর সন্দেহ! তরুণ বন্ধু! সম্প্রতি পুলিশ-বিভাগে ঢুকিয়াছে, জেসিডির বাড়িখানা উদারতা দেখাইয়া ছাড়িয়া দিতেছে। আশ্চর্য্য! বুদ্ধিমতী বলিয়া ছায়ার উপর তাহার শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তরুণের মোহজাল ছায়াকে এমন করিয়া ঘিরিয়াছে যে, তীক্ষ্ণদৃষ্টির জ্যোতিও সেই মেঘ-মালিন্যে নিবুনিবু। ছায়া কি বুঝিতে পারে না, তরুণ বসন্তের কোকিল। আম্রমুকুল-সৌরভের সঙ্গে ঘনপল্লবিত তরু-শাখায় আশ্রয় লয়, বর্ষার দারুণ দুর্দ্দিনে উড়িয়া পলায়। নীড় বাঁধিবার

পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতা তাহার নাই। বেথুনের বাস-এ বসিয়া গবাক্ষ-পথে কোনদিন কি ছায়া এই সব সজ্জা-সর্ব্বস্ব তরুণের লুব্ধদৃষ্টির লেখা পাঠ করে নাই? পাঁশনের আবরণ-মণ্ডিত চোখে যখন হৃদয়-হলাহল উদ্বেল হইয়া উঠে, তখনই ঈষৎ উল্লসিত দু'টি গণ্ডে রক্তাভা দেখা দেয়।

এ-কথা বলিতে যাওয়া মানে তরুণকে খাটো করিবার চেষ্টা।

ছায়া যদি তপনের এই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাকে ঈর্ষাপরায়ণতার চিহ্ন বলিয়া মনে করে!

তপন অবশেষে বলিল, "তোমার জেসিডি যাওয়ার বিষয় যদি কিছু সাহায্য করতে পারি—"

ছায়া বলিল, "থ্যাঙ্কস্। ব্যবস্থা আমিই করে নিতে পারবো—আপনাকে আর অনর্থক কষ্ট দিতে চাই না। তা ছাড়া তরুণবাবু আমার সঙ্গেই যাবেন।"

এবার সত্যসত্যই প্রচণ্ড অভিমান হইল। ছায়ার সন্নিকটে দাঁড়াইয়া এই সাহায্য ও সান্ত্বনার কথা বলিতে গিয়া কথা বাধিয়া গেল। তপনকে ছায়ার কোনই প্রয়োজন নাই। পরামর্শ-মন্ত্রণা যা-কিছু তরুণের সঙ্গে হইয়া গিয়াছে এবং সম্ভবত বায়ুপরিবর্ত্তনের সুদীর্ঘ অবসর-মুহূর্ত্ত তরুণেরই সাহচর্য্যে পরম উল্লাসে কাটিয়া যাইবে। তাই যাক, অনাহূত-ভাবে এখানে আসিয়া অযাচিত-মন্ত্রণা দিবার লজ্জা হইতে তাহার শুভ-বুদ্ধি তাহাকে রক্ষা করুক।

ঢালু জমির উপর জল ঢালিলে সে জলের গতি বুঝিতে যেমন দণ্ড-মাত্রও বিলম্ব হয় না, নারীর মনও তেমনই মুহূর্ত্তে চিনিয়া লওয়া যায়। সম্মুখে যাহা পায় তাহাই সে অবলম্বন করে। আসে-পাশে বা সম্মুখ-পশ্চাতে সমস্ত সতর্কতার বিলোপ ঘটাইয়া অন্ধের মত চক্ষু মুদিয়া নারী

প্রিয়ের অনুসরণ করিতে ভালবাসে। তাহার স্বাতন্ত্র্য নাই, তেজ নাই; অভিনিবেশ বা অভিজ্ঞতা সামান্যই। নারী খোলা পুঁথির বহুবার-পঠিত পাতার মতই কৌতূহলহীন!

তপন আর একটিও কথা বলিল না। মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি কক্ষ ত্যাগ করিল। ব্যবহারটা খুবই আশ্চর্য্যজনক ও অসঙ্গত হইল হয়ত, কিন্তু কথা বলিতে গেলেই চোখের জল উপচাইয়া পড়িতেও ত বিলম্ব হইত না। সে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া খাটো হইবার প্রয়োজন কি?

ছায়াকে আপন করিতে অন্তরের স্নিগ্ধ-কোমল স্পর্শই ছিল যথেষ্ট! চোখের জল ফেলিয়া অক্ষমের মত আবেদন? ছি!

* * *

রাত্রিটাও অশান্তিতে কাটিল। জাগ্রতে ও স্বপ্নে ছায়াই বার বার দেখা দিতে লাগিল। কখনও অশ্রুমুখী, কখনও বা উল্লসিতা। তরুণের বাহুনিবদ্ধ হইয়া কখনও সে বিলাসিনী, তপনের পায়ের তলায় বসিয়া কখনও বা আশ্রয়প্রার্থিনী! জাগ্রতে যে অতিদূরে চলিয়া গিয়াছে, মূর্ত্তিটাও যাহার ভাল মনে পড়ে না, স্বপ্নে সে সন্নিকটবর্ত্তিনী। বুকের উপর তাহার দীর্ঘনিশ্বাসের উষ্ণতা—ঘুম ভাঙ্গিলেও, মনে হয় লাগিয়া আছে! কেশসুরভিতে নৈশপ্রকৃতি পর্য্যন্ত সুরভিত। একি দুর্দ্দম বাসনা মত্ত দানবের মত মনে দাপাদাপি করিয়া ফিরিতেছে। দুর্লভ বলিয়া কামনার বল্গা টানিয়া রাখা যায় না, দুষ্কর জানিয়াও জয়ের বিজিগীষা!

সকালে উঠিয়াই বইয়ের রাশি খুলিয়া বসিল, খাতা পেন্সিলে আঁক কষিতে লাগিল। পড়া অগ্রসর হইল না, আঁক ভুল হইল। বাগানে পায়চারি করিলেও মহাজ্বালা। সেই বোটানিক্যাল গার্ডেন, সেই উৎসব-দিনের নিমন্ত্রণ! ভাল, পল্লী-প্রবাসের কথাই ভাবা যাক। সেখানেও আভা। আর একখানা পড়া-বইয়ের খোলা পাতা। মনের

কোণে দাগ আভাই প্রথম কাটিয়া দিয়াছিল। দুর্য্যোগের রাত্রিশেষে আবছা অন্ধকারে খোলা দরজায় দাঁড়াইয়া আলুলায়িত-কুন্তলা আভা। রাত্রির মধ্যযামের প্রচুর অন্ধকার তার মুখে-চোখে। নারীজাতি-সম্বন্ধে প্রথম চৈতন্য বলিতে গেলে আভাই আনিয়া দিয়াছে। তাই ত আজ নারী- ও নদী-সম্বন্ধে অমন সহজ ধারণাটা তপনের মনে স্বতঃ-উৎসারিত সত্যের মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। নারী বুদ্ধি দিয়া বিচার করে না, প্রবৃত্তির বশে পথ চলে। নমনীয়তা কিংবা দুর্ব্বলতা যাই বল, নারীকে কতকটা যেন নির্ব্বোধ করিয়া রাখিয়াছে। পঙ্গু বা মোহাভিভূত হইয়া তাই সে অন্তর-আবেগে পরিচালিত হয়। এ মোহ এমন প্রচণ্ড যে, সহ্যের সীমা অতিক্রম না করিয়াও অনায়াসে সে জহরব্রত করে বা স্বামীর চিতায় পুড়িয়া মরে।

এই নারীকে স্তুতিবাদে—কবিরা করিয়া তুলিয়াছেন দেবী; সুতরাং, দুর্জ্ঞেয়। পুরুষের ভাগ্য ও নারীর চরিত্র নাকি দেবতারাও জানেন না। দেবতারা মানে—নরচরিত্র-অনভিজ্ঞেরা। তাঁরা যে জানিবেন না—তাহা ত কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের নহে। পৃথিবীতে বসিয়া মঙ্গল-গ্রহের অধিবাসীদের আমরা কতটুকু জানি!

দুপুরে একখানা চিঠি সে পাইল। অজানা হস্তাক্ষর। উপরে ডাক-মোহরের ছাপটা নিরীক্ষণ করিয়া তপন বুঝিল, সুবোধদের দেশ হইতে চিঠি আসিয়াছে। কে লিখিল?

খুলিয়া প্রথম সম্বোধন পড়িয়া তপন বিস্মিত হইল। আভা লিখিয়াছে:

শ্রীচরণকমলেষু,—

ছোড়দা, এখান হইতে যাওয়া অবধি আপনার পত্র পাই নাই। আশা করি, ভালই আছেন ও বাড়ির সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। কাল মা

আমায় বার বার করিয়া পত্র দিতে বলিলেন। দাদার পত্র পাই নাই বলিয়া আমরা অত্যন্ত চিন্তিত আছি। আমি কিন্তু জানিতাম, বাড়ির সংবাদ যাহাই হউক, আপনি আমাকে পত্র দিবেন না। সম্ভবত এ পত্রের উত্তরও আসিবে না, তথাপি ব্যাকুল মন বোঝে না বলিয়াই পত্র লিখিলাম।

আপনি হয়ত আশ্চর্য্য হইতেছেন, এ মুখরা মেয়েটা বলে কি? ছোড়দা, আমি কি আপনার বিদায়দিনের মুখখানি ভাল করিয়া দেখি নাই! সকালে আমি যখন জলখাবার দিতে গেলাম—তার বহু পূর্ব্বেই নিজের হাতে চা তৈয়ারী করিয়া খাইয়াছেন। অথচ কিছুদিন পূর্ব্বে চা না-খাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিলেন। সে-প্রতিজ্ঞা আমার সাম্নে করিয়াছিলেন বলিয়া হয়ত আমার সাম্নেই ভাঙ্গিয়া তার প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। তারপর আমার দেওয়া জলখাবার স্পর্শও করিলেন না। অথচ শরীর আপনার সুস্থই ছিল। তারপর সারাদিন যদি বা আপনার চোখের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছি, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়াছেন। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সংক্ষিপ্ত 'হাঁ' 'না' দিয়া সারিয়াছেন। কেবল বিদায়বেলায় প্রণাম সারিয়া উঠিতেই দেখিলাম, আপনার মুখ প্রসন্ন। সেই প্রসন্নতার সাহসেই আপনাকে দু'ছত্র লিখিবার শক্তি আমার জন্মিয়াছে। আমি অন্ধ নহি। আপনার বিচিত্র আচরণের মর্ম্ম কতক অনুমান করিয়াছি—কতক বা বুঝিয়াছি। যে-টুকু বুঝিয়াছি—সেইটুকুই বলিব। অবশ্য আপনার মনের সন্দেহ নাশ করিয়া আমার আচরণের নির্দ্দোষিতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই লিপি-আড়ম্বর নহে। মানুষের চোখে মানুষ খাটো হইয়া গেলে কি ক্ষতি যে তার হয়—আজ নিজের হৃদয় দিয়া বুঝিতেছি বলিয়াই আপনাকে সমস্ত জানাইবার ব্যগ্রতা আমার অদম্য। আমি আপনার নিকট যে-স্নেহ পাইয়াছি জীবনে সেই স্নেহ হইতে

বিচ্যুত হইবার বাসনা আমার মোটেই নাই। একটা অঙ্গ নষ্ট হইলেও মানুষের তত ক্ষতি হয় না, যত ক্ষতি—একটি হৃদয়ের বিশ্বাসচ্যুতিতে।

সম্ভবত সেদিন রাত্রিতে কোন দৃশ্য আপনার চোখে পড়িয়াছিল। কিন্তু সে দৈবের জন্য আমিও সেদিন প্রস্তুত ছিলাম না। তথাপি যখন স্নিগ্ধ আশীর্ব্বাদের মতই সেই দুর্ব্বিপাক বাদলরাত্রির মাথায় চাপিয়া আমার দুয়ারে আসিয়া করাঘাত করিল, দুয়ার না খুলিয়া পারিলাম না। এবং সে ভার বহন করিতে মাথাও দিলাম পাতিয়া। তিনি আপনারই বন্ধু, নাম ধরিব না। হিন্দু যাহাকে একবার অতি আপনার ভাবিয়া অর্দ্ধাঙ্গভুক্ত করিয়া লয়, অর্দ্ধাঙ্গের মতই নাম তার লুপ্ত হইয়া যায়। আপনি তাঁর পিতাকে দেখিয়াছেন, আমাদের ভাবী-সম্বন্ধের কথাও শুনিয়াছেন। আরও হয়ত শুনিয়াছেন—তাঁর সঙ্গে আমার মিলন এ-জীবনে অসম্ভব। কিন্তু বিশ্ববিধানে অসম্ভব কিছুই নাই—একথা বিশ্বত্রাস নেপোলিয়ঁ একদা বলিয়াছিলেন। আমার জীবনেও তাই গ্রন্থি পড়িল। তিনি বাধাবন্ধহীন দুর্দ্দম, তবু তাঁকে বাঁধিবার রজ্জু আমিই প্রার্থনা করিয়া লইলাম। না লইলে তাঁকে হারাইবার ভয় আমার ছিল। লোক-চক্ষে আমি অপরাধী, কিন্তু মনের উপর কোন জোর নাই। বহুদিন পূর্ব্ব হইতে স্বামীরূপে যাঁকে কল্পনা করিয়াছি তাঁর কাছে লজ্জা আমার ছিল না। তাই অকুণ্ঠ-চিত্তে সেই রাত্রিতে ভিক্ষা করিতে পারিলাম। তিনিও প্রসন্নমনে ভিক্ষা দিলেন। আপনার জানালা দিয়া যদি দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করিয়া এ-ঘরে পাঠাইতে পারিতেন ও আকাশে প্রভাতের আলো ফুটিয়া উঠিত ত দেখিতেন, তাঁর দেওয়া পরম ঐশ্বর্য্য আমার সীমন্ত সেদিন কেমন রাঙাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু বাহিরে অন্ধকার ছিল বলিয়াই আপনার মনেও অন্ধকার রহিয়া গেল। এবং সমস্ত দিন ধরিয়া আপনার অবহেলার আগুনে—আমি দগ্ধ হইলাম।

ছোড়দা, আমি জানি এ জীবনে তিনি হয়ত আর আসিবেন না, হয়ত লোকের জিহ্বার বিষে মা আমার অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবেন। তবু পুরাণের সতীনারীদের পথানুসারিণী না হইয়া পারিলাম না। আমার অতিবৃদ্ধা প্রপিতামহী শুনিয়াছি স্বামীর চিতায় পুড়িয়াছিলেন। রাজ-আইনে সে-পথ আজ বন্ধ। কিন্তু হিন্দুনারীর চিতারোহণ আটকাইতে পারে নাই সে আইন। আজও তারা স্বামীর পথ ধরিয়া চলে, আদর্শ সৃষ্টি করে। জীবনপথে একদিন যাকে সঙ্গী নির্ব্বাচন করে—আমরণ তারই ধ্যানে দেহপাত করিতে দ্বিধা বোধ করে না। একনিষ্ঠতা ও পাতিব্রত্য যদি হিন্দুনারীর মহাদোষ হয় ত শতকরা নিরানব্বই জনের মত আমিও আপনার শাসনদণ্ডতলে মাথা পাতিয়া দিলাম। শাস্তি কিম্বা সান্ত্বনা যাহা ইচ্ছা দিন।

আমার প্রণাম জানিবেন।

পুঃ—

পত্র পাওয়া না-পাওয়ার উপর বিচারক কোন শাস্তি দিলেন বুঝিতে পারিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদপ্রার্থিনী—আভা।

পত্র পড়িয়া তপনের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অকারণ সন্দেহ পোষণ করিয়া আভার উপর সে অবিচার করিয়াছে এবং নিজেও কষ্ট পাইয়াছে। এখন সন্দেহ কাটিয়া গেল; কিন্তু উল্লাস সে জন্যও নহে। এই মাত্র নারী-সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া সে যাহা স্থির করিয়াছে, আভার পত্র যেন তার অকাট্য যুক্তি। নারী সম্মুখের অবলম্বন পাইলে আঁকড়াইয়া ধরিতে মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করে না এবং মোহের বশে অনেক সৎকর্ম্ম করিয়া ফেলে। আভা আজ সেই সৎকর্ম্মের গৌরবেই আত্মহারা। এ একনিষ্ঠতাকে শ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা হয়।

নারীর বুদ্ধি অন্য বিষয়ে তীক্ষ্ণ হইলেও যেখানে হৃদয়ের সঙ্গে যোগ সেইখানেই সে নির্ব্বোধ। প্রমাণ আভার পত্র। একটা কাল্পনিক আদর্শ ধরিয়া আভা যাত্রা করিয়াছে, জানে না অবোধ বালিকা শেষ পর্য্যন্ত ওই কল্পনাকে টিঁকাইয়া রাখা কত দুষ্কর! আদর্শবাদীর ভগ্নী বলিয়াই বুঝি এমন উৎকট আদর্শের বীজ তাহার অন্তরে!

অপরাহ্ণে ছায়ার একখানি ক্ষুদ্র পত্রে এত গবেষণা-বিশ্লেষণ সব বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। সহজ সরল নারী আবার রহস্য-আবরণে মুখ ঢাকিল। মনে হইল, দেবতা মানে স্বর্গলোকবাসী নহেন—আমাদের পৃথিবীর অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা। নারীমন বিশ্লেষণ করিয়াও যাঁহারা এ পর্য্যন্ত তার বিচিত্র রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারেন নাই।

ছায়া লিখিয়াছে:

এই পত্র পাওয়ামাত্র বৈকালে আপনার একবার আসা চাই। তরুণবাবুর সঙ্গে যে-সব পরামর্শ করিয়াছিলাম—উল্টাইয়া গিয়াছে। জেসিভি আমি যাইব না। কোথাও না। আপনি একবার আসিবেন কি?

—ছায়া

গভীর অভিমান কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, নারী-সম্বন্ধে সহজ অভিজ্ঞতার বড়াইও আর রহিল না। তপন সে জন্য খুশীই হইল। আজ ছায়া তাহাকে ডাকিয়াছে। তরুণ নহে, তপন,—তপনকে ছায়ার প্রয়োজন।

ইচ্ছা হইল, ঘড়ির কাঁটাটাকে হাত দিয়া সরাইয়া অপরাহ্ণ-অভিমুখী করিয়া দেয়, কিন্তু সূর্য্যের উপর মানুষের কোন হাত নাই। বিজ্ঞান সবে শিশু, কত বর্ষ পরে তার পূর্ণ পরিণতি হইবে, কে জানে!

* * *

ছায়া তপনকে দ্বিতলে আপনার শয়ন কক্ষে লইয়া গেল।

জানালার ধারে চেয়ার টানিয়া দু'জনে মুখোমুখী বসিল।

ভূমিকার প্রয়োজন ছিল না। ছায়াই ডাকিয়া পাঠাইয়াছে, সুতরাং ছায়াই কথা বলিল, "সত্যি বলতে কি এ বাড়িতে আমার মন টিঁকচে না, অথচ জেসিডি যাওয়া হলো না। কি করি বলুন ত ?"

তপন বিস্মিতকণ্ঠেই বলিল, "জেসিডি যাওয়া হলো না কেন ? তরুণ-বাবু সঙ্গী হতে রাজী হলেন না বুঝি ?"

ছায়া এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "ঠিক তার উল্টো ! তাঁর অতি-আগ্রহই আমার না যাওয়ার কারণ। আশ্চর্য্য হবেন না, আজ সকালেও তিনি এসেছিলেন । তাঁর চোখের উজ্জ্বলতায় অনেক জিনিষই আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম।"

তপন মনে মনে খুশী হইল। ছায়া তবে ভণ্ডটাকে চিনিয়াছে।

ছায়া কণ্ঠস্বর নামাইয়া কহিল, "জানেন, আজও এক সপ্তাহ হয়নি বাবা চলে গেছেন, এরই মধ্যে—", আবার ছায়া ইতস্ততঃ করিল। হয়ত ক্ষণেকের তরে দ্বিধা আসিল। কিন্তু নিমেষে তার কুণ্ঠা দূর হইয়া গেল। কহিল, "বায়ুপরিবর্ত্তন মানে আমোদপ্রমোদে গা ঢেলে দেওয়া নয়। শোক ভুলতে বিলাস বেছে নিতে পারব না। একটু ইতস্ততঃ করতেই তরুণ-বাবুর যা জিদ্। তাঁর চোখের পানে চেয়ে—না, না, থাক ও-সব অপ্রীতিকর কথা। পুরুষকে এত হীন কল্পনা করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।"

কণ্ঠস্বর তপনকেও আঘাত করিল। বন্ধুত্বের সুযোগ পাইয়া আজ তরুণের চোখে যে আলো জ্বলিয়াছে, তাহাতে সে ছায়ার কাছে অনেক নীচু হইয়া গেল। আর সুযোগ পায় নাই বলিয়া তপন দুর্দ্দান্ত কামনার বহ্নি চাপিয়া রাখিয়া ছায়ার চোখে হইল মহৎ ! কিন্তু ছায়া না জানিলেও

তপন ত নিজের অন্তরকে জানে। ছায়ার পত্র পাইয়া যে আলো তার চোখে জ্বলিয়াছিল, সে আলো তরুণের নহে, তপনেরও নহে ;—সমগ্র পুরুষজাতির। নারীসঙ্গ-লোলুপতায় লুব্ধ নরের চোখেই অমন জ্যোতি নিঃসারিত হয়।

মনোভাব লুকাইয়া সাধু সাজিতে তপনের মন উঠিল না। বড় বিশ্বাসেই ছায়া আজ তাহাকে ডাকিয়াছে,—সে বিশ্বাস রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। মুখ নামাইয়া মৃদুস্বরে সে বলিল, "আমারও পরামর্শ দেবার কোন সাহস নেই, ছায়া। আমিও পুরুষমানুষ।"

ছায়া বলিল, "আপনি সরল ও মহৎ। বোটানিক্যাল গার্ডেনের কথা মনে পড়ে? সরল বিশ্বাসের জোরেই সেদিন আমায় বাঁধতে চেয়েছিলেন।"

তপন ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "তবু আমায় বিশ্বাস করো না। তোমার এই বিপদের দিনে কোথায় নিঃস্বার্থ সান্ত্বনা দিতে আসব, না—মনের মধ্যে কামনা পুষে এসেছিলুম। তরুণকে আমি ঈর্ষা করি, সে-ও তোমারি জন্য।"

ছায়া হাসিল। ম্লান পাণ্ডুর হাসি। কহিল, "আমাদের মধ্যে এক দিন সম্বন্ধ-বন্ধনের সূত্রপাত হয়েছিল—হয়ত সেই জোরেই—"

তপন দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "যাই হোক, আমার তরুণ মন তোমাকেই চাইচে অহরহ—এ-কামনা রোধ করবার শক্তি আমার নেই।"

ছায়া মুখ নামাইল না, লজ্জায় রক্তিমবর্ণও হইল না। দিব্য সহজ কণ্ঠেই কহিল, "শুনেচি মনের জোরে অনেক কিছু করা যায়। নারীর কামনা ত তুচ্ছ!"

তপন বিষণ্নস্বরে বলিল, "জানি, এ-সময়ে এ-সব কথা বলা শুধু অন্যায় নয়, বর্ব্বরতা। তোমার দুঃখের পরিমাণ নিজের সুখের মধ্যে ঠিক-মত করতে পারচি না, তাই কামনা উত্তাল হয়ে উঠচে। তবু ছায়া, আজ হোক, দু'দিন পরেই হোক—এ-কথা আমায় বলতেই হতো। না বলে

আমার নিষ্কৃতি ছিল না। তখন আমার বন্ধুত্বের মধ্যে অবিশ্বাসের বীজ লুকোনো দেখে তুমি হয়ত বেশি যন্ত্রণা পেতে।"

ছায়া বলিল, "এ-কথা এখন জানিয়ে ভালই করলেন। কিন্তু—"

তপন বাধা দিয়া বলিল, "আমায় বলতে দাও। তুমি একদিন বলেছিলে বাইরের ভদ্রতা, আচরণ প্রভৃতি যদি ছেঁটে ফেলা যায় ত মানুষ অনেকটা সরল হয়। সে কথা আজও ভুলিনি। এতদিন চেষ্টা করেচি, জীবন থেকে এ জট কিছুতেই ছাড়াতে পারিনি। সভ্যতা যে মানুষের কত বড় শত্রু তা এই সঙ্গীন মুহূর্ত্ত যার এসেচে, সেই জানে। কাল যখন এখান থেকে চলে গেলুম, তখন বুক-জোড়া অভিমান ও আঘাত নিয়ে গেছলুম। বুঝেছিলুম, জোর করে কিছু পাওয়ার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। আজ সেই বিশ্বাসেই তোমার এই দুর্দ্দিনেও ভালবাসার কথা বলতে আমার বাধলো না।"

ছায়া বেশ সহজভাবেই প্রশ্ন করিল, "কেন বাধলো না?"

তপন বলিল, "দেখলুম, পুরুষজাতি-সম্বন্ধে তোমার মনে সন্দেহ এসেছে। সন্দেহ যে সত্য—তার প্রমাণ, তরুণবাবু এবং আমিও।"

ছায়া বলিল, "আপনাকেও যদি অবিশ্বাস করি—"

তপন বলিল, "স্বচ্ছন্দে! নিজের পাওয়াটাই সব চেয়ে বড় মনে করতুম বলে এতদিন ভয়ে ভয়ে এ-সব কথা বলিনি। আমায় যদি অবিশ্বাস কর ত বুঝবো, ঠিকই করেচ।"

ছায়া বলিল, "আপনার কষ্ট হবে না?"

তপন বলিল, "হবে, খুবই কষ্ট হবে। তবু সান্ত্বনা আমার— যে কাউকে ঠকিয়ে কিছু নিলুম না। কষ্ট আমিই সইবো—তোমাকে দেব মুক্তি! যাকে সত্য সত্যই আপন করে পেতে চাই—তাকে ত বাঁচাতে পারবো অকল্যাণ থেকে, অগৌরব থেকে।"

ছায়া বলিল, “কিন্তু তপনবাবু, ভালবাসা জিনিষটা কি নাটকীয় ব্যাপার নয়? ওর স্থিতি ক’দিনের?”

তপন বলিল, “জীবনে যখন ওর স্পর্শ না আসে, নাটকের পাতায় তখনই ওটা হাততালির বিষয় বা হাসির কথা। কিন্তু জীবন যখন নাটক হয়, তখন হাসবার অবকাশ কোথায়? আর স্থিতির বিষয় যদি বল, এই পঞ্চাশ বছরের পরমায়ু অনন্তকালের তুলনায় কতটুকু?”

ছায়া বলিল, “আর বন্ধন?”

তপন উজ্জ্বল চোখে তাহার পানে চাহিয়া কহিল, “বন্ধনের কোনও মানে নেই। মুক্তিরও নয়। মন যখনই ক্লান্ত হয়, তখনই বিশ্রাম তার প্রয়োজন। কি মুক্তি, কি বন্ধন কোনটাই মানুষের চরম কাম্য নয়।”

ছায়া পুনরায় প্রশ্ন করিল, “আজ আমরা ভালবাসা বলে যে বাঁধন গলায় পরলুম, কাল যদি তা ক্লান্তিকর হয়?”

তপন বলিল, “বুঝবো ভালবাসার অভিনয় করেচি আমরা—সত্যকার ভালবাসতে পারিনি। নিজের দেহটা নিজের কাছে কোনদিন অকাম্য হয় না কেন, ছায়া? নিজের গৌরবকে কোনদিন ম্লান করতে ভালবাসি না কেন?”

ছায়া বলিল, “কারণ আমরা স্বার্থপর—নিজেকে বড় ভালবাসি।”

তপন বলিল, “এই দেহ-বিনিময়ে তেমনি প্রাণও বিনিময় করতে পারি। ভালবাসার মূল কথা কামনা; পৃথিবী-সৃষ্টির মূলেও তাই। দু’জনের মনের মিল সেইখানে, যেখানে পরস্পরের স্বার্থচিন্তা লোপ পেয়ে যায়।”

ছায়া আর কোন প্রশ্ন করিল না। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “হয়ত তাই।”

তপন বলিল, “অনেক কথাই কইলুম, পাগলের মত যুক্তিহীন।”

ছায়া বলিল, "আমি কি করবো তা ত বললেন না!"

তপন বলিল, "সাহস নেই বলবার। তোমার সন্দেহ বা অবিশ্বাস—"

ছায়া মুখ তুলিয়া কহিল, "কিন্তু সত্যিই আপনাকে আমি বিশ্বাস করি।"

তপন বিস্মিতনেত্রে ছায়ার পানে চাহিল।

ছায়া বলিল, "ভাবচেন এত কথার পরেও? হাঁ, বিশ্বাস করি। আপনি সরল।"

আনন্দে তপনের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিল, "তুমি যে আমায় এত বড় compliment দেবে—"

ছায়া অনুনয় করিয়া কহিল, "আপাতত এই দায় থেকে আমায় বাঁচান।"

একটু ভাবিয়া তপন বলিল, "এক কাজ কর। যদি পড়বার ইচ্ছে হয়, এ বাড়ি ছেড়ে বোর্ডিংয়ে যাওয়া ভাল।"

ছায়া প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল, "ঠিক। আমিও মনে মনে তাই ভাবছিলুম। কালই, কি বলেন?"

তপন বলিল, "বেশ ত।"

ছায়া উঠিতেছিল, তপন বাধা দিয়া বলিল, "আর একটা কথা বলবার আছে, ছায়া। বোস। তোমার বাবার মৃত্যুর কারণ—সম্ভবত তুমি জান। সেই সব জেনেশুনেও তুমি আমাকে সঙ্গী নির্ব্বাচন করলে যখন—"

ছায়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সে দৈবের ওপর—আপনার কি হাত?"

তপন পুনরায় ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। ছায়া অকুণ্ঠিত বিশ্বাসে তাহার হাত ধরিয়াছে। এতদিন পরে হৃদয়ের দারুণ দ্বন্দ্ব মিটিল। ছায়া মনেপ্রাণে তপনেরই অনুবর্ত্তিনী হইল। এখন সেই অপ্রীতিকর কথা বলিয়া এই বিশ্বাস নষ্ট করা উচিত কি না!

মনে পড়িল, আভার পত্রের এক জায়গায় লেখা আছে, 'একটা অঙ্গ নষ্ট হইলেও মানুষের তত ক্ষতি হয় না, যত ক্ষতি—একটি হৃদয়ের বিশ্বাস-চ্যুতিতে।'

না, বিশ্বাসচ্যুত সে হইবে না, কোথাও আবরণ রাখিবে না। ছায়াকে হারাইবার ভয় আর তাহার নাই। সমস্ত শুনিয়া যদি সে দূরে সরিয়া যায় যাক, নিকটে আসে আসুক। কামনার কলুষ কাটাইয়া সবেমাত্র সে ভালবাসার নির্ম্মল নদীতে নামিয়াছে, বাহিরের পাওয়া না-পাওয়ার উল্লাস বা বেদনা তাহার কিছু নাই।

ছায়ার পিতার মৃত্যু-রহস্য একে একে তপন খুলিয়া বলিল। মাথা নীচু করিয়া ছায়া সমস্তই শুনিল। মুখের একটি রেখাও কুঞ্চিত হইয়া উঠিল না, চক্ষু হইতে এক বিন্দুও জল ঝরিল না।

সুদীর্ঘ বিষণ্ণ নিস্তব্ধতা।

তপন পুনরায় এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল, "আরও আছে, ছায়া। তোমার দিদির মৃত্যুকাহিনী—"

ছায়ার স্থৈর্য্য রহিল না। দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া আর্ত্তস্বরে সে কহিল, "বলুন।"

ছায়ার ভাব দেখিয়া তপন বড় ব্যথা পাইল। বলা কঠিন, না বলিলেও নিষ্কৃতি নাই। এ আঘাত ছায়া সহিতে পারিবে কি? কি কুক্ষণেই সে অকপট হইতে গেল!

ছায়া পুনরায় ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "বলুন, বলুন। সে কি অসুখ হয়ে মারা যায় নি?"

উপায়হীনের মত মাথা নাড়িয়া তপন বলিল, "না। বাপের অমর্য্যাদা সইতে না পেরে তিনি আত্মহত্যা করেচেন।"

ছায়ার কণ্ঠ হইতে ক্ষীণ চীৎকার বাহির হইল, হাত দু'খানি খানিকক্ষণ

থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মাথাটি চেয়ারের পিছনে শিথিলভাবে হেলিয়া পড়িল।

তপন ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চাহিয়া পাখার সুইচটা টিপিয়া দিল। কুঁজা হইতে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া ছায়ার মুখে-চোখে ছিটাইতে লাগিল। মিনিট পাঁচেক পরে ছায়া চক্ষু মেলিল। হস্তেঙ্গিতে তপনকে কক্ষত্যাগের ইঙ্গিত করিতেই তপন তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "তুমি সুস্থ না হলে আমি যেতে পারবো না।"

ছায়া কোন কথা কহিল না, চক্ষু মুদিয়া নিস্পন্দের মত পড়িয়া রহিল। নিমীলিত চক্ষু বাহিয়া দরদর ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

এ দৃশ্য তপন বেশিক্ষণ সহ্য করিতে পারিল না। চঞ্চল পদে কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল। না করিলে ছায়ার নিস্পন্দ নিমীলিত অশ্রু-কলুষিত মুখের পানে চাহিয়া অসম্বরণীয় চিত্তবেগকে রোধ করা দুষ্করই হইত! বুকের মধ্যে করুণা ও বেদনাবোধ এমন উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে যে, ছায়ার শিথিল দেহবল্লরী দু'টি করে আকর্ষণ করিয়া নিজ হৃদয়ের উত্তাপ দিয়া সমবেদনা প্রকাশের ইচ্ছা তাহার অত্যন্ত প্রবল হইতেছে।

ভিজা চুলের মধ্যে মৃদু অঙ্গুলি চালনা করিয়া সান্ত্বনা এবং ঈষৎ স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে একটি সন্তর্পিত চুম্বন···স্মরণ মাত্রেই সারা দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মানুষের মহৎ বৃত্তিগুলির মধ্যে এমন মত্ততাও থাকে! অসহ্য যন্ত্রণায় কাহারও হৃদয়-শোণিত চোখের ভিতর দিয়া গলিয়া পড়িতেছে, অদম্য সহানুভূতির উত্তাপে কেহ চাহিতেছে স্পর্শ, আলিঙ্গন ও চুম্বন।

কিন্তু দ্রুত পদচারণায় মাঝে মাঝে যে-সঙ্কোচ ও গ্লানি মনের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া উঠিতেছিল, ছায়ার অশ্রুধারা সেটুকু বেশিক্ষণ স্থায়ী হইতে দিল না। হৃদয় আর যুক্তি মানিল না, অসঙ্গতি বিচার করিল

না। ছায়ার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তপন ধীরে ধীরে তাহার একখানি শিথিল হাত পরম স্নেহভরে আপন হাতে তুলিয়া লইয়া ডাকিল, "ছায়া।"

দীর্ঘনিশ্বাসে ছায়ার বুক উদ্বেল হইয়া উঠিল। অবসন্নের মত সে চক্ষু মেলিল। পরিপূর্ণ দৃষ্টি। তপন দেখিল, বেদনামণ্ডিত হইলেও সেই দৃষ্টিতে আত্মসমর্পণের অসহায়তা। সে দৃষ্টি এমন স্নিগ্ধ ও কোমল যে পৃথিবীর কোন বস্তু দিয়া তার তুলনা করা চলে না। তীব্র দৃষ্টি যেমন অন্তর ভেদ করে, এ দৃষ্টির তেমনই সূক্ষ্মতা আছে; কিন্তু কমনীয়তায় সমগ্র ইন্দ্রিয়কে আয়ত্ব করিয়া অন্তরখানি চোখের উপর ভাসাইয়া তোলে।

তপনের বক্ষঃস্পন্দন দ্রুততর হইল।

উজ্জ্বল চক্ষুর দৃষ্টি ছায়া দেখিল কি না বলা যায় না, পরম অবসাদে পুনরায় সে চক্ষু মুদিল এবং শিথিল হাতে তপনের হাতখানিতে ঈষৎ চাপ দিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

হাতের মধ্য দিয়া অন্তর বিনিময় হইয়া গেল।

এ অনুভূতি—অনভিজ্ঞ হইলেও তপন বুঝিল। আঙুলের ডগা দিয়া শিরায় এবং শিরা হইতে শোণিতে তীব্র বিষের মতই গতি তার দ্রুত।

ত্রিতলের ঐ একখানিই ঘর, সুতরাং নির্জ্জন। অপরাহ্ণের শেষ হইয়া গোধূলি নামিয়াছে। ঘরের মধ্যে অন্ধকার, জানালার ধারে আলো অল্প ছিল বলিয়া পরস্পরকে দেখা যাইতেছিল। কে জানে, কয়টি মিনিট কিংবা দণ্ড এই আচ্ছন্নভাবের মধ্য দিয়া কাটিল। ছায়া চক্ষু মুদিয়াছে, তপনও এ-জগতে নাই। এত হাল্‌কা তার শরীর যে, ইচ্ছা করিলে ওই গোধূলি-ম্লান আকাশের ঘন স্তর ভেদ করিয়া যে কোন অপরিচিত নক্ষত্রের দেশে পৌছানও তার পক্ষে অসম্ভব নহে!

ছায়া যখন চক্ষু মেলিল, কক্ষে তখন অন্ধকারের বন্যা। তপনের হাতখানি শুধু তার বহির্জগতের পরিচয়।

তপনের হাত হইতে ধীরে ধীরে হাতখানি মুক্ত করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণপরেই বিদ্যুতালোকে কক্ষ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আলোকের তীর খাইয়া অন্ধকার মরিল, স্বপ্নও মিলাইল। ছায়ার চোখের কোলে জলের দাগ—অশ্রু শুকাইয়াছে। ধীরে ধীরে আসিয়া সে ইজি-চেয়ারটায় বসিতেই তপন উঠিয়া দাঁড়াইল ও তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া কোমলকণ্ঠে কহিল, "ছায়া, আজ তোমাকে ক্ষণকালের জন্য যেমন পরিপূর্ণ-ভাবে পেলুম, সমগ্র জীবনে এমনি পাওয়ার জন্য আমাদের তৈরী হতে হবে। কোনরূপ অসম্মানের মধ্যে আমরা কামনাকে লালন করবো না। তুমি লেখাপড়া শিখে স্বাধীন হবে, আমিও স্বাধীন হতে চেষ্টা করবো। তারপর আমরা মিলবো, কেমন ?"

মৃদু গ্রীবা হেলাইয়া ছায়া এ-কথা সমর্থন করিল হয়ত।

তপন আনন্দ-তরল কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "আমাদের বন্ধুত্বে কোনরূপ হীনতা বা শঠতা রইলো না, গ্লানিও আমরা ভোগ করবো না এর জন্য। আমাদের এ আনন্দ এমন প্রবল যে, ইচ্ছা হচ্ছিল তোমার হাতে হাত রেখে এই মুহূর্ত্তে যেন আমার মরণ ঘটে।"

ছায়ার গণ্ডে এতক্ষণে অরুণরাগ ফুটিল। লজ্জাভীরু চোখ দু'টিতে আবেশ-আবেগ। স্ফুরিত ওষ্ঠে মদময়তা, ঋজু এলায়িত দেহভঙ্গির অপূর্ব্ব পেলবতা।

তপন হেঁট হইয়া ছায়ার ওষ্ঠে পুলক-কণ্ঠকিত অতি-সন্তর্পিত—মুহূর্ত্ত-ব্যাপী একটি স্বকুমার চুম্বন আঁকিয়া দিয়া চক্ষু মুদিল। ছায়ার পলকও পক্ষ্মাবৃত।

দুইজনেরই মনে হইতেছিল, জীবনে যদি কিছু স্বখের থাকে ত মৃত্যু।

এই ক্ষণকালস্থায়ী অন্ধকারের অস্তিত্বকে যুগযুগান্তরে সমাহিত ও গাঢ়-দুর্ভেদ্য করিয়া নামিয়া আসুক মৃত্যু। চরম আনন্দের পরিণতি মহা-সমাধির মত, মিলনান্ত নাটিকার শেষে সবুজ যবনিকার মত।

* * *

কয়েক বৎসর পরে এ কাহিনীর যবনিকা উঠিতেছে।

তপনদের উপরের সেই ঘরখানিতে প্রাচীনা গৃহিণীদের মজলিস বসিয়াছে। জজ, ব্যারিস্টার প্রভৃতি সকল সম্ভ্রান্ত লোকের গৃহিণীরাই আসিয়াছেন।

কয়টি বৎসর কালস্রোতে ভাসিয়া গেলেও প্রৌঢ়া ও প্রবীণার সাজ-সজ্জার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। বলিরেখাঙ্কিত গণ্ডে রুজ-পাউডার এবং শুষ্ক ওষ্ঠে লিপ্‌ষ্টিক তেমনই অটুট। সভ্যতা ক্রমশঃ ধাপে ধাপে ঊর্দ্ধগামী হইলেও কাঁচা-পাকা চুলগুলি বব্‌ করিয়া ছাঁটিতে তাঁহারা পারেন নাই। দু'কূল বাঁচাইয়া এলো খোঁপা বাঁধিয়াছেন। গলায় মফ্‌চেন ও হাতে নূতন প্যাটার্ণের চুড়ি; নাক, কান, কোমর, পা প্রভৃতিতে বহুদিন হইতেই অলঙ্কার-নির্ব্বাসন ঘটিয়াছে। কেবল কোঁচানো কাপড়ের উপর একটি দামী পাথর বসানো ব্রুচ ও পায়ে চপ্পল বা নাগরা।

জজগৃহিণী অতি-আধুনিকা নন। পান জর্দ্দা প্রহরে প্রহরে তাঁর চাই। লক্ষ্ণৌর সে বন্ধুটি এখনও জরদা পাঠান কি না জানা নাই। কলিকাতায় আজকাল নাকি ভাল জরদা তৈয়ারী হইতেছে।

ব্যারিস্টারগৃহিণী স্বামীর সাগরপারের গল্প কিছু কমাইয়া দিয়াছেন। বিলাতের চেয়ে ভারতবর্ষেই তাঁহার স্বামী বেশি দিন রহিয়াছেন। প্র্যাকটিসে বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া তিনি নাকি বাংলা ভাষা ভালরূপই আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন।

উকিল সিদ্ধেশ্বরবাবুর পত্নী হেমলতা চশমার ভিতর দিয়া ঘরের সাজসজ্জা ও লোকগুলিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

সেদিনের সকলেই আছেন। নাই স্থলতা, নাই ছায়া। স্থলতা নাই, কিন্তু এ-বাড়ির মেজ বৌ আছে। চারুও আসিয়া এককোণে ছেলে কোলে করিয়া বসিয়াছে। আজিকার আলোচনাটা কৌতূহলকর ও সমস্যাজনক। গৃহিণীর পরিবর্ত্তনের মধ্যে চুলের শুভ্র বিন্দুগুলি বিস্তৃত হইয়াছে। দেহ সমুদ্রের মতই জোয়ার-ভাটা হীন। মুখখানি গম্ভীর, কপালের কয়েকটি স্ফীত শিরা দুশ্চিন্তারই সাক্ষ্য দিতেছে।

জজগৃহিণীই সর্ব্বপ্রথম গুটিচারেক পান ও জরদা গালে ফেলিয়া কথা কহিলেন, "তাই ত গা নিস্তার, এ তো বড় ভাবনার কথা!"

গৃহিণী মুখ খুলিলেন, "তোমরা পাঁচজনে আছ, দিদি—যা হয় একটা সৎ পরামর্শ দাও। আমি যে আর পারি নে, শেষকালে কি পাগল হয়ে যাব?"

ব্যারিস্টারগৃহিণী কহিলেন, "বিলেতে শুনেচি ঐ রকম করে সাদা ছুঁড়িগুলো মানুষ ভুলিয়ে রাখে। শেষকালে এ দেশেও!"

গৃহিণী বলিলেন, "ছুঁড়ির আক্কেল নেই, হায়াও নেই। ছোট লোকের বংশ ত!"

উকিলগৃহিণী বলিলেন, "সে কি দিদি! সেবার যখন ছায়াকে দেখি—কেমন শান্তশিষ্ট, এতটুকু দেমাক নেই। তুমি বললে, অমন ভাল বংশ নাকি হয় না।"

গৃহিণী ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন, "ভিজে বেরাল। বাপ মিন্‌সে ক্যাশের টাকা ভেঙ্গে জেল খাটবার ভয়ে আত্মহত্যে হলো। আমাদের মেজ বৌ বাপ-সোয়াগী ত হাতে দড়ি দেবার যোগাড় করেছিল! কর্ত্তার যাই আলাপী বন্ধু-বান্ধব ছিল, তাই টাকার ঘণ্ট করে সে দায়

উদ্ধার হলেন। আবার আমার ছেলেটাকে নিয়ে ডাইনী মাগী কি কাণ্ড করচে—তোমরা পাঁচজনেই দেখ। অমন—ভদ্রবংশের আঁস্তাকুড়েও কেউ যেন কোন দিন না যায়।"

একটু থামিয়া অকস্মাৎ তিনি ক্রন্দনের সুর তুলিলেন, "তোমরাই বল দেখি, এমন বিপদ মানুষের কখনও দেখেচ? খাইয়ে পরিয়ে লেখা-পড়া শিখিয়ে ছেলেটিকে যে এত বড়টি করে তুললুম—সে কি ওই ডাইনীর হাতে তুলে দিতে? মায়ের বুকে এমন করে ব্যথা দিলে ওর ভাল হবে?"

জজগৃহিণী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন, "কি করবে বোন, অদৃষ্ট। যে যাই বলুক—এর লেখা খণ্ডাতে কেউ পারে না।"

গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "এমন বরাত ভূ-ভারতে কারো নেই। ছেলে রয়েচে—অথচ আমার নয়।"

সহসা কান্না থামাইয়া চক্ষু বাঁকাইয়া কহিলেন, "কি বলবো বল, হারামজাদীর নাগাল পাচ্চি না যে! নৈলে চুলের মুঠি ধরে কাঠগড়ায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাতুম না! হ্যাঁগা, এত নতুন নতুন আইনকানুন বেরুচ্চে—আর এ-সবের একটা বিহিত হয় না?" বলিয়া তিনি করুণ-চক্ষে উকিল-ও ব্যারিস্টার-গৃহিণীর পানে চাহিলেন!

কিন্তু তাঁহারা কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বলিলেন, "এই ত লক্ষ লক্ষ লোকের ছেলে রয়েচে, কার ছেলে মায়ের মুখের ওপর বলে, 'বিয়ে করবো না।' কার ছেলে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়? এই ত আমার মেজ ছেলে হরি, সোনার ছুঁচ। বউ মরার ছ'টি মাস পেরুলো না, যেমন বলা, অমনি চেলি টোপর পরলে।"

জজগৃহিণী বলিলেন, "তা ত বটেই। তবে আজকাল ফ্রীলভ না কি বলে ছাই—ওইগুলো বড্ড বেশি। বিলেতের মত। ছেলে-মেয়েরা নিজের মতেই চলে।"

গৃহিণী সরোষে কহিলেন, "অমন লেখাপড়া শেখার মুখে আগুন! বাপ-মার কথা যারা মানে না, তারা আবার মানুষ! বাপের কথায় রাম চোদ্দ বছর বনে রইলেন, পরশুরাম মায়ের মাথাটাই কেটে ফেললেন কচ করে। সে সব এক দিনই গিয়েচে!" বলিয়া ফোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন।

আজ আর গৃহিণীর উচ্চশিক্ষার গৌরব নাই। স্বার্থ এমন জিনিষ। যতক্ষণ সে সমস্ত বাসনাকে সার্থক করিয়া সুখ-সৌভাগ্য দান করে,— ততক্ষণই মানুষ লোকের চক্ষুতে সুরুচি ও সঙ্গতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। কিন্তু যেখানে স্বার্থ প্রচণ্ডভাবে নিষ্পিষ্ট হয়—সেখানে সেই মুহূর্ত্তে এই সব রীতি-নীতি আচার-অনুষ্ঠানের খোলস খসিয়া যায়, ...কুশ্রীতাকে প্রকাশ করিতে মানুষ একটুও লজ্জা বোধ করে না।

গৃহিণীর কথায় রুজশোভিত গণ্ডগুলি সঙ্কুচিত হইল, লিপষ্টিক্-রঞ্জিত ঠোঁটে বিদ্রূপহাস্য খেলিয়া গেল এবং অপাঙ্গ বিনিময়ে অনেক কথাই ইঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিল।

জজগৃহিণী উপদেশ দিলেন, "এক কাজ কর, নিস্তার। রাগ করে কোন লাভ নেই। এ যেন হয়েচে চোরের ওপর রাগ করে ভুঁয়ে ভাত বাড়া। একবার ছুঁড়ির সঙ্গে দেখা কর। উঁচু কথায় নয়—যতদূর পার মিনতি করে বলবে, দু'এক ফোঁটা চোখের জল ফেলতে পার ত আরও ভাল, মেয়েমানুষ ত, রাজী হতেও পারে।"

গৃহিণী সন্দেহভরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না দিদি—যে খাণ্ডারণী! ওরা সব করতে পারে। আর তুমি ত জান না, তপু আমার কি হয়ে গেচে! অমন যে ভালমানুষ ছেলে, মুখের ওপর বললে কিনা বিয়ে করব না! বছর কতক আগে বি, এ, পাস করতেই কর্ত্তা বিয়ের সম্বন্ধ করলেন। ছেলে বললে, এম, এ, না দিয়ে ও-সব কথা বলবেন না।

ভাল, তাই সই। কর্ত্তা অপমান হলেন, তবু মুখ বুজে সব সইলেন। তারপর এম, এ, পাসের পর আবার চেষ্টা। আবার সেই ধনুকভাঙ্গা পণ, আমায় বিলেত পাঠান, সেখান থেকে এসে যা হয় হবে। কর্ত্তা গেলেন চটে ; কি কড়া কথাও বলেছিলেন বুঝি। ছেলে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। এই কলকাতাতেই আছে, কি ভাল একটা আপিসে চাকরি করে, কিন্তু বছরাবধি বাড়িমুখো হয় নি। তারপর, বাগবাজারের শ্যামের জেঠি একদিন গঙ্গা নাইতে গিয়ে সব বললে। শুনে ত হাত-পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে গেল।"

কে একজন টিপ্পনী কাটিলেন, "তাই এত! তলে তলে টিপ্‌নী না হলে এককথায় বাপ-মা ত্যাগ করতে পারে?"

ব্যারিস্টারগৃহিণী বলিলেন, "ছেলে কি বলে? ওই ছুঁড়িকে ছাড়া বিয়ে করবে না?"

গৃহিণী বলিলেন, "না, তেমন কোন কথা বলে নি। তা বললেও যে বাঁচি। না হয় তেতো ওষুধ গেলার মত ওই ডুম্বিকেই বউ করে ঘরে তুলি!"

জজগৃহিণী বলিলেন, "বুঝচো না, একটা ঝোঁক। বয়সের নেশা আর কি! কিন্তু যাই বল নিস্তার, ও-সব শাপমন্নি বা ভয় দেখালে কোন ফল হবে না। বেত ভাঙ্গে না, নুইয়ে পড়ে। ছেলে যদি ফিরে পেতে চাও, ওর খোসামোদ ছাড়া গত্যন্তর নেই।"

গৃহিণী সজল চক্ষে সকলের পানে চাহিয়া বলিলেন, "তাই করতে বল তোমরা?"

সকলেই সায় দিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, "বেশ, তাই যাব। মায়ের মন, নৈলে ওদের খোসামোদ করা—আমার মাথা কেটে ফেললেও পারতুম না। কর্ত্তা রাগ করে কোন কথা কন না, যত পোড়া হয়েচে আমার।"

জজগৃহিণী বলিলেন, "যদি দেখ ছুঁড়ি রাজী হলো না—তোমার ছেলেরও ধনুকভাঙ্গা পণ, তখন অগত্যা মধুসূদন,—ওকেই বউ করে ঘরে তুলো। লেখাপড়া জানা মেয়ে, এতটা অবুঝ হবে কি ?"

গৃহিণী বলিলেন, "লেখাপড়ার ওপর আমার এতটুকু বিশ্বাস নেই, দিদি। তবে তোমরা বলচো, কাল বিকেলে যাব একবার। দেখি—নারায়ণ কি করেন !"

অতঃপর মজলিস ভঙ্গ হইল।

চারু নিঃশব্দেই উঠিয়া গেল। আজকাল সে কোন কিছুতে বড় একটা কথা কয় না। হয়ত স্বপ্নও দেখে না। সে মনে করে,—গৃহিণী অনন্তকাল ধরিয়া গৃহিণীই থাকিবেন, সে থাকিবে শাসনভীত লজ্জাকুণ্ঠিত বধূ। বধূও নহে, একটা যন্ত্র। ঘড়ির কাঁটার মত তাহার জীবনের কাজগুলিও চিহ্ন-দেওয়া ঘরে ঘুরিয়া মরিবে ; এক চুল এদিক ওদিক হইবার জো নাই। দ্রুত হউক, অথবা মন্থর হউক, চলিতে তাহাকে হইবেই।

সুলতা আজ অতীত। কক্ষে কক্ষে কার্পেটের সুদৃশ্য কারুশিল্পে তার পরিচয় লেখা। কিন্তু সে লেখাই বা আর কতদিন! পোকা, উই এবং সর্ব্বোপরি সর্ব্বধ্বংসী কাল সেগুলিতে দৃষ্টি দিয়াছে। সুলতার কোন চিহ্নই কয়েক বৎসর পরে আর থাকিবে না ! এ-বাড়ির লোকগুলির মধ্যে সুলতা হয় ত কোন দিনই আসে নাই ; চারুও না। আসিয়াছিল এ-বাড়ির মেজ বৌ, বড় বৌ। আজও তারা আছে। মেজ বৌ নূতন হইয়া আসিয়াছে, বড় বৌ মরিলেও যে নবকলেবরে ফিরিয়া আসিবে তার আর সন্দেহ কি !

এখানে আসিয়া চারুর সার্থকতা কি ? ঐ বাগানের মরসুমী ফুল গাছ-গুলির মতই যতদিন সে ফুল দিতে পারিবে, ততদিন তার আদর। মরিয়া

গেলে তদ্দণ্ডেই নূতন আসিয়া স্থান সংগ্রহ করিবে। গাছের চেয়ে তাহার গৌরব এইটুকু বেশি যে, ফুল ফুরাইলেও হয়ত বা চক্ষুলজ্জার খাতিরে মানুষ গাছের মত মানুষকে সংসার-উদ্যান হইতে উপড়াইয়া ফেলিতে পারে না। করুণা দিয়া বাঁচাইয়া রাখে। সেটুকু মানুষের মহত্ত্ব সন্দেহ নাই, কিন্তু সে মহত্ত্বে মানুষের লাভ কি ?

এ-সব কথা চারু অল্প অল্প ভাবে। সুলতা যেন তাহার চোখ ফুটাইয়া দিয়া গিয়াছে। সুলতার মৃত্যুর পর ছ'টি মাসও গেল না, বাড়িতে নববধূ আসিল। মেজ ঠাকুরপোর দিব্য হাসি হাসি মুখ, যেন এই শুভঘটনার জন্যই তিনি তপস্যা করিতেছিলেন। স্বামী সম্বন্ধে চারু আজকাল বড়ই ভাবে। ভাবিয়া ভাবিয়া মাথার মধ্যে কেমন ঝিম্ ঝিম্ করিতে থাকে। ছেলেমেয়েগুলাকে কাছে বসাইয়া, কখনও বা বুকে চাপিয়া সে সেই যন্ত্রণা ভুলিতে চেষ্টা করে।

তপনের উপর একটা অহেতুক শ্রদ্ধা জাগে। হাঁ, এ-বাড়ির মধ্যে মানুষ যদি কেহ থাকে ত সেজ ঠাকুরপো। সুলতা কেবল তাহাকে চিনিয়াছিল। ছায়ার জন্য সে আজ যাহা করিতেছে,—লোকচক্ষে বা সমাজচক্ষে যতই নিন্দনীয় হউক, কিম্বা শিক্ষার দোষ ও ধৃষ্টতার চরম সীমা বলিয়া যে যাহাই নির্দ্দেশ করুন, চারুর অন্তরে সে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়াছে। সেও মনে মনে প্রার্থনা করে, ঠাকুরপো সুখী হউক এবং এ-বাড়িতে আসিবার সুমতি যেন তার কোন দিন না হয়। এ-বাড়ির বদ্ধবায়ুর মধ্যে জীবনক্ষয়ের বিষ লুকানো আছে। স্পর্শমাত্র সক্রিয় মনের রক্ত মাথায় গিয়া উঠে এবং মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটিতে বিলম্ব হয় না।

ঠাকুরপো কোথায় আছে জানিলে সে তাহাকে একখানি পত্র দিত। —আশীর্ব্বাদী পত্র। ঠাকুরপো যদি একবার আসে! তার সঙ্গে দণ্ড দুই কথা কহিলেও চারু বাঁচিয়া যায়।

সংসারের নিয়মানুবর্ত্তিতা, শাশুড়ীর স্নেহ, (সুলতার মৃত্যুর পর লেখাপড়া-জানা মেয়ের উপর তিনি হাড়ে হাড়ে চটিয়াছেন। সুতরাং, চারুর আদর বাড়িয়াছে।) স্বামীর নিস্পৃহতা ও ছেলেমেয়ের মায়াডোর সবই তার মনে অদ্ভুতভাবে দোলা দিতে থাকে। সে ভাবে, এ-সব না থাকিলে সংসারের অঙ্গহানি হইত, সন্দেহ নাই! কিন্তু বাল্যকাল হইতে এইরূপ কল্পনাতেই সংসারকে আমরা গড়ি বলিয়া—এই রকম সুখেই অভ্যস্ত হইতে ভালবাসি। ইহার বাহিরে যাহা আছে, তাহা বুঝি ছন্নছাড়াদের,—স্নেহ-মমতা-ভালবাসাহীন দুর্ভাগাদের। তথাপি আজ এই পরম-কাম্য সংসারের মধ্যে স্বামী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া, অভাব-দৈন্যের বহু উপরে আসন পাতিয়াও—চারু ঐ সবহারাদের জীবনরহস্য জানিবার জন্য অল্পবিস্তর কৌতূহলী হয়। চারুর মনের যে-দিকটায় অসীম দৈন্য, সেই দিকটাই যেন এই ঐশ্বর্য্য-বৈভবের যবনিকা ঠেলিয়া মাঝে মাঝে বাহির হইয়া আসে এবং করুণকণ্ঠে বার বার বলে,—ওরে অভাগিনী বধূ, তোর প্রয়োজনে সংসার গড়ে নাই, সংসারের প্রয়োজনে তুই আসিয়াছিস। স্নেহ বল, ভালবাসাই বল, কিংবা সম্মান, আদর, বংশগৌরব যাহা কিছুই বল—সংসারের সহায় বলিয়া তোর ভাগ্যে সে-সব মিলিতেছে। সংসারের চাকা যেদিন একটু বিকল হইবে, সেদিন—না সৌধে, না মনে, কোনখানেই তোর চিহ্নমাত্র থাকিবে না। এই পরম ঐশ্বর্য্যের মাঝে তুই চিরদিনই নির্ব্বাসিতা একথা কোন দিন ভুলিস না।

* * *

ত্রিতলের ঘরখানিতে ছায়া একাকিনী বসিয়াছিল।

সাড়ে সাতটায় তপন আসিবে। প্রায়ই সে অবসরমুহূর্ত্তে এখানে আসে। কয়েক মাস হইল ছায়া বোর্ডিং ছাড়িয়া দিয়াছে। এম, এ, পড়িবার ইচ্ছা তার নাই, যদিও তপনের একান্ত ইচ্ছা।

তপন এম, এ, পাস করিয়াছে, ছায়াকেও পাস করাইতে চাহে। তারপর দু'টিতে মিলিয়া বিলাত যাইবে। শুধু বিলাত নহে, মুক্তপক্ষ বিহঙ্গ-দম্পতীর মত—পৃথিবীর যে কোন দেশে। ছায়ার অবশ্য ইহাতে অমত ছিল না। কিন্তু আসল কাজটাই কিছু বিলম্ব পড়িয়া গিয়াছে।

তপন পাস করিয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য যে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছে তাহা অবশ্য সুবিস্তৃত নহে। হিসাবী দম্পতী হইলে সাচ্ছল্যের উপর সংসার চালাইয়া কিছু অর্থ উদ্বৃত্তও থাকে। বিলাত কিংবা পৃথিবী ভ্রমণ করিতে হইলে বছর কয়েক (অন্ততঃ দশ) এই অর্থকে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়া কিংবা সুদে খাটাইয়া সংখ্যাভূয়িষ্ঠ না করিয়া উপায় নাই। সে ধৈর্য্য তপনের নাই। দশটি বৎসর বড় কম নহে, জীবনের একটা যুগ অবসান। শক্তি, ইচ্ছা বা যৌবন সব কিছুই তখন হ্রাসের পথে। গুটিপোকার গুটির মত সংসারের জালে একবার আবদ্ধ হইলে, বাহির হওয়া কঠিন। কতকগুলি নবাগত প্রাণীর শুভ ও ভবিষ্যৎ চিন্তায় তখন স্ফূর্ত্তিরও বিলোপ ঘটিবে, সঞ্চয়ের তৃষ্ণাও বাড়িয়া যাইবে। ছায়া এ-বিষয়ে তপনের সঙ্গে একমত। কিন্তু এ-সব ত গেল ভবিষ্যৎ কল্পনা।

অসল কাজটাই এখন বাকি। পাসের পর একটি সুদীর্ঘ বৎসর হাতে পাইয়াও বন্ধন গলায় লইবার অবসর কাহারও হয় নাই। তপন যদি বা রাজী হইয়াছে,—ছায়া হয় নাই ; আবার ছায়ার যেখানে মত, সেখানে তপন বিমুখ। কথাটা পরিষ্কার করিয়াই বলা যাক। ছায়ার ইচ্ছা, তপন গুরুজনের সম্মতি লইয়া বিবাহ করুক। তপন সে বাড়িতে পদার্পণ করিতেও রাজী নহে। সে বলে, ধর্ম্মান্তর গ্রহণে আমার আপত্তি নাই। আমাদের ধর্ম্ম সেইখানে, যেখানে ভালবাসা।

কথাটা ছায়া ঠিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মানিতে পারে নাই। উচ্চ শিক্ষিতা হইলেও ছোট একটু কুসংস্কার সে মনের মধ্যে পোষণ করে।

স্বর্গগত পিতাকে সে দেবতার মতই শ্রদ্ধাভক্তি করিত। পর্দ্দাপ্রথা তিনি মানিতেন না, জাতিভেদ সম্বন্ধেও কোন গোঁড়া তর্ক ছায়া তাঁহার মুখে শুনে নাই, কিন্তু একটি জিনিষে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। পিতৃপুরুষের সাম্বৎসরিকের অনুষ্ঠানটি তাঁর চক্ষে ছিল পবিত্র ও মহৎ। বলিতেন, সনাতনীত্বের বড়াই নয়, সায়েবরাও তাদের গোরে ফুলের মালা দুলিয়ে, বাতি জ্বেলে, হাঁটু গেড়ে বসে বাইবেলের কয়েকটি গাথা পাঠ করে স্বর্গগতদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে। সে শ্রদ্ধা মনুষ্যজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিবেদন।

ছায়া মনেপ্রাণে সেকথা বিশ্বাস করিত।

ধর্ম্মান্তর গ্রহণের মধ্যে কোন সত্য নাই, এই বিশ্বাসই ছায়ার দৃঢ়তর।

ধর্ম্ম লইয়া আজকাল কাহারই বা এমন মাথা ব্যথা! শুধু সুবিধার জন্য খোলস বদলানো বৈত না। ধর্ম্মান্তর গ্রহণের মূলে ভালবাসার প্রেরণা। যে-কোন ধর্ম্মত্যাগীর ইতিহাস খুলিয়া দেখ, অন্তরালে তার রমণী। পুঁথির সত্য নির্ণয়ের জন্য স্বধর্ম্মত্যাগী এত কম যে, অনায়াসে সে সকলের নাম বলিয়া দেওয়া যায়! সুতরাং ভণ্ডামীর আশ্রয় লইয়া নবজীবনের সূচনা করিয়া লাভ কি?

তপনও সে কথা মানে না, তাহা নহে, তার একমাত্র আপত্তি—শাস্ত্রসম্মত বিবাহ-অনুষ্ঠানে ঐ সব গুরুজনের উপস্থিতি। এবং হয়ত বিবাহের পর সেই বাড়িখানিতে গিয়া দাঁড়াইতেও হইবে। যেখানে পণের টাকা লইয়া কসাইগিরির কারবার চলিতেছে। যে ব্যাপারে সুলতার পিতা আত্মঘাতী হইলেন, সুলতাও তাঁহার পথানুসারিণী হইল। এখনও যে বাড়ির কক্ষে কক্ষে অশরীরী আত্মার অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি, সে বাড়ির সুসজ্জিত কক্ষে ফুলের খাটে বসিয়া মিলনরজনী যাপন করা যে কত বড় অসম্মান ও দুর্ভাগ্য তাহা তপন ভাল করিয়াই জানে। ছায়ারও প্রতিজ্ঞা,

সে বাড়িতে সে পা রাখিবে না, কিন্তু গুরুজনের আশীর্ব্বাদ না লইয়া (ঐটুকু তার দুর্ব্বলতা ; সে দেবতা না মানিলেও পিতাকে যথেষ্ট ভক্তি করিত) নবজীবনের প্রবেশপথ অনর্থক অশান্তিময় করিবে কেন ?

তপন বলিয়াছিল, "যদি তাঁরা মত না দেন ?"

ছায়া উত্তর দিয়াছিল, "পরের উপায় ত আমাদের হাতেই রইলো।"

অগত্যা তপন রাজী হইয়াছে। কিন্তু আজ-কাল করিয়া যাওয়া হয় নাই। ছায়া ত জানে না, একবার সে বাড়িতে গিয়া দাঁড়াইলে তপনের কি দুর্দ্দশা হইবে! তাঁহাদের সম্মিলিত কণ্ঠের উচ্চ চীৎকারে প্রার্থনা ভাসিয়া যাইবে এবং তপন কি করিতে কি করিয়া বসিবে, কে জানে! বাপের সম্বন্ধে তার কোনরূপ দুর্ব্বলতা নাই। তিনি চোখ রাঙাইলে ভয়ে তার বুকখানি দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠে না ; অত্যাচারীর সম্মুখে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় বেশ একটু গৌরব বোধ হয়। কিন্তু মায়ের অশ্রুজলকে তার ভয় বেশি। সে অনুরোধ এড়ানো কঠিন। সুবোধের মার স্নেহস্পর্শ পাইয়া তপন নিজের মাকে চিনিয়াছে। ছেলের সুখের জন্যই ত মা এত চেষ্টা ও এত যত্ন করেন। দু-দু'বার মেস বদল করিয়া তপন আত্মরক্ষা করিয়াছে।

একটি বৎসর কাটিলেও তাই বিবাহ হয় নাই।

তপনের শৈথিল্যের আরও একটা কারণ ছিল। বাড়ির সাচ্ছল্যের আওতায় বাড়িয়া সংসার সম্বন্ধে পরিপক্কতা সে লাভ করে নাই কোন দিন। চোখে দীনদুঃখীকে দেখিয়াছে, দয়াপরবশ হইয়া ভিক্ষাও দিয়াছে, কিন্তু কি তাহাদের দুঃখ বুঝে নাই। অভাব না অভাব! এই অভাবের সঙ্গে মুখোমুখী পরিচয় লাভ হইল যেদিন, সেদিন বাড়ি ছাড়িয়া স্বেচ্ছাবৃত কঠোরতার মধ্যে সে নামিয়াছে। বুঝিল, অর্থ না থাকার কত অসুবিধা। দেহ, প্রাণ বা প্রেম সব কিছুকে জীবন্ত রাখিতে হইলে ঐ একটি জিনিষের

অত্যন্ত প্রয়োজন। অবশ্য উহাতেই ডুবিয়া গিয়া চক্ষু বন্ধ করায় অনেক ক্ষতি। এই যে আজ বিলাত যাওয়ার বাসনা জন্মিয়াছে ;—সীমাহীন সমুদ্রের বুকে ডেকের উপর চেয়ার পাতিয়া বসিয়া জ্যোৎস্না-বিধৌত পৃথিবীকে ভাল করিয়া দেখা, কিংবা তিমিরবসনা রাত্রির বিস্তীর্ণ অঙ্কে ঢেউয়ের ধাক্কায় সমুদ্র-জল-বিন্দু জ্বলিয়া-উঠার আশ্চর্য্য দৃশ্য,—এ-সব উপভোগ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম চাই অর্থ। বিবাহের পর যে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে তার মূলেও—এই অর্থ। সুতরাং নবপ্রণয়ী প্রেমকে অর্থসম্পত্তির যত উপরে তুলিয়া বড়াই করুক না কেন, সে বড়াই তার দণ্ড কয়েকের। নিষ্ঠুর সংসার অন্নচিন্তার চমৎকারিত্বে এই দিক দিয়া মানুষকে ঘোরতর বাস্তববাদী করিয়াছে। তপন বিবাহ না করিয়া সর্ব্বপ্রথম তাই উপার্জ্জনে মন দিয়াছে।

তখনও চাকরি হয় নাই, বাড়ি হইতে বাহির হইয়া মেসে সে একদিন একজনের কাছে দশটা টাকা চাহিয়াছিল। লোকটি অম্লানবদনে বলিয়াছিল, টাকা তার নাই। অথচ তার ঘণ্টা দুই পরে Savings Bankএর বইখানি লইয়া পঁচিশটি টাকা জমা দিতে সে বাহির হইয়া গেল। নিঃসম্বল তপনকে সে বিশ্বাস করে নাই।

নূতন সংসার পাতিবার আয়োজন তাই তপনকে হিসাবী করিয়া তুলিয়াছে। ব্যাঙ্কের খাতায় এখন কিছু জমিয়াছে।

আজই একটা কিছু নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিবার জন্য তপন ব্যগ্র হইয়াছে। সাড়ে সাতটার সময় সে আসিবে। ছায়া বসিয়া বসিয়া এই সব কথাই ভাবিতেছিল।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, ঘরের ভিতর আবছা অন্ধকার। আলোর বোতামটা টিপিয়া দিলেই হয়। ডেক চেয়ারটায় অলসভাবে শুইয়া চক্ষু মুদিয়া ছায়া কত কি কল্পনা করিতেছিল। বছর কয়েক পূর্ব্বের এমনই

এক গোধূলি মূহূর্ত্ত। প্রচণ্ড শোক বা সুগভীর লজ্জা কোন কিছুই সেদিন আবরণ দিয়া হৃদয়ের আসল রত্নটিকে ঢাকিয়া দেয় নাই। প্রিয়ের নিকট-বর্ত্তিনী হইয়া সেদিন অসঙ্কোচেই সে হাতের উপর হাতখানি তুলিয়া দিয়াছিল এবং মনের গুরুভার নামাইবার জন্য পরম পরিতৃপ্তিতে চক্ষু মুদিয়াছিল। শিক্ষা ও সংস্কারে মন গড়িয়া উঠে, কিন্তু আবেগ-পরিচালিত মনের স্রোতে ঐ সব গুরুভার কোথায় ভাসিয়া যায়! সেই দিনের সদ্য পিতৃশোকপ্রাপ্ত ছায়া সে দৃশ্যের অসঙ্গতিতে অনায়াসে ক্রুদ্ধ হইতে পারিত! তরুণের চোখে যে-আলো দেখিয়া জেসিডি যাওয়া স্থগিত হইয়া গেল, সে আলো ত তপনের চোখেও ছিল। কিন্তু তরুণের দৃষ্টির মত বুভুক্ষা মাখানো নহে। সুগভীর দৃষ্টি—সমবেদনা ও সান্ত্বনার ভারে সুকোমল। সে দৃষ্টি লালসার পঙ্কিলতায় আবিল নহে, অধিকারলাভের আশায় ব্যগ্র ও উজ্জ্বল। হৃদয়-বিনিময়ে তাই সমস্ত বাধাবন্ধ কাটিয়া গিয়াছিল।

বাহিরের দরজায় মোটরের আওয়াজ হইল। তপন আসিল বুঝি? তাড়াতাড়ি সে জানালায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে গেল, কিছুই দেখিতে পাইল না। উঠিয়া সুইচটা টিপিয়া দিল। এবং আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া বেশবাস ঠিক করিয়া লইয়া টেবিলের ধারে চেয়ারখানায় বসিয়া একখানি বই তুলিয়া লইল। এখনও সাড়ে ছ'টা বাজে নাই। অফিসারদের ঘড়ির কাঁটা কি ঘোড়ার মত লাফাইয়া চলে।

বারান্দায় কাঠের সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইল না। দুষ্টামী করিবার জন্য কেড্‌স পায়ে দিয়াছে বুঝি? আচ্ছা দাঁড়াও একটু, তোমার সময়-জ্ঞান লইয়া ঠাট্টায় এমন নাকাল করিব!

মনে মনে অত্যন্ত খুশী হইয়া ছায়া চোখের উপর বইখানি তুলিয়া ধরিয়া তাহারই ফাঁকে দ্বারপথে চাহিয়া রহিল।

তপন ঘরে ঢুকিলেই ছায়ার পাঠে মনোযোগ গভীর হইবে।

চলাফেরার খস্ খস্ শব্দে বই হইতে চোখ না তুলিয়াই পরুষকণ্ঠে প্রশ্ন করিবে, "কে আপনি মশায়? কি প্রয়োজন এখানে?"

হয়ত আগন্তুক বলিবে, "জনৈক দর্শনপ্রার্থী।"

ছায়া অতিকষ্টে হাসি দমন করিয়া স্বাভাবিক স্বরে বলিবে, "দর্শন-প্রার্থী ত একেবারে শোবার ঘরে কেন? বাইরে থেকে কার্ড পাঠিয়ে দেখা করতে হয়, এ সহজ শিষ্টাচারটুকুও কি ভুলে গেচেন? জানেন, এই অনধিকার প্রবেশের শাস্তি আপনাকে নিতে হবে!"

আগন্তুক রহস্য করিয়া বলিবে, "আমি প্রস্তুত। বলুন, আপনার পিনালকোডে কি ধারা এবং তা'তে কিরূপ শাস্তি লেখা আছে?"

সত্যই হাসি চাপা ছায়ার অসাধ্য হইয়া উঠিবে। বইটাকে আরও মুখের কাছে তুলিয়া প্রবল হাসির ধমকে সে প্রচণ্ডভাবে কাসিয়া ফেলিবে। এবং সেই কাসির মধ্য দিয়াই রহস্যের পরিসমাপ্তি। হাসিতে হাসিতে দুইজনেই সন্নিকটবর্ত্তী হইবে এবং ভালবাসার পিনালকোডে একমাত্র যে ধারাটি বলবত্তর তাহা লইয়া কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা হইতে-ও পারে।

উপস্থিত এই দৃশ্যের কল্পনাতেই হাসির বেগ অদম্য হইয়া উঠিতেছে, পায়ের শব্দ পাইলে সমস্ত কৌতুক না ফাঁসিয়া যায়!

দ্বারের কাছে পায়ের শব্দ হইতেই ছায়া বইয়ে মনঃসংযোগ করিল, কিন্তু কল্পনায় এইমাত্র যে-সব উত্তর-প্রত্যুত্তর হইয়া গেল—তাহারই পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনায় সত্য সত্যই সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বই নামাইয়া প্রফুল্লকণ্ঠে কহিল, "আসুন, আসুন, আ—"

তৃতীয় সম্বোধন সম্পূর্ণ হইল না। ছায়ার মুখখানি রক্তহীনতায় ফ্যাকাশে হইয়া গেল। মুখের অর্দ্ধোচ্চারিত বাণীর সঙ্গে বুকের স্পন্দনও বুঝি থামিয়া যায়!

ছায়ার ভাব দেখিয়া তপনের মা-ও অল্প একটু বিচলিত হইলেন। ছায়ার সঙ্গে তিনি আপ্যায়িত করিতে আসেন নাই, আত্মীয়তার সূত্র টানিয়া কোন স্নেহসূচক কুশল-প্রশ্নও নহে। অথচ সেই সবের ভান লইয়া এই মেয়েটির নাগপাশ হইতে পুত্রকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন।

মেয়েটি যতই দোষী হউক, ডাকিনী, দুষ্টা বা যে কোন কু-আখ্যাতেই সে অভিহিত হউক না কেন, এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সে তাঁহার পুত্রকে ভালবাসে। প্রাণ ভরিয়াই ভালবাসে।

মুহূর্ত্তকাল ছায়ার ম্লান মুখ দেখিয়া প্রশ্ন করিবার সাহস তাঁর হইল না। কিন্তু তিনি শক্ত মেয়ে; পরমুহূর্ত্তেই এই দুর্ব্বলতা কাটাইয়া উঠিয়া মুখে হাসি টানিয়া আপ্যায়িত করিলেন, "ভাল ত, মা? আহা! ভাবনায় চিন্তায় বাছার মুখখানি শুকিয়ে গেচে!"

ছায়ার মুখে তথাপি প্রফুল্লতা ভাসিয়া উঠিল না। আগন্তুককে অভ্যর্থনা করিবার ভাষাও তার জুয়াইল না।

তপনের মা দুই দুইটা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া বেশ হাঁপাইতেছিলেন। ছায়ার অভ্যর্থনার অপেক্ষা না রাখিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলেন ও দরদমাখা স্বরে বলিলেন,—"শুনেচি সব, ভাল করেই বি, এ, পাস করেচ। শুনে যা আহ্লাদ হলো—তখনই ঠনঠনের কালিবাড়িতে স'পাঁচ আনা পূজো পাঠিয়ে দিলুম। ক্ষেন্তি গিয়ে পূজো দিয়ে এলো।"

ছায়া পাথরের মূর্ত্তির মত ঠায় বসিয়া আছে। চোখের পলক না পড়িলে হয়ত মনে হইত প্রাণহীন প্রতিমা। ভয়ে বুকের স্পন্দন বাড়িয়া উঠিয়াছে, কণ্ঠতালু শুকাইয়া গিয়াছে—ভাষা বাহির হইবে কোথা হইতে?

তপনের মা-ই বলিলেন, "বাড়িভর্ত্তি দেখলুম মাসি-পিসির দল, আদর-যত্ন করে ত? না খালি—"

এইবার তাঁর জ্ঞান হইল, ছায়া একভাবেই বসিয়া আছে। প্রথম

ঢুকিবার মুখে যেমন দেখিয়াছিলেন আকস্মিক আঘাতে অচেতন-প্রায়—এখনও তেমনই। আবার মনটা তাঁহার দুলিয়া উঠিল। আহা! পিতৃ-মাতৃহারা! কিন্তু তিনি ত সত্য সত্যই দরদ জানাইতে আসেন নাই। বলি দিবার পূর্ব্বে অসহায় ছাগশিশুর মুখে দু'মুঠা কচি দূর্ব্বা ধরিয়া মমতা জানাইবার মতই অভিসন্ধি তাঁহার মুখে। খাঁড়া যখন শানাইয়াছেন, কোপ দিতেই হইবে। অনর্থক ইতস্ততঃ কেন?

আঁচলের গ্রন্থি খুলিয়া পান-জরদার কৌটা বাহির করিয়া গোটাদুই পান ও খানিকটা জরদা গালে ফেলিয়া দিলেন এবং সেগুলি চিবাইবার সঙ্গে মনের সমস্ত দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, "আমার স্পষ্ট কথা। তপুর খবর জানতেই এতদূর এসেচি। আজ বছরাবধি সে রাগারাগি করে বাড়ি ছেড়েচে। শুনতে পাই চাকরি করে, মুটে মজুরদের মত খাটে। জান মা, ওঁর দপ্তরখানায় চাকরি করে কতগণ্ডা মুহুরী, সরকার পরিবার প্রতিপালন করচে, ওঁর ম্যানেজারের মাইনে দু'শো টাকা! হায়রে কপাল! কিসের জন্যে ছোঁড়া মুখে রক্ত তুলে খেটে সারা হচ্চে?" শেষের দিকে তাঁহার স্বর কোমল হইয়া আসিল।

কোমলস্বরে তিনি বলিলেন, "অনেকের মুখে অনেক কথা শুনি। শুনি আর বুকের ভেতরটা ফেটে যায়। মা, ছেলে হওয়ার যে কি জ্বালা তা না হলে কি বুঝবে! লোকে বলে তোমার পাঁচ ছেলে, ভাবনা কি? ছেলে একই হোক, আর পাঁচই হোক—স্নেহ কি ভাগ করে কম বেশি বা সমান সমান মেপে দেওয়া যায়? সব জিনিষ ভাগ করে দেওয়া যায়, স্নেহ যায় না। ছেলে বকুক, গাল দিক বা মারুক, মা'র মন কিছুতে বোঝে না। দশ মাস দশ দিন এত কষ্ট করে বুকের রক্ত দিয়ে পালন করলুম, সে পর হয়ে যাবে শুনলে বুকের আধখানা কি খসে যায় না? আজ এক বছর সে আমায় মা বলে ডাকে নি, বুকটা আমার খাঁ-খাঁ কচ্চে। উঃ।" ঝর ঝর

করিয়া গৃহিণীর চোখের জল ঝরিতে লাগিল। জজগৃহিণীর উপদেশ মত মায়াকান্না নহে, সত্যকার বেদনা যেন অশ্রুতে আকার লাভ করিল।

ছায়ার মাথায় ততক্ষণে আকাশের বজ্র নামিয়াছে। যেমন আলো, তেমনই গর্জ্জন, তেমনই কি দাহ! চক্ষু কর্ণ হৃদয় সমস্ত আক্রমণ করিয়াছে। সে কি দস্যুতা করিবে? এক শান্তিময় সংসারে আগুন জ্বালিয়া দিবে? দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধরিয়াছেন—একথা সত্য, বুকের রক্ত দিয়া সন্তান পালন করিয়াছেন ইহাও মিথ্যা নহে; দাবি তাঁরই বেশি। মাকে কাঁদাইয়া কোন্ সন্তান আজ পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছে? এই ক্রন্দনকে উপেক্ষা করিয়া যদি সে ভবিষ্যতের সুখনীড় বাঁধে ত—যে কোন মুহূর্ত্তে সে-নীড় ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এই বেদনার্ত্ত হৃদয়ের বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস ও অন্তরমথিত অশ্রুর অভিষেক লইয়া নবজীবনের মাঙ্গলিক সুরু করিতে অতি বড় দুঃসাহসীরও সাহসে কুলায় না!

গৃহিণী আঁচলে অশ্রু মুছিয়া বলিলেন, "তার জন্যে কত জায়গায় না খুঁজেচি, কোথাও পাই নি। দু-দু'বার খবর পেয়ে মেসে গিয়ে হাজির, শুনলুম সে বাসা বদলেচে। আমি এখনও যে কেন পাগল হয়ে যাই নি, এই-ই আশ্চর্য্য!"

বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতেই তিনি ছায়ার সন্নিকটবর্ত্তিনী হইয়া অকস্মাৎ তাহার হাত দু'খানি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "তুই মা আমায় বাঁচা। আমি শুনেচি সে তোর কথা শোনে, তোকে খুব—খুব—মানে। মনে কর, আমি তোরও মা; মায়ের কোলে ছেলে ফিরিয়ে দেওয়ায় যে পুণ্য, তার মত কোন সৎকাজ পৃথিবীতে নেই। বল, বল মা,—সে কোথায়?"

এতক্ষণে ছায়া কথা কহিল। মুখের পাংশুভাব কাটিয়া দৃঢ় কয়েকটি রেখা ফুটিয়া উঠিল, চোখের দীপ্তি অস্বাভাবিক। ছায়া হাসিল। তুলনাহীন দুঃখে মানুষ বুঝি না হাসিয়া পারে না!

শান্তস্বরে সে কহিল, "তাঁর ঠিকানা আপনি পাবেন।"

আনন্দে গৃহিণীর মুখে হাসি ফুটিল। একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি কহিলেন, "শতজীবি হও মা, মনের সুখে—"

ছায়া বাধা দিয়া শান্তভাবেই কহিল, "দয়া করে আমায় আশীর্ব্বাদ করবেন না।"

গৃহিণী অপ্রস্তুত হইয়া কহিলেন, "না, তা তপুর বিয়েটা আগে হয়ে যাক, তারপর তোকেও জোর করে বিয়ে দেব। হাজার হোক, একেবারে পর ত নও।"

ছায়া আবার হাসিল।

মৃদুস্বরে বলিল, "মা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করবেন না। একটু আগে বলেচেন, সব জিনিষের ভাগ চলে—স্নেহের চলে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—ভালবাসারই কি চলে?"

গৃহিণীর যেন বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। মেয়েটা বলে কি? কথার কায়দায় ফেলিয়া কোন কিছু আদায় করিয়া লইবে নাকি? সঙ্গে সঙ্গে মায়াও হইল। নিজের মনের দুঃখের আলোকে পরের মনের অস্পষ্ট লেখাগুলি অতি সহজেই পাঠ করা যায়। তাঁর মনে আজ অকস্মাৎ সেই আলোক জ্বলিয়াছে।

গৃহিণী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, মা, চলে না। একথা আমি জোর গলাতেই বলচি। তবু তরল মনের দাগ ইচ্ছে করলে দু'দণ্ডে তুলে ফেলা কঠিন নয়।"

ছায়া তেমনই হাসিয়া বলিল, "মনের কথা থাক। বলুন, আর আমায় কি করতে হবে?"

সে-কথা বলিতে গিয়া গৃহিণীর বাধিল। যত বড় স্পষ্টবাদিনীই তিনি হউন, এই নিঃসহায়াকে আঘাত করিতে কোথায় যেন বাজিতে লাগিল।

একবার তিনি ছায়ার পানে চাহিলেন। স্থির অকম্পিত দৃষ্টি। মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া অন্তিমকালে রোগী যেমন প্রশান্ত ও পরিপূর্ণভাবে আত্মীয়-স্বজনের পানে চাহিয়া থাকে, তেমনই চিন্তা ও শঙ্কালেশহীন সে দৃষ্টি। গৃহিণী মুহূর্ত্তে চাহিয়াই মাথা নীচু করিলেন। এই একফোঁটা মেয়েটার অনেকখানি নীচেই তিনি নামিয়া গিয়াছেন, মনে হইল। আশীর্ব্বাদ ত নয়ই, কোনরূপ শুভ কামনা এই মেয়েটির সম্মুখে উচ্চারণ করিবার ভাষাও যেন তাঁহার কণ্ঠে নাই।

মুখ নীচু করিয়াই তিনি বলিলেন, "হয় ত তোমায় সে ভালবাসে। সে-যদি আমার কাছে আসতে রাজী না হয়?"

ছায়া স্পষ্টভাবেই উত্তর দিল, "যাতে রাজী হন—সে ভার আমার। আর কিছু?"

গৃহিণী কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "সব কথা বলতেও যে আমার বুক কেমন করচে, মা। বুঝি সব, অথচ উপায় নেই। তোকেই যদি ঘরের বউ করে আনতে পারতুম!"

ছায়া তেমনই স্পষ্ট কণ্ঠে বলিল, "তা ত হবার নয়, মা। আপনি চাইলেও, আমার আপত্তি আছে। সেখানে গিয়ে দাঁড়াবার মত মনের জোর আমার নেই। বলুন, আর কি চান? সময় সংক্ষেপ, এখনই বেরুব।

গৃহিণী মুখ তুলিয়াই বলিলেন, "সে যাতে বিয়ে করে তার উপায় তোমায় করতে হবে।"

তিনি মুখ তুলিলে দেখিতে পাইতেন, বুকে ছুরি চালাইয়া দিলে দারুণ যন্ত্রণায় চীৎকার চাপিয়া লোকে কেমন করিয়া মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়ে! তীব্র বেদনায় ছায়া মিনিট দুই নির্ব্বাক হইয়া রহিল। সমস্ত ঘরে সূচী-ভেদ্য নিস্তব্ধতা!

টেবিলের উপর হইতে এক টুকরা কাগজ টানিয়া লইয়া ছায়া খস্ খস্ করিয়া কি লিখিল, বার দুই মাথাটা টিপিয়া ধরিল, তারপর অতি ধীরে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া গৃহিণীর হাতে সেই কাগজের টুকরা দিয়া অতি কোমলস্বরে বলিল, "এই তাঁর ঠিকানা। কিন্তু এটা বোধ হয় দরকার হবে না, তিনি কালই বাড়ি যাবেন। আর যাতে তিনি বিয়ে করেন, আপনার বাধ্য ছেলে হন—তাও করবো।" বলিয়া অবনত হইয়া তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিল।

গৃহিণী আশীর্ব্বাদ করিলেন না, কোন কথাই বলিলেন না। পদতল-লুণ্ঠিতার পানে চাহিয়া তাঁহার চক্ষু দু'টি জ্বালা করিতে লাগিল। সহসা ফোঁটা দুই উষ্ণ জলের স্পর্শে ভীষণভাবে চমকিত হইয়া তিনি মুখ ফিরাইয়া লইলেন। মনে হইল, ও অশ্রু নহে, বলি শেষে মূক প্রাণীর শোণিতে পা দুইখানি ভিজাইয়া তিনি নিষ্ঠুর নরঘাতিনীর মত সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন। তেমনই রক্তলোলুপ, ক্রূর ও দানবীয় উল্লাস সমগ্র অন্তরে; অথচ অতি বেদনায় দু'টি চোখে তাঁর অশ্রু নদী!

* * *

ছায়ার হৃদয়ে কি ভাব উঠিল তাহার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব।

একবার একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকর সদ্য সন্তানহারার ছবি আঁকিবার জন্য বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের আহ্বান করেন। যাঁর চিত্র সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে —শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলিয়া তিনি পুরস্কার ও খ্যাতিলাভ করিবেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে দেশ-দেশান্তর হইতে দলে দলে চিত্রকর আসিয়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করিলেন। তাঁহাদের চিত্রগুলি কি বর্ণসম্পদে, কি ভাববৈচিত্র্যে, কি রেখার সুসামঞ্জস্যে—সত্য সত্যই অপূর্ব্ব। সন্তানবিয়োগবিধুরার মুখের এমন শোকমলিন ভাবটি তাঁহারা ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন যে, দেখিবা-

মাত্রই চোখের জল চাপিয়া রাখা দুষ্কর হইয়া উঠে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সে-সব সুন্দর চিত্রের একখানিও বিচারক-শিল্পী মনোনীত করিলেন না।

সহসা একখানি চিত্রে তিনি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। ছবি বিশেষত্ব-বর্জ্জিত। অতি সাধারণ এক নারীমূর্ত্তি—বিস্রস্তবসনা, আলুলায়িত-কেশা। পিঠ—ধনুকের মত বাঁকিয়া পড়িয়াছে, দু'টি হাতে সে মুখ ঢাকিয়াছে। মলিন বর্ণ-বিন্যাস, তথাপি মুগ্ধ হইয়া শিল্পী সেই চিত্রখানিই পুরস্কারের জন্য মনোনীত করিলেন।

অন্যান্য চিত্রকরেরা আপত্তি তুলিলেন, "একি বিচার আপনার? ভাব ফুটাইতে অসমর্থ হইয়া যিনি শোকাতুরার মুখ ঢাকিয়া দিয়াছেন, অবশেষে তাঁর অক্ষম রচনাই জয়যুক্ত হইল?"

শিল্পী হাসিয়া বলিলেন, "সন্তানহারার মুখে শোকের ভাব ফুটাইতে যাওয়ার মত হাস্যকর আর কি আছে! যে-দুঃখ অবর্ণনীয়—কথা বা ছবি দিয়া তাহা ফুটাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা! শিল্পী তাই ইঙ্গিতে শোকাতুরার অপরিসীম বেদনাকে পরিস্ফুট করিতে মুখখানি ঢাকিয়া দিয়াছেন।"

নির্জ্জন কক্ষে দুয়ার বন্ধ করিয়া ছায়া পত্র লিখিতেছে। খানিকটা লিখিয়া কাটিতেছে, আবার নূতন কাগজে কালির দাগ টানিতেছে। অবশেষে মনোনীত না হইলেও সে লেখা শেষ করিল:

তপনবাবু!

সাড়ে সাতটায় আপনার আসবার কথা, তার আগেই আমায় চলে যেতে হলো। যাবার আগে দু'টি কথা বলে না গেলে, আমার এই আকস্মিক অন্তর্দ্ধান নিয়ে আপনাকে হয়ত বিব্রত হতে হবে। তাই জানিয়ে যাচ্ছি, বৃথা আমার খোঁজ করবেন না কোথাও। আশ্চর্য্য মানুষের মন! নিজেকে সে কোন দিন আবিষ্কার করতে পারে না। তেমনি

দুর্ব্বল। মনে করুন, বছর কতক আগেকার ঘটনা। আমার শোকে সান্ত্বনা দিতে এসে আপনি নিবেদন করলেন আপনার ভালবাসা। বেশ সহজভাবেই তা গ্রহণ করলুম। অথচ তখনও এক সপ্তাহ হয় নি—তার নীচের ঘরেই বাবা আত্মহত্যা করেছিলেন! মন এমনি—দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সহানুভূতি পেয়ে শোক ভুলে গেল। একবারও বুঝলে না যে,—কিন্তু কি-ই বা সে বুঝতো? আসলে সুখে বা শোকে যেমন করেই হোক কামনা চরিতার্থ হলেই আমরা খুশী হই। তারপর দীর্ঘ বছর ধরে সেই কামনাকেই পোষণ করে এসেচি, কত স্বপ্ন দেখেচি। ভেবেচি ভালবাসা! আশ্চর্য্য নয়? অভ্যাসের মত কামনা যখন আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে—সেই মূঢ়-মুহূর্ত্তে আমরা ভালবাসার জয়গানে গগন বিদীর্ণ করি। ধ্বংসশীল পৃথিবীর বুকে প্রেমকে আমরা মনে করি—শাশ্বত—কালজয়ী! আরও মজা দেখুন, প্রতিজ্ঞা করলুম, আপনাদের বাড়িতে বউ সেজে কোন দিন যাব না। সেখানে পা রাখবার হীনতা যেন কোন দিন আমায় বহন করতে না হয়! অথচ সেই বাড়ির ছেলেকে নির্ব্বাচন করলুম আজীবনের সঙ্গী! স্বর্গে বসে বাবা নিশ্চয়ই আমার কথা শুনে হাসচেন!

আপনি বাপ-মা ত্যাগ করলেন, ধর্ম্মও ত্যাগ করতে চাইলেন। কেন? এক টুকরো মাংসের লোভে নয় কি? তপনবাবু, আমরা যতই সভ্যতা-সংস্কৃতির বড়াই করি না কেন, আসলে পশুত্বের একটুও উর্দ্ধে উঠতে পারি নি। তবু আমরা বড় বড় কথার রচনায় ঐগুলিকে করে তুলি অনবদ্য। দুঃখকে পরাই মহত্বের মুকুট, সুখকে বলি অনাবিল শান্তি এবং শোক প্রকাশ করতে সভা আহ্বান করি!

যাই হোক, এ কামনাকে পোষণ করতেও আমার ঘৃণা হচ্চে। মনে হচ্ছে, আপনাকে কর্ত্তব্যচ্যুত করতেই যেন আমার এই ষড়যন্ত্র!

আপনি গৃহত্যাগ করেচেন, আত্মীয়স্বজন ছেড়েচেন! উচ্চকণ্ঠে বলচেন, আমাকে নিয়ে সুখনীড় রচনা করবেন। কিন্তু চিরদিন যাঁদের মধ্যে কাটিয়ে এত বড়টা হয়েচেন, তাঁরাই যখন আপনাকে সুখী করতে পারলেন না, দু'দিনের আলাপিতা আমাকে নিয়ে…না, না, এর মূলে যৌবনের ভোগ ছাড়া আর কিছু নেই। মধ্যাহ্ন সূর্য্য আকাশের উপর উঠলে পৃথিবীর রস শোষণ করাই তার একমাত্র কার্য্য হয়ে ওঠে; তেমনি যৌবনে ইন্দ্রিয় চায় ভোগ। এর কদর্য্যতা আমায় পীড়া দিচ্চে। যত মহত্ত্বমণ্ডিত করুন না কেন, ভালবাসা বলুন, ধর্ম্ম বলুন আর শাস্ত্রাচারই বলুন, এ বাঁধন গ্রহণ করতে পারবো না। আমায় ক্ষমা করুন।

আমার বেশি করেই মনে পড়চে। কালও তাঁর চিঠি পেয়েচি, [illegible] জেসিডির ভিলা আজও তিনি ভাড়া দেন নি। লিখেচেন, আমার [illegible] পড়লে নাকি সে বাড়ি অমনিই তালা বন্ধ থাকবে। ভাবচি তালাটা না-হয় খুলেই দিয়ে আসি। বাড়িটা পড়ে যাওয়া কি ভাল? আপনি কি বলেন?

ভাবচেন রহস্য করচি?—কিন্তু সত্যি না। যে কর্ত্তব্যচ্যুত, বাপ-মাকে অনায়াসে ত্যাগ করতে পারে তাকে বিশ্বাস করি কি করে বলুন ত? জীবনের পথে চলতে গিয়ে যে দশবার টাল সামলে নিচ্চে তার ওপর নির্ভর করতেও ভয় হয়।

ভয়ের কথাও থাক, কোন কারণেই আমরা মিলতে পারি না। মাঝখানে দিদির অকাল-মৃত্যু, পিতার আত্মহত্যা! যত কিছু আমায় নিয়েই ত! অথচ এই বিয়ের কল্পনায় ক'টি বছর কাটিয়ে দিলুম! গ্লানিতে আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হচ্চে! কিন্তু আমি দুর্ব্বল নই। দুঃখ যখন আসে—অধীর না হয়ে তাকে মাথা পেতে নেওয়াই উচিত।

আপনার স্মৃতি? তার কি কোন মূল্য আছে? মাত্র কামনার বুদ্‌বুদে

তাঁর অস্তিত্ব। আর একটা প্রবল কামনা এলেই তা ভুলতে পারি। হাঁ, নিশ্চয়ই ভুলবো। বাবাকে ভুলতে পারলুম কি করে?

প্রার্থনা করি, আপনি আপনার কর্ত্তব্য ফিরে পান। বাপ-মার মনে দুঃখ দিয়ে সুখী হবার দুশ্চেষ্টা করবেন না। আজই বাড়ি ফিরবেন।

হাসিমুখে বিদায় নিচ্চি। জীবনে হয়ত বহুবার দেখা হবে, কিন্তু এই পুরাতন পরিচয়ের সৌহার্দ্দ্য-সূত্রটি তখন থাকবে না। অপরিচিতের মত যুক্তকর ললাটে ঠেকিয়ে আমরা পরস্পরকে অভিবাদন করবো এবং পরস্পরের সাংসারিক কুশল জিজ্ঞাসা করে খানিক তৃপ্তিও হয়ত পাব। আপনি মোটরে চেপে যেতে যেতে পথের ফুটপাথে যদি কোন দিন আমায় দেখে মুখ ফিরিয়ে নেন ত—তার জন্য একটুও দুঃখ আমি পাব না। সত্যি—সত্যি—সত্যি।

যদি বাড়ি না ফেরেন—আমার আশায় চারদিক ছুটে বেড়ান ত বুঝবো, নীতির দিক দিয়ে আপনি অত্যন্ত দুর্ব্বল। ভোগকে আয়ত্বে না আনায় অশান্তি ভোগ করচেন।

তবু আপনাকে লালসামত্ত ভাবতে আমার কষ্ট হয়। কর্ত্তব্যচ্যুতই বা হবেন কিসের জন্য। আপনি উদার ও সরল, পত্রের প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করবেন। আমাদের মধ্যে আবরণ রাখা উচিত নয় বলেই আজ মোহের যবনিকা তুলে ধরলুম। মিলনগণ্ডীর বাইরে বিস্তীর্ণ জগতে আমরা এই অকুণ্ঠিত তেজকে যেন চিরকাল বাঁচিয়ে চলতে পারি। আমরা পবিত্র হতে পারি, বিবেকী হতে পারি, কর্ত্তব্যচ্যুত না হই। বিদায়। ইতি—

—ছায়া।

এতবড় মিথ্যা রচনা কোন কবি কল্পনাও করিতে পারেন না। 'মোহের যবনিকা তুলিয়া ধরিলাম, বড় আনন্দেই বিদায় লইতেছি।' তীক্ষ্ণ-

দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিলে পত্রের স্থানে স্থানে অশ্রুচিহ্ন আবিষ্কার করা মোটেই আশ্চর্য্য নহে। কামনা বলিয়া যাহাকে লেখার হরফে যথেষ্ট ঘৃণা প্রকাশ করিলাম, তাহাই দুর্ব্বলতা বলিয়া যদি কেহ ধরিয়া ফেলে! বার বার কথায় জোর দেওয়া মনের সুস্থতার পরিচয় নহে। যবনিকা উঠিল বটে, কিন্তু অন্য নাটকের। পবিত্র, বিবেকী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইলে কি হয়, হৃদয় যে খুঁজিয়া মেলে না। এ-সকল স্বর্গীয় সম্পদ্ রাখিবে কোথায়?

ভুলিবে? কিন্তু ছায়া জানে, ফুটপাতে দাঁড়াইয়া তপনের মোটর দেখার সৌভাগ্য তার কোন দিন হইবে না; সে শহর ছাড়িয়া পলাইবে। যদি-ই সে দুর্ভাগ্য ঘটে, পথচারীর সযত্ন শুশ্রূষায় বহু কষ্টে সে চৈতন্য ফিরিয়া পাইবে হয়ত!

সময় অল্প। তাড়াতাড়ি স্যুটকেশ গোছাইয়া ছায়া কক্ষ ত্যাগ করিল।

তখন সাতটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট হইয়াছে।

* * *

সেই দিন রাত্রিতেই তপন বাড়ি ফিরিল।

মায়ের পায়ে প্রণাম করিয়া সে কহিল, "মা, আমায় মাপ কর। আর কোন দিন তোমাদের অবাধ্য হব না।"

গৃহিণীর দুই চোখে দুইটি ধারা। ধারা বেগবান্। দীর্ঘ বৎসর পরে দেখা! তপন বাড়ি ফিরিয়াছে—এ আনন্দ রাখিবার ঠাঁই কোথায়?

কিন্তু আজ যদি কেহ তাঁহার মনের সন্ধান লইত ত দেখিত, বেদনার ফল্গুও সে ধারার সঙ্গে মিশিয়া আছে। সেই সর্ব্বত্যাগিনী—স্বল্পভাষিণী—কচি মেয়েটার জন্য বুকের কোথায় যেন একটু খচ্ খচ্ করিতেছে। মেয়েটির উপর দুর্জ্জয় ক্রোধ পোষণ করিয়া এতদিন কত কটু-কাটব্যই

না করিয়াছেন, সে কিন্তু তাঁহার পুত্রকে ফিরাইয়া দিয়া চমৎকার প্রতিশোধ লইয়াছে। গৃহিণীর সতেজ কণ্ঠকে মৃদু ও স্বার্থসঙ্কীর্ণ বক্ষকে ঈষৎ বিস্তীর্ণ করিয়া চক্ষুকে অশ্রুসিক্ত করিয়া তুলিতেছে। তাঁরই করুণায় তিনি আজ মিলনানন্দ উপভোগ করিতেছেন।

চারু তপনকে নিভৃতে পাইয়া কহিল, "ঠাকুরপো, ছায়া এখন কোথায় ?"

মাথা নাড়িয়া তপন কহিল, "জানি না।"

আশ্চর্য্য হইয়া চারু কহিল, "জান না ? তবে এক বছর বাড়ি ছেড়ে গিছলে কোথায় ?—আবার হঠাৎই বা এলে কেন ?"

তপন বলিল, "আমার আসা কি তোমার ভাল লাগে নি, বড় বৌদি।"

মাথা নীচু করিয়া চারু বলিল, "না।"

"—না ? বল কি বৌদি, একটি টুকটুকে বউ আমার তুমি দেখতে চাও না ?"

চারু শুষ্কস্বরে কহিল, "চাই, কিন্তু এ-বাড়িতে নয়। তোমায় আমি মনে মনে ঢের উঁচু বলে কল্পনা করেছিলাম।"

তপনের বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল। সেই চারু, নির্ব্বোধ, ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া যে বর্ত্তমানকে ভুলিতে প্রাণপণ করে, লাঞ্ছনার লেখা পড়িয়াও ভাগ্য পরিবর্ত্তনের স্বপ্ন দেখে! কিন্তু তপন ত জানিত না, সুলতা মরিয়া গিয়া নির্জ্জীব চারুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সে এখন শাসনভীত, কুণ্ঠিত, নির্ব্বাক চারু নহে। জীবনকে বিশ্লেষণ করিবার শক্তি সে পাইয়াছে। শৃঙ্খল লোহার হোক, আর সোনার হোক, বন্ধনই যে একমাত্র রূঢ়তা—সে-কথাও সে বুঝিতে পারে।

তপন বিস্মিতস্বরে বলিল, "আচ্ছা বৌদি, আমি যদি সত্যিই আর না ফিরতুম, তুমি খুশী হতে ?"

চারু ঘাড় নাড়িল।

তপন বলিল, "কিন্তু বাপমাকে ছেড়ে যাওয়া কি আমার উচিত? মনে করে দেখ দেখি—এই এতটুকু বেলা থেকে প্রতিপালন করে, এত বড়টি করে তুলেছেন ওঁরা! ওঁদের মনে কষ্ট দেওয়া কি অকৃতজ্ঞের কাজ নয়? তোমার ছোট ছেলেটি যদি কোন দিন এই রকম করে?"

চারু পাংশুমুখে বলিল, "তাহলে সত্যিই আমার কষ্ট হয়, ভারি কষ্ট হয়। তবু এ-কথা আমার বার বার মনে উঠতো কেন, ঠাকুরপো?"

তপন ম্লান হাসিয়া কহিল, "ভাইয়ের মত আমায় ভালবাস বলেই হয়ত তুমি শুধু আমার দিকটাই দেখেছিলে, ওঁদের দিকটা দেখ নি।"

চারু কহিল, "আচ্ছা ঠাকুরপো, কর্ত্তব্য বলে যদি বুঝেছিলে তবে তুমিই বা তাঁদের ত্যাগ করে গিয়েছিলে কেন?"

তপন বলিল, "একটা বাসনার টানে কোন কিছুর জ্ঞানই আমার তখন ছিল না।"

চারু বলিল, "এখন হঠাৎ সে জ্ঞান জন্মাল কোথা থেকে?"

তপন ম্লান হাসিয়া বলিল, "এখন! সে-বড় অদ্ভুত কথা, বৌদি!" পরে একমুহূর্ত্ত থামিয়া বলিল, "শুনবে? ছায়াই আমাকে এই কর্ত্তব্যের সন্ধান বলে দিয়েচে। এই দেখ, যাবার সময় সে আমায় কি লিখে গেচে।"

চারু মনোযোগ দিয়া পত্রখানি আদ্যোপান্ত পড়িল। পড়িয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, কোন কথা কহিল না।

তপন বলিল, "কথা কইচ না যে?"

চারু গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, "কোন কথা বলবার অবকাশ ত সে রাখে নি। সে সয়েচে—সরে দাঁড়িয়েচে।"

তপন বলিল, "একটা জিনিষ সে ভুল বুঝে গেল, বৌদি! সে

বলেচে আমি তার দেহটা চেয়েছিলাম, তারই লোভে বাবা-মাকে ত্যাগ করার অগৌরবকে পর্য্যন্ত ভ্রূক্ষেপ করি নি। কিন্তু তা ঠিক নয়। তা যদি চাইতুম ত তাকে ফেলে আবার কি এ বাড়িতে আসি!"

চারু বলিল, "না পাওয়ার দুঃখে ব্যর্থতায় হয়ত তুমি ফিরে এলে?"

ম্লান হাসিয়া তপন বলিল. "না বৌদি, না পাওয়ার দুঃখেও নয়, ব্যর্থতায়ও নয়। আমি জোর করলে ধরা সে না দিয়ে থাকতে পারতো না। তুমি কি মনে কর—সারা ভারতবর্ষটা এতই বিস্তৃত ও আমার ধৈর্য্যের পরমায়ু এতই অল্প যে তাকে খুঁজে বার করা এক রকম অসাধ্য? তা মোটেই নয়। কিন্তু সে রকম ইচ্ছা আমার হলো না।"

—"কেন ঠাকুরপো?"

—"চিঠিখানা আর একবার পড়, বুঝবে কেন।"

পত্র পড়িয়া চারু বলিল, "তরুণবাবু কে?"

তপন বলিল, "হয়ত আমার কুগ্রহ। তার জেসিডির বাড়িখানা বন্ধ আছে, সেই চিন্তাই ছায়ার প্রবল হয়ে উঠেচে। বল দেখি বৌদি, এ অবস্থায় আমি কি করতে পারি!"

চারু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তবে যে বললে জোর করলে সে ধরা না দিয়ে পারতো না?"

তপন বলিল, "ঠিকই বলেচি। রাগ করো না বৌদি, মেয়েমানুষের মন বুঝতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। তারা স্রোতের তৃণ বা পদ্মপাতার জল। একটা কিছু আঁকড়ে ধরবার দৃঢ়তা তাদের নেই। কিন্তু জোর করে ধরে রাখবার প্রবৃত্তি আমার হলো না। এ কি পাঠশালার পড়া যে, বেতের ভয়ে আপনি মুখস্থ হয়ে যাবে?"

চারু উজ্জ্বল চক্ষু তপনের পানে তুলিয়া বলিল, "এমনও ত হতে পারে,

ঠাকুরপো যে, চিঠির কথাগুলো সব মিথ্যে! তোমাকে সুখী করতে সে এত বড় ত্যাগ করে গেল।"

তপন হাসিল, "ত্যাগ! হঁ্যা, ত্যাগই বটে! তবু যদি আমরা পরস্পরকে না জানতুম?"

চারু উৎসুক হইয়া বলিল, "কি জানতে ঠাকুরপো, বল না?"

তপন বলিল, "আমাদের মধ্যে কোন কিছুর ব্যবধান ছিল না, দিনের মত পরিষ্কার করে অন্তর বিনিময় করেছিলাম। তবু সেখানে আজ মেঘের রাশি!"

চারু বলিল, "তুমি ভুল বুঝেচ, ঠাকুরপো। ছায়া যতই শিক্ষিত হোক, যত প্রকার কুসংস্কারই সে কাটিয়ে উঠুক, নারীর দুর্ব্বলতা তার আছে।"

তপন জিজ্ঞাসা করিল, "কি দুর্ব্বলতা?"

চারু বলিল, "আমরা এতটুকু স্বার্থের জন্য প্রকাণ্ড সংসার ছারেখারে দিই, আমাদের জন্যই ভাই ভাইয়ের গায়ে হাত তোলে, ছেলে বাপমাকে কষ্ট দেয়। তবু ঠাকুরপো, যদি আমরা একবার বুঝি এ অন্যায় ত অমনি ফিরে দাঁড়াই। বাপের মুখে স্বামীনিন্দা শুনে সতী অনায়াসে দেহত্যাগ করেছিলেন। সেই বীজ যে এখনও আমাদের মনের মধ্যে রয়েচে।"

তপন বলিল, "আমার এক বন্ধু ছিল, সে এই রকম আদর্শ গড়তে ভালবাসতো। ভোগবিমুখতাকে সে বলতো মস্ত বড় ত্যাগ, দুর্ব্বলতাকে বলতো ক্ষমা। এমন কি মরা ভালবাসার ধ্যান করে সারাটা জীবন হয়ত কাটিয়েই দেবে।"

চারু বেদনা-কোমল কণ্ঠে কহিল, "ভালবাসা কি কখনও মরে ঠাকুরপো?"

তপনের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কণ্ঠে অস্বাভাবিক জোর দিয়া সে বলিল, "না, মরে না। কিন্তু সে দূরে ঠেলে দেয় না। সংসারের মধ্যে তার স্থিতি, সংসারের মধ্যেই তার পরমায়ু। তার সেবায় সর্ব্বস্ব দিয়েও তৃপ্তি হয় না ;—অর্থ, ঐশ্বর্য্য, দেহ, প্রাণ। যে ভালবাসা এ সবকে গ্রাহ্য না করে আরও উর্দ্ধে আশ্রয় খোঁজে, তাকে তুমি কি বলবে, বৌদি ? খেয়াল ছাড়া—"

চারু স্নিগ্ধস্বরে বলিল, "সে খেয়াল নয়, ভালবাসাই।"

তপন অধীরস্বরে কহিল, "কিন্তু আমি তা চাই নে—চাই নে। একটা স্তোক, মিথ্যা প্রবোধ—যার কোন মানে হয় না। আমি চাই সেই ভালবাসা যা tangible. যা মনকেও টানে, দেহকেও টানে। যা সংসারকে সুন্দর করে গড়তে চায়। যা রূঢ় বাস্তবজীবনে স্বপ্নের মত সুকুমার।"

চারু তপনের উত্তেজিত গৌর মুখের পানে চাহিয়া হাসিল। কহিল, "ছায়ার চিঠির একটা কথা তোমায় খুবই আঘাত করেচে দেখচি। যেখানে সে লিখেচে, তুমি তার দেহটা চেয়েছিলে!"

তপন মাথা নাড়িয়া বলিল, "লেগেচেই ত বৌদি, এত গভীর সে আঘাত যে কিছুতেই তাকে ক্ষমা করতে পারচি নে। বৌদি, দেহভোগই যদি সত্যিকারের ব্যাপার হয় ত এই সংসারের মত কুৎসিত সৃষ্টি আর নেই। কিসের সভ্যতা—কিসের ধর্ম্ম? লালসা মেটাবার আরও ত অনেক পথ রয়েচে! অথচ ছায়া এর বেশি ভাবতেই পারলে না!"

তপন মুখ ফিরাইয়া লইল।

চারু বলিল, "মুখ ফিরিয়ে চোখের জল লুকুলে কি হবে, ভাই! তোমার মনে এই যে বেদনা, এইটাই পরম সত্য। এই হচ্চে ভালবাসা। ও যে দেহ, মন দুইই টানে।"

তপন আর তর্ক করিল না। চোখের জল লইয়া তর্ক করা মিথ্যা।

গলার সে জোর কোথায় ? বৌদি যা বুঝিতে হয়, বুঝুন। কিন্তু আশ্চর্য্য ! ছায়া এমন ভুল বুঝিল কেন ? মোহের যবনিকা ? সংসারটা কি প্রকাণ্ড মোহ ?

চারু পত্রখানা তপনের হাতে দিয়া বলিল, "সে তোমার ভালবাসার একটুও অসম্মান করে নি, ঠাকুরপো। দু'ছত্র লেখা দিয়ে কি মনের ভাব চেপে রাখা যায় ? পার ত এখানা ছিঁড়ে ফেলো।"

তপন মাথা নাড়িয়া বলিল, "না বৌদি, ছিঁড়তে আমি পারবো না।"

চারু চলিয়া যাইতে যাইতে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "এখনও সময় আছে, চেষ্টা—"

তপন বলিল, "কিসের চেষ্টা ?"

চারু বলিল, "আমি মাকে বলিগে, তিনি অমত করবেন না।"

তপন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তা হবার নয় বৌদি। বিশেষত এই বাড়িতে।"

চারু বলিল, "বাড়ির জন্য আটকাবে না, আমি বলচি।"

তপন নিষেধ করিবার পূর্ব্বেই চারু কক্ষত্যাগ করিল।

খানিক আপন মনে চিন্তা করিয়া তপন মাথা নাড়িয়া বলিল, "না বিয়ে আমি করবো না, একটুক্‌রো মাংসের লোভ ? সেদিনের সন্ধ্যাটাকে কি এমনি করেই ভুললে, ছায়া ?"

ঝর ঝর করিয়া তপনের চক্ষু দিয়া জল গড়াইতে লাগিল।

* * *

মনের সঙ্গে দেহের নিকট সম্বন্ধ।

তপনের দেহ মন দুই-ই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। দিন কয়েক পরে এক প্রাতঃকালে তপন আর মাথা তুলিতে পারিল না। প্রবল জ্বরে অচৈতন্য

হইয়া সে কেবলই ভুল বকিতে লাগিল। ছায়া ভিন্ন তার মুখে অন্য কথা নাই।

অর্থের অপ্রতুল নাই, কলিকাতার সেরা ডাক্তারেরা দু'বেলা হাজিরা দিতে লাগিলেন। তিনটি দিন কাটিয়া গেলেও তপনের চৈতন্য ফিরিল না।

গৃহিণীর দু'টি চোখে ধারার বিরাম নাই। সেই যে তিনি তপনের শয্যা-শিয়রে প্রথম দিন হইতে বসিয়াছেন, তিন দিনের মধ্যে অনুনয় বা বকাবকি করিয়াও কেহ তাঁহাকে উঠাইতে পারে নাই। পান জরদার নেশা তাঁহার ছুটিয়া গিয়াছে, আহার প্রায় বন্ধ, নিদ্রা নাই বলিলেই চলে, ঠায় বসিয়া ব্যগ্র চোখে অচৈতন্য পুত্রের পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া আছেন। দু'চোখ জ্বালা করিতেছে, মাথা ঝিম ঝিম করিতেছে, অবসাদে শরীর এলাইয়া পড়িতেছে, তবু তিনি উঠেন নাই।

চারু আসিয়া বহু সাধ্যসাধনা করিয়া অল্প দুধ ও কিছু মিষ্ট খাওয়াইয়া গিয়াছে। কর্ত্তার অনুরোধে খাটের রেলিঙে মাথা রাখিয়া অল্পক্ষণের জন্য চোখও বুজিয়াছিলেন। কিন্তু স্বপ্নে বিভীষিকা দেখিয়া পর্য্যন্ত চোখ বুজিতেও তাঁহার সাহস হয় না!

বলিতে নাই, পুত্রের ভালমন্দ কিছু হইলে গৃহিণীকেও কেহ ফিরিয়া পাইবে না। তাঁহার ও আত্মীয়বর্গের জানাশোনা অসংখ্য দেবদেবীর মানসিকের টাকা এত জমা হইয়াছে যে একটা হাতবাক্সে সে-সব ধরিতেছে না।

রাত্রি দশটা।

রোগীর ঘরে বিজলী বাতি জ্বালা নিষেধ বলিয়া ঘরের এক কোণে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছে। ম্লান অথচ স্নিগ্ধ আলো।

একদৃষ্টে পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার মনে

হইল, তপনের নিষ্পন্দ ঠোঁট দু'খানি ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল, চোখের পাতাও একবার যেন নড়িল। আশান্বিত হইয়া গৃহিণী মৃদুস্বরে ডাকিলেন, "তপু?"

স্বপ্ন নহে—সত্যই তপন চক্ষু মেলিল। দৃষ্টি বিস্ময়-বিস্ফারিত, যেন কোন অপরিচিত স্থানে আসিয়া অপরূপ দৃশ্য দেখিতেছে। পলকহীন ভাবে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অবশেষে তপনের ওষ্ঠ ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল। কি যেন সে বলিতে চাহিতেছে!

মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া গৃহিণী বলিলেন, "কি বাবা?"

ক্ষীণস্বরে তপন বলিল, "আমি কোথায়?"

—"তোমার ঘরেই ত শুয়ে আছ, বাবা। ঘুমোও।"

অল্প মাথা নাড়িয়া তপন বলিল, "কালিকেশ আসে নি? দেখ না, আভাটা কি বোকা!"

গৃহিণী শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, "কি বলচো, আমি ত বুঝতে পারচি নে!"

হাসিবার চেষ্টা করিয়া তপন বলিল, "আভা মুখপুড়ী ওকেই লুকিয়ে বে করলে। তা করুক। সমাজের ভয় তোমরা করো না, মা। মানুষের চেয়ে সমাজ কোনকালেই বড় নয়।"

গৃহিণী উপর পানে চাহিয়া কহিলেন, "হে হরি, খোকার আমার জ্ঞান দাও।"

তপন বলিল, "এক দিন বড় ইচ্ছে হয়েছিল তোমার কোলে মাথা রেখে শোব। রাত অন্ধকার, গাছের হাওয়া বেশ ঝির ঝিরে। চুলের ভেতর আঙুল চালাতে চালাতে আমায় ঘুম পাড়াবে। মা, তুমি ঘুমপাড়ানি গান ভুলে গেচ বুঝি? তুমি যে মা, আমার মা—তা শুধু ওই আঙুলের ছোঁয়ায় বুঝিয়ে দেবে। বেশ মজা, না মা?" বলিয়া শ্রান্তিভরে সে চক্ষু মুদিল।

আঁচলে চোখ মুছিয়া গৃহিণী একখানা পাখা তুলিয়া লইলেন।

প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া তপন জিজ্ঞাসা করিল, "এক রাত্রে কোথা থেকে কোথায় এলুম? কাল ছিলুম সুবোধদের দেশে—মার কোলে মাথা রেখে, ওকি তুমি কাঁদচ কেন, মা?"

—"না বাবা, চোখ কর কর করচে।" বলিয়া তিনি আঁচলে চোখ মুছিলেন।

তপন ছেলেমানুষের মত খুশীর স্বরে বলিল. "কাল তুমি ছিলে সুবোধের মা, আজ হয়েচ আমার মা। কিন্তু আশ্চর্য্য দেখ, দাওয়ার ওপর তোমার কোলে মাথা রেখে যাই চোখ বুজেছি, অমনি দু'জনে এক হয়ে গেচ! তোমার মুখ দেখে মনে হচ্চে, সেই বনজঙ্গলে যদি একবার যাও ত তুমিও পুকুর পাড়ে লণ্ঠন হাতে করে না দাঁড়িয়ে পার না। যাবে মা, একবার?"

—"যাব।"

—"বেশ হবে তা হলে।" আনন্দে তপন চক্ষু মুদিল।

দিন কয়েক পরে।

মা অতি সন্তর্পণে তপনের মাথায় অঙ্গুলি চালনা করিতেছিলেন। একটা সাধ বার বার তাঁর মনে উঠিতেছিল, রুগ্ন পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া সে-প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন নাই।

কিন্তু বেশিক্ষণ সে উৎকণ্ঠা বুকের মধ্যে পুষিয়া রাখিতে পারিলেন না। ডাকিলেন, "তপু?"

চক্ষু না চাহিয়াই তপন উত্তর দিল, "কি, মা?"

—"আমার একটা কথা রাখবি বাবা?"

তপন বলিল, "কি কথা?"

—"বল, রাখবি ?"

না চাহিয়াই তপন উত্তর দিল, "রাখবো। তুমি বল।"

মা বলিলেন, "আমার ইচ্ছে—ছায়াকে বউ করে—"

তপনের সারা দেহে বিদ্যুৎ বহিয়া গেল। চক্ষু মেলিয়া মায়ের মুখের পানে নিষ্পলকে চাহিয়া রহিল, কোন কথা কহিল না।

মার মুখখানিতে এমন কোমলতা তপন কোন দিন দেখে নাই। বর্ষণোন্মুখ মেঘের মধ্যেও এমন কোমলতা নাই।

মা ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমাদের বোঝবার ভুলে তোরা কেন চিরজীবন কষ্ট পাবি, বাবা ?"

তপন চক্ষু মুদিয়া বলিল, "কষ্ট! ইচ্ছে করলেই কি কষ্ট পাওয়া ঠেকানো যায়, মা ?"

মা ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, "কতক যায় বৈকি, বাবা। না, কোন কথা নয়, আমি ছায়াকে জোর করে আপনার করে নেব। মেয়েটা এমনি মায়াবী যে, সে দিন যখন আমার পায়ে মাথা রাখলে—তখন আমার মনে হলো তার সঙ্গে গলা ছেড়ে আমিও খানিক কাঁদি।"

তপন ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল "কোন দিন, মা ?"

মা বলিলেন, "তুই যেদিন বাড়ি ফিরে আসিস। সে ঠিকই বলেছিল, মা, আপনার ছেলে যাতে বাড়ি ফিরে যায়, তা আমি করবো।"

অকস্মাৎ তপনের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিল, "সত্যি,—মা, সত্যি ?"

—"হাঁ। আরও বলেছিল, যাতে তিনি বিয়ে করেন, আপনার বাধ্য ছেলে হন, তা-ও করবো।"

তপন আবেগভরে মাথা তুলিয়া বলিল, "সে বলেছিল—বলেছিল এ-কথা ?"

—"হাঁ, বাবা। তবে এ-বাড়িতে সে পা দেবে না প্রতিজ্ঞা করেচে। তার প্রতিজ্ঞাই বজায় থাক, তপু। আমি প্রার্থনা করি, তাকে যেন এখানে না আসতে হয়। তোরা শুধু বেঁচে থেকে সুখী হ—এর বেশি কোন প্রার্থনাই আমি করি না।"

মায়ের মুখে বরদায়িনীর অপূর্ব্ব বিভা।

সে অভয়বাণী শুনিয়াও তপনের মুখের উজ্জ্বলতা ধীরে ধীরে নিবিয়া গেল। মায়ের কোলের উপর শ্রান্ত মাথাটি রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আর ত তা হয় না, মা। তার প্রতিজ্ঞারই জয় হলো, সে আর এ বাড়িতে আসবে না।"

মা শুষ্কস্বরে বলিলেন, "কেন তপু, আমরা যদি জোর করে—"

তপন কোন কথা না বলিয়া বালিশের তলা হইতে একখানা রঙীন খাম বাহির করিয়া মায়ের হাতে দিল এবং মায়ের কোল হইতে মাথাটি তুলিয়া বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া নিঃশব্দে, বোধ করি, কাঁদিতে লাগিল।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অক্ষরে লেখা ছিল:

আসচে [illegible] ফাল্গুন ছায়া দেবীর সঙ্গে আমার বিয়ে। শুভকাজে—সবান্ধবে যোগদান করা চাই-ই।

অসম্বরণীয় অশ্রু আঁচলে চাপিতে চাপিতে মা উঠিয়া গেলেন।

* * *

অনেক দিন পরে!

চারু আসিয়া তপনকে বলিল, "একি শুনচি, ঠাকুরপো? তুমি নাকি বিয়েতে মত করেচ?"

মাথা নাড়িয়া তপন বলিল, "হাঁ!"

চারু বলিল, "এত শীঘ্র ছায়াকে ভুলতে পারবে?"

তপন বলিল, "ভুলতে তাকে পারি নি, পারবোও না কোন দিন। কিন্তু তাকে হারাবার ভয়ও আর আমার নেই, বৌদি। আজ তার চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেললুম। বৌদি, স্ত্রীচরিত্র সত্যই দুর্জ্ঞেয়।"

একটু থামিয়া বলিল, "আজ মনে হচ্চে এতগুলো দিন মিছে আঁকু-পাঁকু করে কাটালুম, মিছেই কষ্ট ভোগ করলুম; কিন্তু সেই একটি দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে যা পেয়েছিলুম, তাই আমার অমূল্য নিধি হয়ে রইলো। আমরা সেই দিনই চিরদিনের জন্য পরস্পরের হয়ে রইলুম।"

চারু কোন কথা কহিল না।

তপন বলিতে লাগিল, "আমার জন্য সে যা ত্যাগ করে গেল, জীবন দিয়ে তার মর্য্যাদা আমায় রাখতে হবে। তাই বিয়েতে আমি মত দিয়েচি। তার প্রতিজ্ঞা সবদিক দিয়েই পূর্ণ হোক, বৌদি।"

চারু আর কোন কথা না কহিয়া প্রশংসমান দৃষ্টিতে তপনের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিল।

শেষ